# বাড়ি

দেবল দেববর্মা

প্রকাশ ভবন
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

রচনার স্থান ও কাল :
প্রথমার্ধ—কলিকাতা, ১৯৬১
শেষার্ধ—পুরুলিয়া, ১৯৭২

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৮০

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
[illegible] পাণ্ডা
আদি-মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীঅজিত গুপ্ত

আট টাকা

আমার বাবাকে। নক্ষত্রের দেশে। দুধশাদা কোনো ছায়াপথের ধারে। তাঁর নতুন বাড়ির ঠিকানায়—

# BARI

*A Novel by*

**DEBAL DEBBARMA**

এই লেখকের :

রাত তখন দশটা

অন্ধকারের মুখ

অথৈ জলে মানিক

## ॥ এক ॥

কার্তিক মাস পড়তেই শীত কখন শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের মত নিঃশব্দে এসেছে। বেলা ফুরিয়ে এলেই কেমন শিরশিরানি ভাব। সন্ধ্যের পরই ঠাণ্ডা আমেজ। আর রাত গভীর না হতেই হিমেল হাওয়া। ভোরবেলায় রীতিমত শীত করে।

স্টেশনটা মাইল চার দূর। ঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বাণীব্রত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রায় সাড়ে চারটে বাজল। আর গড়িমসি করা চলে না। দেরি করলে ট্রেন মিস হতে পারে। রাত্তিরে আর গাড়িও নেই। সমস্ত রাত স্টেশনের অন্ধকার ঘরে মশার কামড় খেয়ে কাটাতে হবে।

জোয়ান গোছের একটা লোক উঠোনে বসে আয়েস করে বিড়ি ফুঁকছিল। কাছেই ডালপালা ছড়ানো একটা পেয়ারা গাছের ছায়া, এদিকে সেদিকে আরো কিছু গাছগাছালি। একেবারে কোণের দিকে মস্ত এক ঘোড়ানিমের গাছ, কৌতূহলী প্রতিবেশীর মত বাড়িটার দিকে গলা বাড়িয়ে রয়েছে।

এবার বাড়িতে পা দিয়ে উঠোনটা দেখে বাণীব্রত চমকে উঠেছিলেন। বছর খানেকের মধ্যে কী দশা! যেন অতিকায় লোমওলা একটা বিশ্রী বনমানুষ। সমস্ত জায়গা জুড়ে প্রায় কোমর-সমান উঁচু ঘন জঙ্গল। বাণীব্রত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আগাছার কুল নির্মূল করেছেন। অবশ্য আবার হবে,....ধীরে ধীরে জন্মাবে। কিন্তু বেশী নয়। বনজঙ্গল ফের ভালো করে গজিয়ে উঠবার আগেই তিনি চলে আসছেন। তিন-চার মাসে আর কত বড় হবে? এবার তো তিনি সপরিবারে এখানেই থাকবেন।

বর্ষার জলহাওয়ায় শুধু গাছগাছালিই হয় নি। ঘরদোরেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। সাত-আট দিন ধরে ঘরের পিছনেই তিনি খেটেছেন। ঝাড়ামোছা, সাফসুতরো থেকে আরম্ভ করে ঘরের কলি ফেরানো পর্যন্ত সব তার চোখের

সামনেই হ'ল। বাড়িটা প্রায় বাসের অযোগ্য হয়েছিল। দেওয়ালের কোনে ঝুল, চটা-ওঠা মেঝে। এখানে সেখানে সুড়ঙ্গের মত ইঁদুরের গর্ত। মেরামতি করতে তাই সময় লেগেছে। অবশ্য উপায় ছিল না। বাড়িটা সারিয়ে-সুরিয়ে পরিষ্কার করে তোলার জন্যই আসা। বেশ স্বচ্ছন্দ, বাসোপযোগী না হলে চলবে না। এতদিন কলকাতায় কাটিয়েছেন। প্রথম জীবনে পটলডাঙার একটা মেসে ছিলেন। মাসে একবার করে বাড়ি আসতেন। তার চেয়ে বেশী খরচে কুলিয়ে উঠতে পারতেন না। তখন মনোরমা থাকত এই পাড়াগাঁয়ে। কতদিনকার কথা, প্রায় তিরিশ-বত্রিশ বছর হবে। বাণীব্রতর মনে পড়ল মাসের শেষের দিকে স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি একখানা করে চিঠি পেতেন। ঈষৎ হেলানো লাইনের উপর হ্রস্ব-দীর্ঘ অক্ষর। নানা ভুল বানানে ভরা একটি গ্রাম্যবধূর পত্র। চিঠিতে অনেক কিছু লিখত মনোরমা। ঘর-সংসারের টুকিটাকি খবর....সংসারের এটা-ওটার জন্য ফরমাস। কোনো পত্রে এক কৌটা পাউডার, এক শিশি ভালো আলতা কিম্বা একটা শস্তা স্নো আনবার জন্য বিশেষ অনুরোধ থাকত। বাণীব্রতর মনে পড়ে মাসের শেষে স্ত্রীর হাতের লেখা সেই তুচ্ছ চিঠিখানার জন্য তিনি কতদিন মেসের লেটার বাক্সটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। ফেলে-আসা দিনের কথা ভাবলে আজও পানের সুগন্ধী মসলার মতো মিষ্টিলাগে।

উঠোনে পা রেখে বাণীব্রত বাড়িটাকে ভালো করে দেখলেন। দোতলাটা নতুন, তার নিজের তৈরি। বছর তিনেক আগে ছাদের উপর তিনি দু'খানা ঘর তুলেছেন। ইচ্ছে ছিল আলাদা করে নতুন একটা বাড়ি তুলবেন। কিন্তু পেরে ওঠেন নি। অত টাকা তাঁর কোথায়? ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন। বড় মেয়েটির বিয়েও হয়েছে। তাতে এক কাঁড়ি অর্থব্যয়। এই দু'খানা ঘর তুলতে প্রায় ছ-সাত হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে।

ছেলেরা তাঁর কাজে সায় দেয় নি। শুধু ছেলেরা কেন, মনোরমাও খুব বিরক্ত। এককালে গাঁয়ে থাকলে কি হবে, স্ত্রীর কথা শুনে মনে হয় না, সে কোনোকালে গ্রামে ছিল। মাসের পর মাস সেখানে কাটিয়েছে।

গাঁয়ের কথা শুনলে মনোরমা এখন নাক সিঁটকোয়। বলে বাব্‌বা। গ্রামের কথা আর বলো না। সন্ধ্যে না হতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক প্রহর না হতেই যেন দুপুর রাত। চারদিকে নিঃসাড়, নিঝ্‌ঝুম। একটা অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যির দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

স্ত্রীর কথা শুনে বাণীব্রত চটেন নি। বরং হেসেছেন। বেশ কয়েক বছর মনোরমা চন্দনপুরে যায় নি। যাবার উৎসাহও নেই। ইদানীং বাণীব্রত আপিসের একটা সেকশনের বড়বাবু হয়েছেন। তাঁরও সব সময় ছুটি মেলে না। যখন ছুটি হয়, তখন মনোরমার গেলে চলে না। ছেলেদের পরীক্ষা, নয়তো মেয়ে জামাইয়ের আসার কথা, কিম্বা সংসারে কারো অসুখ-বিসুখ। নানা বাধা পাহাড়-প্রমাণ এক প্রাচীরের মত পথ আগলে দাঁড়ায়।

চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে এল। রিটায়ার করতে আর মাস তিনেক বাকি। বাণীব্রত তাই দিন দশের ছুটি নিয়ে চন্দনপুরে এসেছিলেন। বসবাস না করলে ঘরদোরের যা অবস্থা হয়, বাড়িটার সেই দশা। আগে থেকে একটু মেরামতি না করে রাখলে হঠাৎ এসে আতান্তরে পড়তে হবে।

আসার সময় তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মনোরমা অরাজি। চন্দনপুরে যাবার অনুরোধ শুনে সে নিরুৎসাহ হয়ে বলল, যেতে হয় তুমি যাও। আমাকে আবার কেন বাপু? তাছাড়া পুজোর বন্ধের পরই হিরুর পরীক্ষা। দু'জনে মিলে গেলে ও কি আর পড়াশুনো করবে ভেবেছ?'

হিরু অর্থাৎ হিরণ বাণীব্রতর ছোট ছেলে। ষোল সতেরো বছর বয়স। এবার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে। পুজোর বন্ধের পরই টেস্ট পরীক্ষা। অবশ্য পরীক্ষা হবে কিনা তার ঠিক নেই। খবরটা সর্বত্র চাউর হয়েছে। বাণীব্রতও শুনেছেন। এবার স্কুলে পরীক্ষা নিয়ে হাঙ্গামা হবে। এমনিতে পড়াশুনো শিকেয় উঠেছে। সমস্ত বছর ধরে হৈ-হুল্লোড় আর গণ্ডগোল। তবু পরীক্ষার নাম শুনে ছেলেরা কটা দিন বই মুখে নিয়ে বসে। পরীক্ষা হবে না শুনলে তো ছুটির দিনের মজা। বইয়ের পাতা খুলে কে আর মন সঁপে দিচ্ছে?

তবু বাণীব্রত বললেন, 'মিলন রইল, কিরণ রইল। ছোটভাইকে ওরাই

দেখবে। তাছাড়া মোটে দশটা দিন, তুমি আমার সঙ্গে গেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

কিন্তু মনোরমা নড়ল না। মুখখানা শক্ত করে বলল, সে হয় না বাপু। মিলন আর কিরণের জিম্মায় ওকে রেখে যেতে পারব না। তারা বলে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, ছোটভাইকে দেখবে তেমন ফুর্সত কোথায়? তারপর বিস্তি? তাকে কার কাছে রেখে যাবে বল?

কনিষ্ঠার নাম বিস্তি। হিরুর চেয়ে দু'বছরের ছোট। শুধু বয়সেই কম........মাপে প্রায় সমান। বিস্তি মাথায় হিরুর কাছাকাছি। মেয়েটা শুধু লম্বা নয়....বেশ ভালো স্বাস্থ্য। ফর্সা রঙ....চোখ দুটি বড়। বেশ ডিমালো মুখ। এক ফালি কুমড়োর মতো ছোট্ট একটুখানি কপাল... পাতলা ঠোঁট। সেজেগুজে ভালো একখানা শাড়ি পরে যখন বেরোয়, তখন নিখুঁত না হলেও ওকে বেশ সুন্দরীই মনে হয়।

বিস্তির কথা উঠতেই বাণীব্রত এক মুহূর্ত ভাবলেন। বললেন, 'তুমি গেলে বিস্তিও আমাদের সঙ্গে যাবে। নইলে অত বড় মেয়েকে কোথায় ফেলে যাবে?'

আর বিস্তি যদি না যেতে চায়? মনোরমা পাল্টা প্রশ্ন করল।

'যাবে না কেন?' বাণীব্রত ভ্রূ কুঁচকে রইলেন। 'সে রকম কিছু বলেছে নাকি?'

মনোরমা একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল, মেয়েকে যা বলার তুমি নিজে বলো। বিস্তি আমাকে পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সে এখন চন্দনপুরে যাবে না। সামনের শনিবার তার এক বন্ধুর জন্মদিন। বিস্তির নেমন্তন্ন আছে। ওকে সেখানে নাচতে হবে।'

—নাচতে হবে মানে? কোনো ফাংশন নাকি? বাণীব্রত থুতনীর উপর ডান-হাতের ক'টি আঙুল আলতোভাবে রাখলেন।

—'তা ছোটখাটো ফাংশন বৈকি। মিলির জন্মদিন। অত বড়লোকের মেয়ে। জন্মদিনেই হয়তো শ'দেড়েক লোককে নেমন্তন্ন করেছে।'

—'তাহলে আমাকে একাই যেতে হবে।' বাণীব্রত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত দুটি শিথিল করে দিলেন। একটু সরে খোলা জানালার কাছে

দাঁড়ালেন। প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'কলকাতায় আর ক'দিন আছি? এরপর তো চন্দনপুরেই যেতে হবে?'

মনোরমা তির্যক দৃষ্টিতে স্বামীকে একবার লক্ষ্য করল। ফের মুখ নামিয়ে বলল, 'চন্দনপুর যাবার কথা বলছ বটে। কিন্তু তোমার ছেলে-মেয়েরা কেউ যাবে বলে মনে হয় না।'

—'না গেলে চলবে কেন?' বাণীব্রত ধীরে ধীরে বললেন, 'রিটায়ার করছি। এবার দেশে গিয়ে থাকব। বেশ গা এলিয়ে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করছে।

মনোরমা মুখ না তুলেই বলল, 'বিশ্রাম তো কলকাতাতে থেকেও করতে পার। রিটায়ার করলেই কি সবাই দেশে যায়?'

—'যায় বৈকি। কলকাতা হল বিদেশ। সেই কোন বয়সে পেটের ধান্দায় কলকাতায় এসেছিলাম। এতদিন রইলাম। রোজগার-পত্তর করলাম। কিন্তু আর কেন? এবার নিজের দেশে ফিরি। তাছাড়া কলকাতায় থাকব কোথায়? এখানে কি আমার বাড়িঘর আছে?

মনোরমা এবার চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল। প্রায় জেরা করার মত ভঙ্গিতে শুধোল, 'যাদের বাড়ি-ঘর নেই তারা বুঝি কলকাতায় থাকে না? তুমিই বা এতকাল ছিলে কোথায়?'

বাণীব্রতর একটু রাগ হল। মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'কোথায় ছিলাম তা নিশ্চয় তোমার অজানা নয়। কিন্তু রিটায়ার করার পর সেখানে থাকব কেন? খাঁচার মত আড়াইখানা ঘর, এক ফালি বারান্দা। উঠোন নেই.... মাথার উপর একটুকরো আকাশও চোখে পড়ে না। এতদিন উপায় ছিল না, তাই মুখ বুজে কাটিয়েছি আর ভাড়া গুনেছি।—'

মনোরমা ব্যঙ্গ করে বলল, 'রিটায়ার করে তাহলে তোমার চন্দনপুরের প্রাসাদে গিয়ে উঠবে।'

বাণীব্রত খোঁচাটা গায়ে মাখলেন না। হেসে উত্তর দিলেন, 'প্রাসাদ' বলে উপহাস করছ কেন? ওটা তোমার শ্বশুরবাড়ি। তবে হ্যাঁ এখন বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়। উপর-নীচে মিলিয়ে খান ছয়েক ঘর। খোলামেলা উঠোন। খানিকটা বাগানও আছে। ইচ্ছে করলে তরি-তরকারি লাগাও

কিংবা ফুল-বাগিচাও করতে পার।' বাণীব্রত হঠাৎ কি যেন ভাবতে শুরু করলেন। একটু পরে অন্যমনস্কের মত বললেন, 'বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোনায় একটা গন্ধরাজ গাছ ছিল মনে আছে? বাবা বর্ধমান থেকে চারা জোগাড় করে এনে লাগিয়েছিলেন? সেই গাছ এখন ডালপালায় প্রকাণ্ড হয়েছে। সারা বছর নাকি অজস্র ফুল ফোটে। গ্রীষ্মকালে পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে গাছে ওঠে। ডালপালা ভাঙে আর ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়।'—

উঠোনে দাঁড়িয়ে বাণীব্রত অনেক কথা ভাবছিলেন। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন গন্ধরাজ গাছটায় আজও দুটো ফুল ফুটেছে। এই কার্তিকের হিমে আর শিশিরে ফুল ফোটার কথা নয়, কিন্তু গাছটা এমনিই। বারোমাস ফুল হয়। কোনো ঋতুই বাদ যায় না।

বেশ নীচের ডালে একটা ফুল। আর একটি অল্প উঁচুতে। একবার মনে হল ফুল দুটো গাছ থেকে তুলে আনবেন। কলকাতায় নিয়ে যেতে ইচ্ছে করল। পরক্ষণে ভাবলেন, কি হবে নিয়ে? কাল সকালে বাড়ি পৌঁছবার আগেই ফুল দুটো শুকিয়ে যাবে। বাসি ফুলের আদর দেখে মনোরমা মুচকি হাসবে। সে তার ভাল লাগবে না।

বিড়িতে শেষ টান দিয়ে জোয়ান লোকটা এবার উঠে দাঁড়াল। পোড়া বিড়িটা একটু দূরে ফেলে দিয়ে বলল 'খুড়োমশায়, আর দেরী করলে টেরেন ফেল হবেন।'

সাবধানবাণী শুনে বাণীব্রত দ্রুত আত্মস্থ হলেন। বললেন, 'হ্যাঁ চল, এবার বেরিয়ে পড়ি। আর দেরি করব কেন? দরকার কি?'

পেয়ারাগাছের ঘন সন্নিবদ্ধ পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের অস্তসূর্যের রশ্মি মাটির উপর এসে পড়েছে। রান্নাঘরের চাল থেকে তিন চারটে শালিখ ছোট ছেলেমেয়ের মত লাফাতে লাফাতে উঠোনে নেমে কলরব শুরু করল। বাড়ির ভিতরটা চুনকাম……কিন্তু বাইরেটা রঙ করিয়েছেন বাণীব্রত। হলুদ রঙ……কোথাও খয়েরি বর্ডার। বিকেলের মরা আলোয় নবসাজে বাড়িটা কি অপরূপই না দেখাচ্ছে।

পথে গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে। ছইতোলা গাড়ি। পুরু করে খড় বিছিয়ে ভিতরটা গদির মত করা হয়েছে। উপরে একটা পুরু শতরঞ্চ

বিছানো। বাণীব্রতর সঙ্গে তেমন জিনিসপত্র নেই। পুরানো একটা চামড়ার স্যুটকেস। ওতেই তার জামাকাপড় অন্যান্য জিনিসপত্র রয়েছে। বিছানাপত্তর আনার দরকার হয় নি। চন্দনপুরের বাড়িতে একপ্রস্থ সবই আছে। চামড়ার স্যুটকেস ছাড়া আর একটি জিনিসও বাণীব্রত সঙ্গে নিয়েছেন। এক পায়া গুড়। চন্দনপুরের গুড় খুব ভালো। কলকাতায় এমন বস্তু সচরাচর মেলে না। গুড়ের কলসীটা গাড়িতে তোলা হয়েছে দেখে বাণীব্রত যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

সাইকেলে করে হীরালাল সেন আসছিল। চন্দনপুরে ব্যবসা করে হীরালাল। গোলদারী দোকান। বেশ ফলাও কারবার। এ অঞ্চলে এত বড় দোকান আর নেই।

বাণীব্রতকে দেখে হীরালাল সাইকেল থেকে নামল। শুধোল, 'আজ চললেন নাকি?'

—'হ্যাঁ, ছুটি ফুরিয়ে গেল, আর তো থাকা যায় না। তবে ফের আসছি। মাস তিন-চার পরেই।' একটু থেমে ফের বললেন, 'চাকরির দিন ফুরিয়ে এল হে। আর তিন মাস মোটে মেয়াদ।'

—'আজ্ঞে কথাটা আমিও শুনেছি।' হীরালাল একটু হাসবার চেষ্টা করল। শুধোল 'রিটায়ার করে আপনি নাকি গ্রামেই থাকবেন?'

—'হ্যাঁ, চন্দনপুর ছাড়া আর কোথায় যাব বল? কলকাতায় গেছলাম চাকরি করতে। পেটের জন্যে এতদিন থেকেছি। নইলে সেখানে আমার কে আছে? বাড়ি-ঘরও করতে পারিনি।'

—'তা ঠিক।' হীরালাল একটু চিন্তা করে বলল, 'তবে এতদিন কলকাতায় রইলেন। শহরের মানুষ হয়ে গিয়েছেন। বুড়োবয়সে গ্রামে ফিরে আপনার হয়তো খুব অসুবিধে হবে।'

—'অসুবিধে কিছু হবে না।' বাণীব্রত স্পষ্ট জানালেন, 'কেন অসুবিধে হবে বলো ত? আমি গ্রামের লোক নই? তিরিশ বছর না হয় কলকাতায় আছি। কিন্তু তার আগে পঁচিশ-তিরিশ বছর তো এই চন্দনপুরেই কাটালাম।'

হীরালাল কোনো জবাব দিল না। সাইকেলটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

বাণীব্রত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার বাবার একটা কথা শুনবে হীরালাল? উনি কি বলতেন জানো?'

'কি বলতেন?' হীরালাল দাঁত বের করে হাসল।

—'বাবা বলতেন, গাঁয়ে-মায়ে সমান। গ্রাম হল মায়ের মতন। ছেড়ে গেলে মাকে ফেলে গেলি জানবি।'

কথাটা হীরালালের মনে ধরল। সে খুসি হয়ে বলল, 'তা যা বলেছেন। বিপদে-আপদে গাঁয়ের লোকে যেমন করবে, তেমনটি কোথায় পাবেন? আর কলকাতার যা হালচাল এখন। কাগজে তো সব খবরই পাই। গাঁয়ে বসেই আমাদের মনে ভয় ধরে। হাত-পা পেটের ভিতরে সেঁধোয়। নিজেরাই ভাবি, কলকাতায় মানুষজন সব আছে কেমন করে?'

বাণীব্রত হেসে বললেন, 'অতখানি ভয় পাবার মত কিছু নয়। গণ্ডগোল, হাঙ্গামা অবশ্য নিত্যি লেগে আছে। কিন্তু তাই বলে ঘরের দরজা এঁটে কেউ বসে নেই। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, সিনেমা-থিয়েটার, বিয়ে-সাদি সব চলছে। পথে-ঘাটে ট্রাম-বাস বেরুচ্ছে। কিছুই বন্ধ থাকছে না। তাছাড়া আমাদের পাড়াটাও মোটামুটি ভালো। মারামারি কাটাকাটি এখনও শুরু হয়নি।'

হীরালাল শুধোল, 'আপনার বাসাটা কোথায় যেন?'

—'অমিয় বারিক লেনে। ঐ আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে রাস্তাটা।' একটু অমায়িক হেসে বাণীব্রত ফের বললেন, 'তুমি কিন্তু কলকাতায় গিয়ে একবারও বাসায় যাওনি।'

হীরালাল লজ্জিত হয়ে বলল, 'আজ্ঞে কলকাতা এক-আধবার যাই বটে, কিন্তু কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে ঢুকি, সব সেরে আর কোথাও যাবার ফুর্সত পাই না।'

জোয়ান লোকটার নাম হারান। গোরুর গাড়িটা তার। স্টেশনে পৌঁছে দেবে বলে ভাড়া খাটতে এসেছে। সে ব্যস্ত হয়ে বলল,—'আর দেরি করবেন নাই। হাই দেখুন, রোদ্দুর একেবারে আশুথ গাছের মগডালে। বেলা ডুবল বলে—'

অগত্যা বাণীব্রত গাড়িতে উঠে বসলেন। পড়ন্ত বেলা, রোদ্দুর আর

নেই। বড় গাছের মগডালে, শিবমন্দিরের চূড়োয়, ইস্কুল-বাড়িটার মাথায় এখনও এক চটকা রোদ্দুর লেগে আছে। গ্রাম্য পথ। অপরিসর রাস্তা। ধুলো উড়িয়ে একদল ছেলেমেয়ে কলরব করে কি যেন খেলছে। গরুর গাড়ি আসছে দেখে তারা রাস্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। খানিকটা গেলেই একটু বাজার মতন জায়গা। তিন চারটে ময়রার দোকান, ছোট একটা মাঠ। শনি-মঙ্গলবারে এখানে হাট বসে। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে পথটা এবার এক প্রান্তরে গিয়ে পড়ল।

গাড়িতে বসেই বাণীব্রত বাড়িটা লক্ষ্য করছিলেন। আশেপাশে আর উঁচু বাড়ি নেই বলে দোতলাটা এখনও চোখে পড়ছে। দেওয়ালে ফিকে হলুদ রঙ······কার্ণিশের একটু নীচে পর্যন্ত খয়েরী বর্ডার আছে। তাই আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। এবারও প্রায় হাজার খানিক টাকা খরচ হল। বাণীব্রত মনে মনে একবার হিসেবটা ঝালিয়ে নিলেন। বাঁকুড়া থেকে সিমেণ্ট আর রঙ আনতেই প্রায় আড়াইশ টাকা বেরিয়ে গেছে। তারপর ইট লেগেছে, চুন, বালি, দড়াদড়ি মেরামতির কাজে এটা সেটা আরো কত জিনিষ প্রয়োজন হল। প্রতিটি বস্তুই তাকে পয়সা খরচ করে কিনতে হয়েছে। আর আজকাল যা দাম। জিনিসপত্রের দর অগ্নিমূল্য, তাও মাঝে-মধ্যে পয়সা দিলেও মেলে না।

বাণীব্রতর ফের বাবার কথা মনে পড়ল। সেকেলে মানুষ। কেউ ঘর করবে শুনলে বলতেন, 'তুমি এবার ঘোরে পড়লে হে। এ ঘোর এখন কাটবে না।'

সে শুধোত, 'ঘোর কিসের আজ্ঞে? ঘরের সঙ্গে ঘোরের কি সম্পর্ক?'

—'ঘোর নয়?' বাবা হেসে বলতেন,—'ঘর মানেই তো ঘোর হে, বিষয় অর্থই বিষ। ঘরের নেশা বড় পাজি নেশা হে। যতদিন না শেষ করছ, ততদিন তোমার ঘোর রইল, আবার শেষ হলেই যে ঘোর কাটবে তাও জোর করে বলতে পার না।'

গ্রাম অনেক পিছনে। সামনে গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথ। এ অঞ্চলের চেহারাই এমনি। লাল মোরাম ছড়ানো মাটি। ডাঙা-ডুহরে ভর্তি। নিকটে-দূরে ধানের ক্ষেত। গ্রামের ধারে মাঠের উপর ধোঁয়ার

আস্তরণ। হাওয়া নেই বলে ধোঁয়াটা পুরু চাদরের মত ভাসছে। এক চুল নড়ে না।

বাণীব্রত ভাবছিলেন তাকেও কি ঘরের নেশায় পেল? বাড়ির নেশা। তার বাবা বলতেন ঘর নয়,..........ও হল বিষম ঘোর। তারও কি তবে ঘোরে কাটছে?

চন্দনপুরে আসার আগের রাত্তিরে মনোরমাও তাই বলছিল। পরদিন সকাল আটটায় ট্রেন। বাণীব্রত একটু তাড়াতাড়ি শুতে গেলেন। সারাদিন ট্রেন-জার্নির ধকল আছে, রাতে একটু সুনিদ্রা না হলে গা ম্যাজম্যাজ করবে। আজকাল বয়স হয়েছে। এতটুকু অনিয়ম সহ্য হয় না।

আড়াইখানা মোটে ঘর। ছোট ঘরটা ছোট ছেলের জন্য। সে রাত্তিরে শোয়, পড়াশুনো করে। সকাল-সন্ধ্যে বিস্তিও বই নিয়ে বসে। বাকি দু'খানা ঘরের একটাতে মিলন আর কিরণ থাকে। অন্যটি বাণীব্রতর। ঘরে একটা পালঙ্ক আছে। তার উপর বিছানা। মনোরমা মেয়েকে নিয়ে মেঝেতে শোয়। আর একখানা খাট রাখবার মত জায়গা নেই। নইলে বাণীব্রত হয়তো আর একখানা খাট কিনতেন। মেঝেতে শুতে হয় বলে বিস্তি মুখে কিছু বলে না বটে, কিন্তু রাত্তিরে শোবার সময় এমন ব্যাজার মুখে দাঁড়ায় যে তার অপ্রসন্ন ভাবটুকু সহজেই ধরা পড়ে।

কতক্ষণ চোখ বুঁজেছিলেন মনে নেই। আচমকা তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘাড়ের কাছে চুলের মধ্যে অতি পরিচিত করস্পর্শ। বাণীব্রত বুঝতে পারলেন মনোরমা মেয়ের কাছ থেকে উঠে তাঁর পাশে এসে বসেছে।

মুখ না ফিরিয়েই তিনি শুধোলেন, 'বিস্তি ঘুমিয়েছে?'

—'কি জানি বাপু।' মনোরমা ফিস ফিস করে বলল। 'মনে তো হয় ঘুমিয়েছে। বড় মেয়ে, যদি হঠাৎ জেগে ওঠে, আমাকে পাশে না দেখলে কি ভাববে বলো ত?'

—'কি ভাববে আবার?' বাণীব্রত একটু হেসে স্ত্রীর হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন, 'শোও এখানে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

—'এখানে শোব?' ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনোরমা একটু ইতস্তত করল।

—'শোবে না কেন ?' বাণীব্রত ফের হাসলেন। উঁকি দিয়ে মেয়েকে দেখে বললেন, 'বিস্তি এখন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। ও উঠবে না।

বালিশে মাথা রেখে শুতেই বাণীব্রত একটা হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলেন। মনোরমা দুর্বল গলায় বলল, 'আঃ ছাড়ো। রাত দুপুরে কি টানাটানি করো—'

ঘরে আবছা অন্ধকার, তবু স্ত্রীর মুখখানা দেখতে পাচ্ছিলেন বাণীব্রত। মনোরমার বয়স হয়েছে,—তা প্রায় সাতচল্লিশ হবে। বাণীব্রতর চেয়ে আট বছরের ছোট। কিন্তু এই বয়সেও মনোরমার শরীরের আশ্চর্য বাঁধুনী। মুখখানা ঠিক লম্বাটে নয়, বরং ঈষৎ গোল। কিন্তু গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে। বিস্তি সুন্দরী ঠিকই। তবু বাণীব্রতের মনে হয় ওর বয়সে মনোরমার গড়ন, দেহশ্রী আরো সুন্দর ছিল।

—'আর একটা বাড়তি ঘর থাকলে কোনো চিন্তার ছিল না', মনোরমা আগের মতই ফিসফিস করে কথা কইল।

ছোট বাড়ি বলে স্ত্রীর মনে খেদ আছে। বাত-ব্যাধির মত ব্যথাটা প্রায়ই চাগিয়ে ওঠে। বাণীব্রতর সে কথা অজানা নয়। স্ত্রীর খেদোক্তি শুনলে বাণীব্রত তাই চুপ করে থাকেন। কোনো মন্তব্য করেন না।

কিন্তু আজ ব্যতিক্রম। বাণীব্রত তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঘরের দুঃখ এবার তোমার ঘুচবে। চন্দনপুরের বাড়িতে ছ'খানা ঘর। জনে জনে একখানা করে ঘর নিলেও এক-আধটা ঘর বাড়তি থাকবে'।

—'রিটায়ার করে তুমি তাহলে চন্দনপুরেই যাবে ?' মনোরমা শক্ত গলায় শুধোল।

—'না গিয়ে উপায় কি বলো ? আর কলকাতায় থাকব কেমন করে। মাস গেলে আট'শ টাকা মাইনে পাচ্ছিলাম। রিটায়ার হলে পর একটি কানাকড়িও আসবে না। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্রাচ্যুইটির টাকা কটা সম্বল। তাই ভেঙে কদিন খাবো ?'

—'তখন সংসার কি তোমায় চালাতে হবে ?' মনোরমা সান্ত্বনা দেবার ঢঙে বলল। 'ছেলেরা বড় হয়েছে। এখন ঘর-সংসারের দায়িত্ব তাদের। তুমি যা পার দিও।'

মেয়েলি যুক্তি। বাণীব্রত তাই হেসে ফেললেন। বললেন, 'পাগল নাকি। ওরা চালাবে কেমন করে? ছেলেরা কি রোজগারপাতি করে নিশ্চয় জানো। মিলনকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালাম। আশা ছিল ও একটা ভালো চাকরি করবে, কিন্তু ওর কপাল। দু'বছর বেকার হয়ে রইল, এখন যা চাকরি করে, তার মাইনে যাই হোক তবু সেটা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ নয়।

স্ত্রীকে নীরব দেখে বাণীব্রত ফের বললেন, 'আর কিরণের কথা বাদ দাও। ও বেচারি সবে ডাক্তারি পাশ করে হাউস-সার্জেন হয়েছে। শ'দেড়েক টাকার মত অ্যালাউন্স পায়। তাতে ওর নিজেরই চলে না। ঘর-সংসার দেখবে কেমন করে?'

তবু মনোরমা বলল, 'আস্তে আস্তে ওদের রোজগার বাড়বে। এর মধ্যে মিলন যে একটা ভালো চাকরি পাবে না, তাই কি তুমি বলতে পারো?'

—'কি জানি'। বাণীব্রত খুব হতাশভঙ্গি করলেন। 'যদি পায় তো ভালই। কিন্তু এই অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করে আমি কলকাতায় থাকতে পারি না।'

—'তা পারবে কেন?' মনোরমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে জানাল। 'চন্দনপুরে গেলেই তোমার যত সাশ্রয় হবে। সেখানে খরচপত্তর নেই, জিনিসপত্র সব বিনিপয়সায় মিলবে।'

বাণীব্রত কোনো কথা বললেন না। স্ত্রীকে তিনি ভালো করে চেনেন। মনোরমা ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। চন্দনপুরে যাওয়ার পক্ষে যত অকাট্য যুক্তিই থাক না কেন, কোনোটাই এখন তার মনে ধরবে না।

স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে মনোরমা উঠে বসল। বলল, 'সব মিছে কথা, খরচপত্র চালাতে পারবে না বলে তুমি চন্দনপুরে যাচ্ছ, এই কথা আমাদের বিশ্বাস করতে বলো? সেখানে বুঝি সংসারের পিছনে টাকা গুনতে হবে না? আসলে ওই বাড়ি তোমার নেশা। আর সেই টানে তুমি ছুটে চলেছ।

—'নেশা? কি বলছ তুমি?' বাণীব্রত ভ্রুকুঁচকে তাকালেন।

—'নেশা নয়তো কি? নইলে এদিকে টাকা নেই বলছ, অথচ বাড়ি সারাবার বেলায় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বেরোয় কেমন করে?'

নীচে বিছানায় শুয়ে বিন্তি উসখুস করছিল। বাণীব্রত তাই চুপ করে গেলেন। মনোরমার জিভকে বিশ্বাস নেই। রাতদুপুরে চেঁচামেচি, কলহ শুনে মেয়েটা কি ভাববে—।

* * * *

খুব ভোরে ট্রেন এসে হাওড়া স্টেশনে ঢুকল। তখনও প্রায় অন্ধকার, ভালো করে আলো ফোটে নি। কলরব করে কয়েকটা কাক একসঙ্গে ডেকে উঠল। আকাশের বুকে একটি দুটি তারা স্পষ্ট না হলেও এখনও চোখে পড়ে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাণীব্রত একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন। অত ভোরে পথ-ঘাট বেশ ফাঁকা। গাড়ি প্রায় পাখির মত উড়ে চলল।

অমিয় বারিক লেনের কাছে আসতেই বাণীব্রত চমকে উঠলেন। গলির মুখেই একটা পুলিশের গাড়ি। জন দশ-বারো রাইফেলধারী পুলিশ সদর্পে ঘোরাফেরা করছে। তার ট্যাক্সিটা গলিতে ঢুকতেই একজন সার্জেন্ট এগিয়ে এসে শুধোল, 'কোথায় যাবেন আপনি ?'

বাণীব্রত ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করতে না পেরে আমতা আমতা করে বললেন,—'ইয়ে, আমার বাড়ি যাব। মানে সাত নম্বর অমিয় বারিক লেন।'

গাড়িটার ভিতরে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে সার্জেন্ট তাকে যাবার অনুমতি দিল।

## ॥ দুই ॥

অত ভোরে বাড়িশুদ্ধ সকলে জেগে। চা-পর্ব শুরু হয়েছে। টেবিলের উপর ধূমায়িত পেয়ালা। মিলন আর কিরণ দুদিকে মুখোমুখি বসে। দু ভাইয়ের হাতেই খবরের কাগজ। ভাগাভাগি করে পড়ছে। খানিকটা দূরে মনোরমা রয়েছে। তারও হাতে চায়ের কাপ। ভীষণ চা-খোর

মনোরমা। সারাদিনে যে ক'কাপ চা পেটে যায় তার ঠিক নেই। মেঝের উপর পা ছড়িয়ে মনোরমা বসেছে। এক পাশে চায়ের সরঞ্জাম। কেৎলী, ছাঁকনিতে চায়ের পাতা। ছুটো ডিস···একটা কাপ। স্টোভটা এখনও জ্বলছে। তবে জোরে নয়। কল ঘুরিয়ে পলতে কমিয়ে দিয়েছে। তাই সাপের জিভের মত লকলকে আগুনের শিখা অল্পস্বল্প উঁকি দিচ্ছে।

তাকে দেখে বিন্তি সহর্ষে বলল—'ওমা! বাবা এসে গেছে।' চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সে প্রায় নাচের ভঙ্গিমায় বাপের কাছে দৌড়ে এল। হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে শুধোল,—'আর কিছু আনোনি বাবা?'

দেশ থেকে বাণীব্রত শুধু হাতে ফেরেন না। নিজের মালপত্র ছাড়াও আরো কিছু সঙ্গে থাকে। একটু ভালো ঘি, কিম্বা খানিকটা সরু চাল। নিদেনপক্ষে সামান্য তরকারিপত্র। সঙ্গে কিছু আনবেনই। একবার চন্দনপুর থেকে একটা বড় রুই মাছ সঙ্গে এনেছিলেন। সেকথা বাড়ির সকলেই জানে। অথচ এবার তার হাতে নিজের সুটকেসটি ছাড়া আর কিছু নেই। মনোরমাও তা লক্ষ্য করে অবাক হয়েছে। কিন্তু মুখে কিছু বলে নি। আর বিন্তি চুপ করে না থাকতে পেরে কথাটা বাবাকে শুধিয়েছে।

মেয়ের প্রশ্নটা বাণীব্রতর কানে অবশ্য ভালোই লাগল। দেশ থেকে বাবা কিছু আনল কিনা মেয়ে খোঁজ করেছে। পয়সা দিলে কলকাতায় সবই মেলে। তবু নিজের গ্রাম-ঘরের জিনিসের সঙ্গে স্মৃতির একটা অদৃশ্য সুতোর বন্ধন। তার স্বাদই আলাদা। সেবার চন্দনপুর থেকে একটা কুমড়ো এনেছিলেন বাণীব্রত। বেশী বড় নয়, মাঝারী আকার। তাঁর উঠোনেই একটা গাছ হয়েছিল। পাঁচ-ছটা কুমড়ো ফলেছিল গাছে। সেই কুমড়োই একটা সঙ্গে করে এনেছিলেন। বাড়িতে সামান্য জিনিসটা নিয়ে কি হৈ-চৈ। হিরণ আর বিন্তি তখন অনেক ছোট। ছুজনে কুমড়োটা নিয়ে প্রায় কাড়াকাড়ি শুরু করেছিল। শেষে মনোরমা ভাই-বোনকে ধমক দিয়ে সেটা সরিয়ে রাখে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বাণীব্রত মুচকি হাসলেন। বললেন—'এবারও একটা জিনিস এনেছি রে বিমু।'

—'কি জিনিস বাবা।' বিন্তি সাগ্রহে শুধোল।

বাণীব্রত লক্ষ্য করলেন, বড়-মেজ দুই ছেলেরই দৃষ্টি চঞ্চল। মনোরমাও উৎসুক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দেশ থেকে কি এনেছেন, তা সকলেই জানতে চায়।

তবু রহস্য করে তিনি মেয়েকে শুধোলেন,—'কি এনেছি তুই বল,—'

বাণীব্রতর সঙ্গে আর কিছু নেই। হাতও খালি। মেয়ে তাই শূন্য দৃষ্টিতে বাপের দিকে তাকিয়ে রইল।

মনোরমা আর থাকতে না পেরে বলে উঠল,—'এ তো ভারী মজা! তুমি কি সঙ্গে করে এনেছ, ও কেমন করে বলবে ?'

বড় ছেলে মিলনও মাকে সমর্থন করল। সে হেসে বলল,—মা তো ঠিক কথাই বলেছে বাবা। চন্দনপুর থেকে তুমি কি এনেছ, বিস্তি কেমন করে বলবে ?'

বাণীব্রত এবার আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বললেন,—বেশ তাহলে বিস্তি গিয়ে জিনিসটা নিয়ে আসুক।'

—'কোথায় আছে বাবা ?' বিস্তি সাগ্রহে তাকাল।

—সিঁড়ির মুখে নামিয়ে রেখে এসেছি। একটু ভারী বলে আর বয়ে আনতে পারলাম না।

বিস্তি তক্ষুনি ছুটল। বাণীব্রত বড় ছেলের পাশে একটা চেয়ারের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বসলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—ভোরে চায়ের পাট চুকিয়ে দিচ্ছ।' ফের মেজ ছেলেকে লক্ষ্য করে একটু পরিহাস করে শুধোলেন,—'কিরণ যে আজ সুয্যিঠাকুরকেও হারিয়ে দিলি।'

কথাটা মিথ্যে নয়। কিরণ ভীষণ লেটরাইজার। অনেক রাত্তিরে ঘুমোয়। ওঠেও তেমনি দেরীতে। সূর্যোদয় দূরে থাকুক, সাড়ে সাতটার আগে তার ঘুমই ভাঙে না। আর ছুটি-ছাটার দিন হলে তো কথাই নেই। বেলা আটটা অব্দি কিরণ বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকবে।

মনোরমা বলল,—'ও কি এখন উঠেছে ? আমরা সবাই রাত্তির চারটে থেকে উঠে বসে আছি।'

—'রাত চারটে থেকে ? কেন, হয়েছে কি ?' বাণীব্রত অবাক হয়ে তাকালেন।

মুখের উপর থেকে কাগজটা সরিয়ে রেখে মিলন কথা কইল। ব্যাপারটা আমি খুলে বলছি বাবা। তবে ঠিক-ঠিক কি হয়েছে তা অবশ্য আমরাও কেউ জানিনে। রাত চারটের সময় বিকট একটা বোমার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কি প্রচণ্ড আওয়াজ! বাড়িটা যেন থর থর করে কেঁপে উঠল।

—বলিস কি? এত জোর শব্দ!' বাণীব্রত ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

মনোরমা চোখ বড় বড় করে বলল,—শুধু কি তোর ঘুম ভেঙেছে মিলু? শব্দ শুনেই আমার বুকের ভিতরটা যেন ধড়ফড় করে উঠল। তাকিয়ে দেখি বিস্তি বিছানার উপর উঠে বসেছে। আর বোমা কি একটা ফাটল রে? পর পর কটা যে আওয়াজ হল কে জানে। পাঁচ-ছটা তো খুব হবে। একটা বোধহয় আমাদের বাড়ির কাছেই ফাটল, তাই না রে মিলু?'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে মনোরমা ফের বলল,—'কানে আমার তালা ধরে গেছে বাপু।'

কিরণ মুখ না তুলেই মন্তব্য করল,—'মা খুব ভয় পেয়েছিল বাবা, বুঝলে?'

মনোরমা একটুও প্রতিবাদ করল না। বরং হেসে বলল,—'ভয় আবার পাই নি? যখন বোমাগুলো ফাটছিল তখন আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করছি। আর শুধু বোমা নাকি? কি হৈ-হৈ আর চিৎকার। যেন কুরুক্ষেত্তর যুদ্ধু চলছে রাস্তায়। আমি ভয়ে কাঁটা। কিন্তু বিস্তিটার সাহস আছে গো। বলে—মা ছাদে যাই চল। মারপিট গণ্ডগোল ভালো করে দেখতে পাব।'

—তোমরা ছাদে গিয়েছিলে?'

—'পাগল হয়েছ নাকি? ছাদে যাই, তারপর একটা বোমা এসে ঘাড়ের উপরে পড়ুক।'

মনোরমার কথা শুনে কিরণ হি-হি করে হাসল। বলল,—'মায়ের কি ভয় জানো বাবা? ছাদে যাওয়া দূরে থাক, আমাদের একবার দরজা পর্যন্ত খুলতে দেয় নি।'

মিলন আবার খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোবে ভাবছিল। বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, —'গণ্ডগোল অবশ্য বেশীক্ষণ ছিল

না। আধ ঘণ্টা পরেই সব থেমে-টেমে গেল। বোধহয় পুলিশের গাড়ি-টাড়ি শেষকালে এসেছে।'

বাণীব্রতর কপালে ধনুকের মত বাঁকা চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। চিন্তিত মুখে তিনি বললেন,—'গলির মুখে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। রাইফেল হাতে ক'জন পুলিশও রয়েছে। একজন সার্জেণ্ট তো আমার ট্যাকসিটা থামিয়ে উঁকি দিয়ে কি যেন দেখল।'

কিরণ ব্যঙ্গ করে শুধোল,—'শেষ পর্যন্ত পুলিশ তোমার মালপত্র সার্চ করল বাবা?'

—'না, মানে ঠিক সার্চ নয়। মালপত্র কিছু ছ্যাখে নি, এমনি উঁকি দিয়ে গাড়ির ভিতরটা একবার দেখে নিল।' একটু থেমে বাণীব্রত ফের বললেন,—'কিন্তু আমাদের পাড়ায় তো গণ্ডগোল আগে ছিল না মিলু।'

কিরণ হেসে বলল,—'আগে ছিল না তো কি হয়েছে? গণ্ডগোলটা যে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে বাবা। আমাদের পাড়াই বা বাদ থাকবে কেমন করে?'

—'তা বটে', বাণীব্রত ফের চিন্তা শুরু করলেন।

স্টোভটা কখন নিভে গেছে। মনোরমা লক্ষ্য করেনি। সেটা আবার জ্বালাতে হল। চায়ের কেৎলিতে জল গরম করতে দিল মনোরমা। বাণীব্রত এখুনি চা চাইবেন। মেজ ছেলে কিরণেরও চায়ের নেশা আছে। দিনে পাঁচ-সাত কাপ চা সে খায়। তাকেও এক কাপ দিতে হবে। মনোরমা কতদিন বলেছে,—'ঘণ্টায় ঘণ্টায় অত চা গিলিস কেন? এত চা খেলে খিদে নষ্ট হবে যে।' শুনে কিরণ মুচকি হাসে। বলে,—'তুমি নিজে খেলে দোষ হয় না মা? তোমার খিদে-তেষ্টা বলে বুঝি কিছু নেই?'

ছেলের সঙ্গে কথায় কে পারবে? ও তার কম্মো নয়। মনোরমা তাই চুপ করে যায়। চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে,—'তবে খেয়ে নে, ডাক্তারি পড়েছিস, শরীরের ভালো-মন্দ নিজেই ভালো বুঝবি।'

হাঁপাতে হাঁপাতে বিন্তি এসে পৌছল। পায়াটা বেশ ভারী। অনেক কসরৎ করে সে উপরে তুলে এনেছে। কোনোমতে মেঝের উপর কলসীটা নামিয়ে রেখে সে চেঁচিয়ে উঠল,—'মা দেখে যাও। কত বড় গুড়ের পায়া।'

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে মনোরমা তখুনি উঠে এল। একনজর তাকিয়ে বলল,—'ওমা। চন্দনপুর থেকে গুড় এনেছ বুঝি?' পরে কলসীটা সামান্য একটু তুলে সে ওজন বুঝতে চাইল। এক চিলতে হেসে বলল,—'তা তের-চোদ্দ সের খুব হবে, তাই না গো?'

বাণীব্রত মুখ তুলে বললেন—'পায়াটায় সাড়ে সতেরো সের গুড় আছে।'

—'তাই বলো বাবা।' বিস্তি ঘাড় দুলিয়ে কথা কইল, 'কি বিষম ভারী কলসীটা। তুলে আনতে আমার হাত দুটো একেবারে ছিঁড়ে গেছে।'

সংসারে প্রয়োজনীয় জিনিস পেলে গৃহিণী মাত্রেই খুশি। মনোরমার চোখেমুখে সেই আহ্লাদের আলো। মেয়েকে লক্ষ্য করে সে বলল,—'তা বিস্তি আজ খুব জব্দ হয়েছিস, চন্দনপুর থেকে তোর বাবা কি নিয়ে এল কিছুতেই বলতে পারলি না।'

বিস্তি হাত ঘুরিয়ে, চোখ নাচিয়ে বলল,—'আহা! আমি একা বুঝি? তোমরাও তো সব চুপচাপ ছিলে। চন্দনপুর থেকে বাবা কি এনেছে, কেউ বলতে পারনি।'

বাণীব্রত বললেন,—'অমূল্য মোড়ল গুড়ের পায়াটা জোগাড় করে দিল। তার ভাগ্নে-জামাইয়ের ঘরে একটা মোটে পায়া ছিল। নইলে এখন কি গুড়ের সময়? আর কিছুদিন পরে খেজুর গুড় উঠবে। তারপর আখের গুড়। আমাদের বাঁকড়ো জেলায় চন্দনপুরের গুড় বিখ্যাত, খুব নাম-ডাক। এমন গুড় কলকাতায় কিনতে পাবিনে।

গুড়ের কলসীটা তুলে নিয়ে মনোরমা ঘরের মধ্যে ঢুকল।

বিস্তি শুধোল,—'বাবা তুমি মুখ-হাত ধোবে না? মা চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে কিন্তু—'

বাণীব্রত বললেন,—'হাওড়া স্টেশনে নামার আগে গাড়িতেই মুখ-হাত ধুয়েছি। ওতেই চলবে। আগে এক কাপ চা খাই। তারপর বাথরুমে ঢুকব। একেবারে চান-টান সেরে বেরুবো ভাবছি।'

মিলন শুধোল,— 'তোমার বাড়ি-ঘর সারানো হল বাবা?'

—'হ'ল একরকম করে। তোরা তো কেউ সঙ্গে গেলিনে। বুড়োমানুষ, —একা একা যতটুকু সম্ভব তাই হয়েছে।'

কিরণের কাগজ পড়া শেষ হয়েছিল। সে বলল,—'রিটায়ার করে তুমি কি চন্দনপুরেই থাকবে বাবা?' ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখেছ?'

বাণীব্রত ছেলের হাত থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বললেন—'আর কি ভাববো বল? মাস তিন পরেই রিটায়ার করতে হবে। আট'শ টাকা মাইনে পাচ্ছি। অবসর নিলে একটি কানাকড়িও আসবে না। কলকাতায় থাকলে সংসার চালাব কেমন করে?'

মনোরমা গরম জলে চায়ের পাতা ভিজতে দিল। এদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,—'তোমার ওই এক বুলি। রিটায়ার করলে সংসার চালাবে কেমন করে? চন্দনপুরে গেলে বুঝি খরচপত্তর লাগবে না? সেখানেও জিনিসপত্র কিনেকেটে খেতে হবে। তাহলে মরতে পাড়াগাঁয়ে যাওয়া কেন।

বাণীব্রত মৃদু হাসলেন, মনোরমার পাল্টা যুক্তি। চন্দনপুরে কি নিখরচায় থাকা যাবে? আর কী জায়গা....যেন ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। মাইল চার দূরে রেলইস্টিশন। দত্যি-দানোর মত বড় বড় গাছ। কাঁচা পথের দুপাশে খেজুর, কালকাসুন্দে আরো কত আগাছার বনঝোপ। রাত এক প্রহর না হতেই গ্রাম নিঝুম....নিঃসাড়। অসুখ-বিসুখ করলে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে। তাহলে চন্দনপুরে যাবার জন্যে এত মাথাব্যথা কিসের?—

—'খরচপত্র নিশ্চয় অনেক কম লাগবে।' বাণীব্রত স্ত্রীকে বোঝাতে চাইলেন। 'এই ধরো মাস গেলে আশী টাকা ভাড়া গুণছি। চন্দনপুরে গেলে বাড়িভাড়া লাগবে না, তারপর কলকাতা শহরে টাকার কি মূল্য? বানের জলের মত অর্থ-ব্যয়। চন্দনপুরের সঙ্গে কি কোনো তুলনা হতে পারে?

মিলন শুধোল,—'তুমি চন্দনপুরে গেলে বিস্তি আর হিরণের কি হবে বাবা? এরা কোথায় পড়বে?'

—'সে আমি ভেবে রেখেছি মিলু।' বাণীব্রত মেয়ের মুখের উপর সস্নেহ দৃষ্টি রাখলেন। বললেন—'বিনুকে আমি চন্দনপুরের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। অবশ্য বয়েজ স্কুল। কিন্তু মেয়েরাও পড়ে। হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেখালেই ভর্তি করে নেবে।'

—'আর হিরু?'

—'হিরুকে বাঁকড়োর কলেজে ভর্তি করে দেব। বেশ ভালো কলেজ। আমাদের সময় তো ফি-বার আই এস সি-তে স্ট্যাণ্ড করতো। আর ফার্স্ট ডিভিসনের ছড়াছড়ি ছিল। আমার এক বন্ধু এখন কলেজের প্রফেসর। সে আবার হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট। হিরুকে তার কেয়ারেই রেখে দেব।'

—'তাহলে হিরুর জন্যই তো মাসে শ দেড়েক টাকা গুণতে হবে।' মনোরমা টিপ্পনী কেটে বলল,—'লাভের গুড়টুকু পিঁপড়েতে শুষে নেবে গো।'

মেজ ছেলে কিরণ বলল,—'এত ঝামেলা না করে তুমি কলকাতাতেই একটা বাড়ি কিনতে পারতে বাবা।'

—'কলকাতাতে বাড়ি কিনব?' বাণীব্রত ছুই চোখ প্রায় কপালে তুললেন। 'তোরা সব পাগল হলি নাকি! আমার তো ব্যাঙের পুঁজি, মাত্র কয়েক হাজার টাকা সম্বল। কলকাতায় এক হাত জায়গার দাম জানিস?

কিরণ একটুও দমল না, ফৌজদারী কোর্টের উকিলের মত সে জেরা করার ভঙ্গিতে শুধোল,—'চন্দনপুরের বাড়ির পেছনে তুমি কত টাকা ঢেলেছ বাবা? দোতলায় ছুখানা ঘর তুলতে নিশ্চয় তোমার হাজার দশেক টাকা বেরিয়ে গেছে? তারপর এক বছর অন্তরই তো বাড়ি সারাতে ছুটছ। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার পনের টাকা তুমি নিশ্চয় খরচ করেছ?'

—'পনের হাজার?' বাণীব্রত একটু ভাবতে সময় নিলেন। মিনিট-খানেক পরে বললেন, —'দূর, অত টাকা হতে পারে না। মেরেকেটে বড় জোর হাজার বারোয় দাঁড়াবে। তার বেশী নয়। কিন্তু এই ক'টা টাকায় কি কলকাতায় বাড়ি কেনা যেত?'

'তা যেত বাবা। কিরণ অনায়াসে বলল, অবশ্য পুরো বাড়ি হত না। কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়ি তুমি কিনতে পারতে। কলকাতায় অনেকদিন ধরেই তো ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে বাবা। ফার্স্ট ইন্স্টলমেণ্টে বারো-চোদ্দ হাজার টাকা দিতে হয়। তারপর মাসে মাসে কিস্তি। সেও বেশি নয়। দেড়শ টাকার চেয়ে কমও হতে পারে।'

—'ফ্ল্যাটবাড়ি কিনতে বলছিস তোরা?' বাণীব্রত ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

'সমস্ত জীবনটাই তো ছোট্ট ফ্ল্যাটে মাথা গুঁজে রইলাম। বুড়ো বয়সে ফের ফ্ল্যাটে থাকতে বলছিস?'

মিলন মন দিয়ে কাগজ পড়ছিল। সে মুখ তুলে শুধোল—'ফ্ল্যাটবাড়ি কি খারাপ বাবা? ছোট ফ্যামিলির পক্ষে ফ্ল্যাটই তো আইডিয়াল।'

—'কি জানি মিলু।' বাণীব্রত ধীরে ধীরে বললেন,—দু-তিনটে ঘর আর ছোট্ট এক ফালি বারান্দা। একটু উঠোন পর্যন্ত নেই। মাথার উপর এক কুচি নীল আকাশও চোখে পড়ে না। বুড়ো বয়সে এই খাঁচার মধ্যে থাকতে মন চায় না বাবা।'

মনোরমা ব্যঙ্গ করে বলল,—'চন্দনপুরে উনি অট্টালিকা তৈরি করেছেন যে তাই ছোট ঘরে আর মন ভরে না।'

স্ত্রীর পরিহাস বাণীব্রত গায়ে মাখলেন না। ছেলেদের বললেন.—'চন্দনপুরের বাড়ি একবার দেখবি চল। এবার সারিয়ে-সুরিয়ে বাইরেটা রং করিয়েছি। ভিতরটা চুনকাম হয়েছে। যা চমৎকার দেখায়। তাকালেই তোদের পছন্দ হবে।'

ছেলেদের নীরব থাকতে দেখে বাণীব্রত ফের বললেন,—চন্দনপুরের বাড়িতে ছ'খানা ঘর। দোতলার ঘর দুখানা তোদের দু'ভায়ের জন্য তোলা থাকবে। ছুটি-ছাটায় এলে থাকবি। নীচের ঘরগুলো আমরা ব্যবহার করব। গ্রীষ্মের বন্ধে কিংবা পুজোর ছুটিতে হিরু বাড়ি এলে ওকে একখানা আলাদা ঘর দেব। তবুও বাড়তি ঘর থাকবে। হুট করে দু-পাঁচজন লোক এলেও কোনো অসুবিধে হবে না।'

কিরণ হেসে বলল,—'ব্যাপারটা ঠিক তা নয় বাবা। আসল কথা হচ্ছে কলকাতায় থাকা নিয়ে। চন্দনপুরের বাড়ি নিশ্চয় খুব ভাল। অনেকগুলো ঘর আছে। হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যায়। কিন্তু কলকাতার সঙ্গে তার কি কোনো তুলনা হয়? সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশে এই একটিই তো নগরী। জেলা শহরগুলোর মধ্যে গোটা দুই-তিন সামান্য বড় হতে পারে। বাকি সবই তো একস্টেণ্ডেড্ ভিলেজের নামান্তর বাবা।'

ছেলের মতামত শুনে বাণীব্রত কোনো মন্তব্য করলেন না। ব্যাপারটা যেন তার মগজে ঢোকে নি, এমন একটা ভাব দেখালেন।

ছোট ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে মিলন ওকালতি করল,—'কিরণ কিন্তু ঠিকই বলেছে বাবা। কলকাতা হল বাংলাদেশের হার্ট। কলকাতার বাইরে লাইফ কোথায় বল? মফঃস্বল থেকে ভালো ছাত্রছাত্রীরা কত আশা-ভরসা নিয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে আসে। আর হিরুকে তুমি কলকাতা থেকে সরিয়ে মফঃস্বলের কলেজে ঢোকাবে।

জোরালো যুক্তি। খণ্ডন করা কঠিন। বাণীব্রত কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে বসলেন। পরে একটু প্রসন্ন ভাব করে শুধোলেন,—'কেন? হিরুর কি বাঁকড়ো কলেজে পড়তে আপত্তি আছে? সে কোথায়? তাকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি নে—'

মনোরমা পেয়ালায় চা ঢালবার আয়োজন করছিল। ছাঁকনিটা সরিয়ে রেখে সে বলল,—'ঘরের মধ্যে নিশ্চয় আছে। হিরুটাও হয়েছে তেমনি। যেখানে পাঁচজনে বসে গল্পগুজব করছে ও তার ত্রিসীমানা মাড়াবে না। দিন দিন ছেলেটা যেন ভীষণ চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে।

মনোরমা আজ নিজের হাতে স্বামীকে চা দিল। অন্য দিন চায়ের পেয়ালা নিয়ে বিন্তি যায়। কিন্তু মানুষটা আজ দশ দিন পরে ফিরল। অন্য কারো হাতে চা পাঠাতে তার ইচ্ছা হল না।

মেয়ের দিকে ঘুরে সে বলল—'কেতলিতে আরো চা আছে বিন্তি। তোর মেজদাকে এক কাপ চা দে। মিলু যদি খেতে চায়, তাকেও একটু দিস।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ মা?' বিন্তি শুধোল।

'মনোরমা যেতে যেতে বললেন—'দেখি আবার হিরুটা কোথায় আছে। আমার হয়েছে যত জ্বালা। সকাল থেকে সে'ত এক কাপ চাও খেল না রে। ছেলেটা গেল কোথায়?'

বিন্তি ঠোঁট উল্টিয়ে একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গি করে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ভাবভঙ্গি দেখে একটুও প্রসন্ন বলে মনে হল না। ব্যাজার মুখ করে সে বাপকে বলল—'জানো বাবা? ছোট ছেলেটিকে মা ভীষণ ভালোবাসে। মায়ের যত দরদ ছোড়দার উপর।'

মেয়ের কথা শুনে বাণীব্রত কৌতুক বোধ করলেন। চায়ের কাপে ফের

চুমুক দিয়ে বললেন,—'শুধু তোর ছোড়দাকেই ভালোবাসে বুঝি? তোকে একটুও বাসে না?'

'আমাকে?' বিস্তি চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁট টিপে সুন্দর একটি ভঙ্গি করল। বলল,—'উল্টে আমাকে খালি বকে। কাল বিকেলে মায়ের কাছে দুটো টাকা চেয়েছিলাম বাবা। আমাকে মা দিল না। কিন্তু সন্ধ্যের পর ছোড়দা তিনটে টাকা চাইতেই মা তখুনি হেসে বের করে দিল।'

—'হিরুর নিশ্চয় খুব দরকার ছিল বিস্তি।' বাণীব্রত ওকে বোঝাতে চাইলেন। আসলে মেয়ের এই অভিযোগ শুনে তার খুব মজা লাগছিল। বিস্তিটা ছোটবেলা থেকেই এমনি। হিরুর সঙ্গে রেষারেষি ঝগড়াঝাটি লেগেই অছে। আবার তাকে ভিন্ন ওর চলেও না। ছোটবেলায় দুটোতে এমন খুনসুটি করত। হিরু প্রায়ই রেগেমেগে ওকে দু-চার ঘা দিত। বিস্তিটাও ভীষণ দজ্জাল। সে প্রাণপণে যুঝত। মারামারি করত। শেষে না পেরে পা ছড়িয়ে তারস্বরে কান্না জুড়ত।

মনোরমা এঘর-ওঘর খুঁজে বেড়াল। হিরু কোথাও নেই। ছেলেটা তাহলে গেল কোথায়? এখনও সাতটা বাজেনি। এর মধ্যে তার বেরোবার কথা নয়। মনোরমার একটু ভাবনা হল। ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েকে শুধোল—'অ বিস্তি। তোর ছোড়দা গেল কোথায়? তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিনে।'

বাণীব্রত বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—'অবাক কাণ্ড। হিরু বাইরে যাবার সময় বাড়িতে বলেও যায় না?'

বিস্তি গালে আঙুল রেখে এক মুহূর্ত ভাবল। দাঁড়াও দিকি, ছোড়দা বোধহয় ছাদে গিয়েছে। গণ্ডগোল শুরু হবার পর থেকেই খালি ছাদে যাবে বলছিল। ছাদে যাবার ছুতো করে ও যদি নীচে নেমে রাস্তায় বেরোয়? মা তাই দরজা খুলতে দেয়নি বাবা।'

বাণীব্রত চিন্তিত মুখে বললেন,—'তাহলে সে গেল কোথায়? তুই যা দিকি মা। চট্ করে একবার দেখে আয় সে ছাদে আছে কিনা।'

বিস্তি দৌড়ে গেল এবং প্রায় হরিণীর মত চঞ্চল পায়ে ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—'না মা। ছোড়দা তো ছাদে নেই।'

—'সে কি রে? মনোরমা খুব ব্যস্ত হয়ে বললেন, তাহলে সে গেল

কোথায় ? কখন ছেলেটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তোরা কেউ জানতে পর্যন্ত পারলিনে ?

—'তুমি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছ মা।' মিলন মুখ তুলে বলল,—'হিরু কোথাও গিয়েছে নিশ্চয়। এখুনি ফিরে আসবে। এমন তো কতবার গেছে। আমরা খোঁজা-খুঁজি করে হয়রান হয়েছি। তারপর ও ঠিক ফিরে এসেছে।'

মিলনের কথাই সত্যি হল। মিনিট কুড়ি বাদেই হিরণ ফিরল। তার পরণে পাতলুন। গায়ে একটা আধময়লা জামা। পায়ে চটি, চুলে চিরুনি পর্যন্ত বোলায়নি বলে সেগুলো এলোমেলো। বিপর্যস্ত ধানক্ষেতের মত। মুখ গম্ভীর। হিরণ যেন গম্ভীরভাবে কিছু ভাবছে।

ছেলেকে দেখেই মনোরমা খুশি। মুখ উজ্জ্বল করে শুধোল, 'কোথায় গিয়েছিলি হিরু ? আমি তোকে এঘর ওঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি বাবা।'

হিরণ মার দিকে তাকিয়ে সলজ্জভাবে হাসল। বলল,—'একবার সত্যেনের বাড়িতে গেছলাম মা। তুমি বুঝি আমাকে খুব খুঁজছিলে ?'

বাণীব্রত শাসনের ভঙ্গিতে বললেন,—'সাতসকালে উঠে তুমি বন্ধুর বাড়িতে গেছলে কোন্ আক্কেলে ? সামনে তোমার টেষ্ট পরীক্ষা না ? পড়াশুনো কি শিকেয় উঠেছে ?'

হিরু মুখ নামিয়ে বলল,—'সত্যেনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল বাবা। আমি তাই একবার ওর মার কাছে গিয়েছিলাম।'

—'ওমা! তাই নাকি ?' মনোরমা সভয়ে বলল। 'সত্যেন মানে কোন ছেলেটি রে ?'

বিন্তি তাড়াতাড়ি বলল,—'তুমি ওকে চিনবে না মা। কালো লম্বা মতন ছেলেটা। তেত্রিশ নম্বর বাড়িতে ওরা থাকে। ছোড়দার খুব বুজম্ ফ্রেণ্ড।' চোখ নাচিয়ে বেশ কায়দা করে ফের বলল,—'তোমার ছেলেটির তো বিকেলবেলায় ওরই সঙ্গে আড্ডা।

হিরুর সব খবর বিন্তি রাখে। মনোরমা তাই চুপ করে গেল। তার মুখের উপর একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ল। ওই ছেলেটার সঙ্গেই হিরুর ভাবসাব ? ওর সঙ্গেই তার মেলামেশা ? .

পুলিশ তাহলে যে কোন সময় হিরুকেও ধরে নিয়ে যেতে পারে ? তখন কি উপায় হবে ?

কিরণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছোট ভাইকে দেখছিল। সে শুধোল,—'তোর বন্ধুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল,—ঘরে বসে তুই সেকথা জানলি কেমন করে ?'

হিরু মুখ না তুলেই জবাব দিল—'ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সত্যেনকে ওরা গাড়িতে তুলল।'

বাণীব্রত বেশ চড়া গলায় বললেন—'তুমি একদম ঘর থেকে বেরোবে না। আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। মনে রেখো সামনেই তোমার টেস্ট পরীক্ষা। এবারও যাতে ফার্স্ট হতে পার, সেই চেষ্টা কর।'

হিরণ একটি কথাও বলল না। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকল।

কিরণ চটেমটে বলল,—'হিরুটা কি রকম গোঁয়ার হয়ে গেছে দেখেছ বাবা ? কথার একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না। ও নিজেকে কি মনে করে—'

বিন্তি মাকে বলল,—'আমি তাহলে তৈরি হয়ে নিই মা। আমার আবার নাচের স্কুল আছে। দেরি করে বেরোলে সাড়ে আটটার আগে পৌঁছতেই পারব না।'

—'আজ তোর নাচের স্কুল নাকি ?' মনোরমা শুধোলেন।

—'বারে ! আজ রবিবার নয় ?'

বিন্তি ঘরে ঢুকে মিলির চিঠিখানা বের করল। কাল বিকেলে একটা লোক এসে দিয়ে গেছে। দু-চার কথার শেষে মিলি লিখেছে,—'নাচের স্কুলের পর কাল আমাদের বাড়ি আসবি। রতীশদাও থাকছে। তোর সঙ্গে একটা ব্যাপারে ও কথা বলতে চায়। রতীশদাকে নিশ্চয় মনে আছে তোর ? সেই যে আমার জন্মদিনে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম ?'

চিঠিখানা হাতের তেলোয় চেপে ধরে রতীশের সুন্দর মুখটা বিন্তি ভাবতে চেষ্টা করল।

## ॥ তিন ॥

গেটের কাছে মিলির সঙ্গে দেখা।

এগিয়ে এসে বিন্তি শুধোল,—'আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলি বুঝি? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রে?'

মিলি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'যদি বলি অনেকক্ষণ', সে কপট রাগের ভঙ্গি করে মুখটা অন্যদিকে ফেরাল।

—'আহা! আর রাগ করতে হবে না।' বিন্তি ওর গাল দুটো আলতো করে টিপে আদর করল। বলল—'ভেরি সরি ম্যাডাম। আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। কি করি বল? নাচের ক্লাস শেষ হতেই দশটা বাজল। ভাগ্যিস ছুটির দিন, তাই প্রথম বাসটাতে উঠতে পেরেছি। অন্যদিন হলে আর রক্ষে ছিল না। বেলা দশটায় কি বাসে ওঠা যেত?'

মিলি ফিক করে হাসল। 'থাক আমার কাছে আর জবাবদিহি করতে হবে না। ওপরে আর একজন তোমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। যা বলবার তাকেই ব'লো।'

বিন্তি লজ্জা পেল। গলা নামিয়ে শুধোল,—'ওপরে কে বসে আছে রে? তোর রতীশদা?'

—'আবার কে?' মিলি সুন্দর একটি ভ্রূ-ভঙ্গি করিল। গেটের সামনে একটা ঝকঝকে ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে। সেদিকে ইঙ্গিত করে মিলি বলল,—'রতীশদার গাড়ি। সকাল ন'টা থেকে এসে বসে আছে। সাড়ে দশটা পর্যন্ত তুই এলি না দেখে ও বেচারী একেবারে হতাশ। বলছিল,—তোর বন্ধু আর এল না মিলি। তখন মুখখানা যা হয়েছিল, দেখলে তোর মায়া হ'ত।' মিলি হি-হি করে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

বিন্তি ওকে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল,—'যাঃ। তুই ভীষণ ফাজিল হয়েছিস। এমন করিস না—'

মিলি ছ'হাত বাড়িয়ে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরল। 'চল্ চল্। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে বিন্তি। রতীশদা সেইজন্তেই এসেছে।' ফের আবদার করে বলল,—'তুই রাজি না হলে কিন্তু আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যাবে।'

বিন্তি খুব অবাক হ'ল। শুধোল,—'কি কথা বল দিকি? আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না। আমার সঙ্গে তোর রতীশদা কি কথা বলবেন?'

মিলি মাথা নেড়ে বলল—'উঁহু! এখন কিছু বলতে পারব না। তুই আগে ওপরে চল। রতীশদা নিজে তোকে সবকথা বলবে।'

—'বেশ, তাই চল।' বিন্তি হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি শোন।' মিলির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিন্তি ফিস-ফিস করে কি যেন বলল।

মিলি ওর মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল।—'তাই হবে বাবা। কিন্তু তোকে এমনিতেই যথেষ্ট ভালো দেখাচ্ছে বিন্তি, আর মেকাপ নেবার কোনো দরকার ছিল না।'

—'দূর! মেক-আপ কিসের।' বিন্তি হেসে ফেলল। 'এক ঘণ্টা ধরে নাচের তালিম নিয়েছি। মুখের উপর কি রকম ঘাম জমেছে দেখছিস না? একটু ধুয়ে মুছে নেব। নইলে এই অবস্থায় কোনো ভদ্রলোকের সামনে বেরোনো যায়?'

দোতলায় উঠবার সিঁড়ির পাশেই একটা ঘর। সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমও আছে। মিলি ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, —'নাও গো সুন্দরী। কি সাজগোজ করবে করো। আমি চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম।' এই বলে একটা সোফার উপর সে প্রায় এলিয়ে পড়ল। তারপর সত্যি চোখ বুজল।

বিন্তি এগিয়ে এসে ওর গালে একটা টোকা মারল। বলল,—'চোখ খোল্ শিগ্গির, তোর এই ঢঙ আমার ভালো লাগে না। এমনি করলে কিন্তু আমি সোজা বাড়ি চলে যাব।'

অগত্যা মিলি চোখ খুলে হাসল।

বিন্তি বলল,—হ্যাঁ, অমনি তাকিয়ে থাক। বাথরুমে যাচ্ছি। ফিরে এসে

যেন দেখি তুই ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছিস।' মিলিরা বনেদী বড়লোক। বাথরুমটাই কত সুন্দর। ঝকঝকে শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঘর। বেশ বড় সাইজ। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাথ-টব। ইচ্ছে করলে বিস্তি ওর মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। কাচের একটা স্ট্যাণ্ডের উপর দু-তিনটে সাবানের কেস। একটা ছোট বাটি, এক শিশি সুগন্ধী তেল। ছোট একটা স্নো। কিছুটা ফেস-পাউডার, টুকিটাকি আরো কত জিনিস রয়েছে।

বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তি ভালো করে মুখখানা ধুয়ে ফেলল। হাতের তেলোয় অল্প একটু সাবানের ফেনা করে মুখে বুলোল। তারপর আঁজলা করে জল নিয়ে চোখ-মুখে দিতে লাগল। গাল, গলা, চিবুকের উপর থেকে সাবানের নরম ফেনাগুলি ধুয়ে গেলে বিস্তি পিতলের রডে ঝোলানো একটা গোলাপী রঙের তোয়ালে টেনে নিয়ে মুখের উপর আলতো-ভাবে চেপে ধরল।

বাঁ দিকে দেওয়ালে বসানো একটা বড় আয়না। বিস্তি ঘুরে দাঁড়াতেই দর্পণে তার ছায়া পড়ল। তোয়ালেটা সরাতেই আয়নায় একটি উজ্জ্বল মুখের প্রতিবিম্ব। ভালো করে দেখে বিস্তি নিশ্চিন্ত হ'ল। মুখের ময়লা, ঘাম-টাম সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার। গালের উপর আঙুল বুলিয়ে বিস্তি একবার পরখ করল। ঠিক একটা খোসা ছাড়ানো আধ-সেদ্ধ ডিমের মত নরম তুলতুলে মনে হচ্ছে। আঙুলের ডগায় একটু স্নো নিয়ে বিস্তি গালে চোখের নীচে খুব ঘষল। তারপর পাউডারের পাফটা গলায়, মুখের নানা অংশে সযত্নে অনেকক্ষণ ধরে বুলোল।

দরজা খুলতেই মিলি মুখ নেড়ে বলল,—'বাব্বা! ধন্যি তোর রূপচর্চা। মিনিট পনেরো ধরে শুধু মুখ পরিষ্কার করলি?'

বিস্তি কোনো উত্তর না দিয়ে শাড়িটা এপাশ-ওপাশ সরিয়ে টেনে টুনে ঠিক করে নিল। বলল,—'বাজে কথা রাখ। চল, এবার ওপরে যাই।'

মিলি এগিয়ে এসে বন্ধুর গলাটা আলগোছে জড়িয়ে ধরল। বিস্তির মুখের উপর একনজর চোখ বুলিয়ে বলল,—'সত্যি! তোকে গ্র্যাণ্ড দেখাচ্ছে কিন্তু।' ফের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে শোনাল,—'দেখিস, রতীশদা আবার না তোর প্রেমে পড়ে যায়।'

বিস্তি ওকে একটা ঠ্যালা দিয়ে দূ'রে সরিয়ে দিল। বলল,—'কি হচ্ছে মিলি? দিন দিন ভীষণ ফাজিল হচ্ছিস। আজকাল বুঝি প্রেম-টেমের কথা খালি চিন্তা করিস?'

মিলি খুব একটা হতাশ ভঙ্গি করে বলল,—'চিন্তা করে লাভ কি বল? ভালো নাচতে পারলে না-হয় উপায় ছিল। রতীশদার মত আর কেউ হয়তো গাড়ি ড্রাইভ করে কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করত।'

কথা শুনে বিস্তি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর পিঠে একটা ছোট্ট কিল মেরে বলল,—'চল মাসীমাকে গিয়ে বলছি। মিলির এবার একটা বিয়ে দিন। নিজে গাড়ি চালাতে পারে এমনি কোনো ছেলে। মিলিকে পাশে বসিয়ে সে একটা লং ড্রাইভে বেরোবে। অনেকদূর বেড়িয়ে আসবে, কি বলিস?'

মিলির পড়ার ঘরটা ছোট্ট। কিন্তু ভারী সুন্দর। সাজানো গোছানো। পড়ার টেবিল, চেয়ার। আলমারিতে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও গল্প, উপন্যাস আরো কত সব বই। দেওয়ালের একদিকে সুদৃশ্য বিলিতি ক্যালেণ্ডারের পাতায় পঞ্চদশ শতাব্দীর এক দুর্গের ছবি। অন্যদিকে চেয়ে দেখার মতো একটি নিসর্গ চিত্র। জানালার পাশে মানিপ্ল্যাণ্টের একটি লতা দেওয়ালের বুকে সাপের মতো হেঁটে চলেছে। দরজার মাথায় সামান্য উঁচুতে পেলমেটের উপর ভারতের নানা অঞ্চলের আট-দশটা সুদৃশ্য পুতুল সারবন্দী দাঁড়িয়ে।

মিলি বলল,—'তুই ব'স বিস্তি। আমি রতীশদাকে ডেকে আনি।'

—'কোথায় উনি?' বিস্তি গলা নামিয়ে শুধোল।

—'আছে বাড়িতেই। বোধহয় মায়ের সঙ্গে গল্প-টল্প করছে। তুই ব'স না। আমি এখুনি ওকে ধরে আনছি।'

—'তাড়াতাড়ি আসিস ভাই।' বিস্তি প্রায় মিনতি করল।

মিলি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সে চেয়ারের উপর ধপ করে বসে পড়ল। বিস্তির মনে হ'ল তার বুকের ভিতরটা যেন টিপ-টিপ করছে। হৃদপিণ্ডের দ্রুততালে ওঠা-নামা। কেমন একটা নার্ভাস অবস্থা। রতীশের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে সে এমন চঞ্চল বোধ করছে কেন? জন্মদিনে তার সঙ্গে মিলি আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। বেশী বয়স নয় ছেলেটার। বড় জোর

উনিশ কুড়ি হতে পারে। পরনে ছাই রঙের স্যুট। ঘি রঙের সিল্কের জামা, আর লাল টকটকে একটা টাই। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। পরিচয় হতেই সে হেসে বলল,— '—ভারী সুন্দর নাচ আপনার। খুব ভালো লেগেছে।'

প্রশংসা মানেই স্তুতি। বিশেষ করে পুরুষের মুখে স্তুতি শুনলে কোন মেয়ের না ভালো লাগে? বিন্তি খুশি হয়ে শুধোল,—'সত্যি বলছেন?'

রতীশ হেসে বললে,—'রিয়েলি।' তারপর বিন্তির মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে সে কেমন অদ্ভুতভাবে হাসল, ফের বলল,— 'আমি ভাবছি আপনার পারফরমেনস্ আবার কবে দেখতে পাব।'

একলা ঘরে বসে রতীশের কথাটা বিন্তির মনে পড়ল। সত্যি, মিলি এমন করে তাকে ডেকে পাঠাল কেন? রতীশ কি ফের তার নাচ দেখতে চায়? আর সেজন্যই আজকের সাদর নিমন্ত্রণ। কিন্তু এখানে কোথায় নাচবে বিন্তি? তাছাড়া শুধু রতীশের সামনে? ধ্যেৎ। তাই কি কখনও সম্ভব?

জন্মদিনের ফাংশনের কথা ফের মনে পড়ল বিন্তির। অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত অনেক হল। প্রায় সাড়ে নটা। তাকে আনবার জন্য মিলি গাড়ি পাঠিয়েছিল। ফেরার সময়ও গাড়ির ব্যবস্থা। ওঠার আগে মিলি তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে শুধোল,—'কি রে, রতীশদাকে তোর কেমন লাগল?'

প্রশ্নটা অর্থবহ। অথচ ইচ্ছে করলে সহজভাবেও নেওয়া যায়। বিন্তি তাই করল। মুখ না ফিরিয়েই সে জবাব দিল,—'কেমন আবার? এমনি, মানে আলাপ হলে যেমন লাগে আর কি—'

মিলি আগের মতই ফিস ফিস করে বলল—'রতীশদার কিন্তু তোকে খুব পছন্দ। বলছিল, তোর ফিগার খুব সুন্দর। চর্চা রাখলে নাচে তোর নাম হবে।'

গাড়িতে উঠে বিন্তি প্রথমেই রতীশের কথা ভাবল। কি বেহায়া ছেলে। মেয়েদের ফিগারের দিকে অমন করে তাকায় কেন? কিন্তু একটু পরেই সে অন্য রকম ভাবতে শুরু করল। রতীশ তার ফিগারের প্রশংসা করেছে

মনে করে সে খুশী হল। বিন্তি ভাবল নাচের সময় রতীশ তার দিকে তাকিয়ে তাকে খুঁটিয়ে দেখেছে। রতীশের মুগ্ধ দৃষ্টি সারাক্ষণ তার দেহের উপর লুব্ধ ভ্রমরের মত ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে বিন্তি ফের উঠল। ক্যালেণ্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিলিতি ক্যালেণ্ডার। প্রতি মাসের আলাদা পাতা। বিন্তি এলোমেলো কয়েকটা পাতা সরিয়ে ছবি দেখল। তারপর জানালার কাছে গিয়ে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ হতেই বিন্তি ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে মিলি নেই ···রতীশ একা। হাসিমুখে তাকিয়ে।

বিন্তি শুধোল,—'মিলি কই? সে তো আপনাকেই খুঁজতে গেল।'

হাত তুলে নমস্কার করল রতীশ। বলল, —'ও আসছে এখুনি। আপনি বসুন না। মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিয়ে এত দূরে আনালাম।'

বিন্তি চেয়ারে বসল। 'কষ্ট কিছু নয়।' সে হেসে বলল,—'তবে অনেকটা দূর। বাসে যেতে কখনও এক ঘণ্টাও লেগে যায়।'

রতীশ পকেট হাতড়ে বেশ চকচকে এবং চৌকো গাছের একটি চীজ বের করল। বলল,—'আমাদের ওখানে নিশ্চয় আপনাকে বাসে যেতে হবে না। যাওয়া-আসার ব্যবস্থা আমরাই করব। মানে গাড়ি থাকবে। অবশ্য আপনি যদি রাজি হন।'

—গাড়ির ব্যবস্থা করবেন মানে?' বিন্তি অবাক হয়ে শুধোল, 'আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না।'

—'কেন? মিলি কিছু বলে নি আপনাকে?'

বিন্তি মাথা নেড়ে জবাব দিল,—'না তো।'

চকচকে এবং সুদৃশ্য বস্তুটি আসলে একটি নতুন ধরনের সিগারেট কেস। রতীশ সেটি খুলতেই চক পেন্সিলের মত সরু সরু অনেকগুলি সিগারেট দেখতে পেল। বেশ কায়দা করে ঠোঁটের প্রায় কোণে একটা সিগারেট চেপে ধরল রতীশ। বলল,—মিলির আপনাকে কথাটা বলা উচিত ছিল। কেন যে বলে নি বুঝতে পারছি না।'

—'তাতে কি হয়েছে? আপনি বলুন না—' বিন্তি সাগ্রহে তাকাল।

রতীশ পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে সিগারেটটা ধরাল। বলল,—'ব্যাপারটা সামান্য। সামনের মাসে আমাদের বাড়িতে একটা ফাংশন হতে পারে। ঘরোয়া অনুষ্ঠান। আমার দাছুর জন্মদিন। এবারই ও'র পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ হবে। ফাংশনে আমরা একটা ছোট নাটক করছি। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে নায়িকার রোলটা নিয়ে। বইতে তিন-চারটে নাচ আছে তার। কিন্তু ভালো নাচতে পারে এমন কোনো মেয়েই পাচ্ছি না।' একটু থেমে সে ফের বলল, —'আপনি যদি রোলটা করতে রাজি হন, তাহলে একটা সমস্যা মিটে যায়।'

নায়িকার রোল? বিস্তি এক মুহূর্ত ভাবল। তার মানে থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে তাকে প্রায় প্রতিদিনই রতীশের বাড়ি যেতে হবে। অবশ্য যাতায়াতের ব্যবস্থা ওরাই করবে। কিন্তু তাই কি সব? আজকাল নিত্যি গণ্ডোগোল, হাঙ্গামা। তার পাড়াতে আজ ভোরে কি তুলকালাম কাণ্ড। বিস্তির মত থাকলেও তার মা-বাবা কি রাজি হবেন? ঠোঁট কামড়ে সে কথাটা ভাবল।

মুখে অবশ্য বিস্তি সেকথা বলল না; ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁট টিপে সে প্রায় বইয়ের নায়িকার মতই ভঙ্গি করল। রতীশের মুখের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলল,—'হিরোইনের রোলে আমায় মানবে কেন? আর আমি কি তেমন ভালো নাচতে পারি?'

রতীশ সোজা হয়ে বসল। 'কি যে বলেন আপনি। নায়িকার পার্টে আপনাকে ওয়াণ্ডারফুল মানাবে।' বিস্তির দিকে আলগোছে একবার তাকিয়ে সে ফের বলল,—'যা সুন্দর ফিগার আপনার। মলিকে আমি কি বলেছি জানেন? ছেড়ে না দিলে নাচে একদিন আপনি খুব ফেমাস হবেন।'

—'আমি সেকথা ওকে আগেই বলেছি মশায়।' ঘরে পা দিয়েই মিলি কথাটা সগর্বে জানাল। তারপর বিস্তির পিঠে একটা আলতো চাপড় মেরে বলল,—'কি রে নায়িকার রোলটা করতে রাজি হয়েছিস তো?'

রতীশ চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গেল। সিগারেটে ছোট্ট একটা টান দিল। মুখটা উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়বার সময় দু-তিনটে ছোট ছোট রিং করবার চেষ্টা করল। কিন্তু সবগুলো ঠিকমত হল না।

আসলে বিস্তির খুব লজ্জা করছিল। সে জানে তার ফিগার সুন্দর, নাচের উপযোগী। আঁকাবাঁকা পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার মত তার দেহবল্লরী। কিন্তু রতীশ কেন আজও সেকথা উল্লেখ করল? ও কি সারাক্ষণ তার দেহের উপর চোখ বুলোচ্ছে? রতীশের মত একজন সুন্দর যুবা পুরুষের মুখে বার বার ফিগারের প্রশংসা শুনলে কোন মেয়ে সহজ হয়ে কথা বলতে পারে?

বিস্তি মুখ তুলে দেখল, মিলি একা নয়। তার পিছনে খাবারের প্লেট হাতে আর একজন এসেছে। লোকটি টেবিলের উপর জলভর্তি কাঁচের গ্লাস, সন্দেশের ডিশটা নামিয়ে রাখল।

—'এ কি!' বিস্তি বিস্ময়ের সুরে বলল, 'এত বেলায় এসব খাওয়া যায় নাকি?'

—'খুব যায়। মোটে তো চারটে সন্দেশ। তোর জন্যে মা পাঠিয়ে দিল। তুই না খেতে চাইলে কিন্তু মাকে নিয়ে আসব।'

বিস্তি অসহায় ভাঙ্গতে তাকাল। ঘড়ির কাঁটার উপর এক নজর বুলিয়ে বলল,—বড্ড দেরী হয়ে গেল রে। বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় সাড়ে বারোটা হয়ে যাবে।

মিলিকে কুণ্ঠিত দেখাল। সে লজ্জিতভাবে বলল,—'গাড়িটা আজ সকালেই বাবা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই। নইলে ড্রাইভার তোকে পৌঁছে দিয়ে আসতো রে।'

—তাতে কি হয়েছে? বিস্তি তাড়াতাড়ি বলল,—'আমি বাসে করে ঠিক চলে যাব। আর এখন ভরদুপুরে ট্রাম-বাস ফাঁকা। আমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

—'তোর না অসুবিধে হতে পারে। তবু আমার উচিত ছিল তোকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা। বাম হাতের কড়ে আঙুলের অগ্রভাগ ঈষৎ কামড়ে মিলি কি চিন্তা করল। পরে হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল করে সে বলল,—'আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? রতীশদার তো গাড়ি আছে। সেই তোকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

বিস্তি আপত্তি করল। না, না। উনি আবার কেন মিছামিছি অত ঘুরে যাবেন?'

—'আহা! যাবে না কেন? মিলি চোখ নাচিয়ে সুন্দর একটি ভঙ্গি করল। তারপর রতীশের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধোল,—'কি, কষ্ট করে ওকে একটু পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে তো?'

রতীশ জানালার কাছ ছেড়ে ফের এদিকে এল। হেসে বলল,—'কষ্ট কিসের? তাছাড়া ওকে পৌঁছে দিয়ে আসা তো আমাদের কর্তব্য।'

মিলি হি-হি করে হেসে উঠল। 'দেখলি তো রতীশদা ডিউটি সম্বন্ধে কি রকম সচেতন, একবার বলতেই রাজি।' এক মুহূর্ত ভেবে সে ফের বলল, 'তাছাড়া তোর বাড়িটাও রতীশদার চিনে আসা দরকার। রোজ তোকে আনবার জন্য গাড়ি যাবে। ড্রাইভার কোনদিন ডুব দিয়ে বসবে কে জানে। সেদিন তো রতীশদাকেই রথের সারথী হতে হবে।'

রতীশ বেশ গম্ভীর মুখ করে বলল,—'তুমি আগে থেকেই এত সব ভাবছ মিলি। উনি কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে এখনও রাজি হন নি।'

—'ওমা, রাজি হয় নি নাকি!' মিলি ঠিক নিপুণ অভিনেত্রীর মত অবাক হবার ভান করল। তারপর বিস্তির কাঁধের উপর একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—'শিগ্‌গির রাজি হ বলছি। নইলে কিন্তু তোকে আজ আর যেতে দিচ্ছিনে।'

বিস্তি নিজেকে মুক্ত করে বলল,—'ছাড়, ছাড়। কি পাগলামি করিস। ফস করে কি অমনি রাজি হওয়া যায়? মার মত নিতে হবে না?'

—'মাসীমা ঠিক রাজি হবেন। তোর মত আছে কিনা শুধু তাই বল।'

রতীশের দিকে আড়চোখে চকিত দৃষ্টি হেনে বিস্তি ফিক করে হাসল। বলল,—'আমার নিজের অমত নেই। তবে কি জানেন? চারদিকে যা গণ্ডগোল। রোজ রিহার্সাল দিতে আসতে পারব কিনা কে জানে?'

—'আহা! তোকে আনার দায়িত্ব তো আমাদের।' মিলি ঠিক রাজহাঁসের মত গলা বাড়িয়ে কথা শেষ করল।

—'কেমন করে আনবে বল? বিস্তি রগড় করে বলল, 'আমাদের গলির মুখে পৌঁছবার আগেই হয়ত দেখবি রাস্তা ফাঁকা। সামনে ঠিক কুরুক্ষেত্তর যুদ্ধ। হৈ-হৈ কাণ্ড। দুম দুম বোমা ফাটছে। এক-একটা বোমার কি শব্দ। শুনলে তোর পিলে চমকে যাবে।'

—'ও বাবা। বলিস কি রে?' মিলি চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলল।'

—রতীশ একটু সতর্কভাবে শুধোল,—'আপনাদের পাড়ার অবস্থা এরকম নাকি?'

বিস্তি হেসে বলল,—'ভয় পাবেন না। কাল পর্যন্ত আমাদের পাড়াটা শান্ত ছিল। কিন্তু আজ ভোরবেলাতেই এক তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সে কি বোমাবাজী! আমরা তো ভয়ে কাঠ। রাত চারটে থেকে জেগে বসে আছি।'

—'তারপর সব থেমে-টেমে গেল তো?' মিলি জানতে চাইল।

—'নিশ্চয়। এক ঘণ্টা পরই সব স্বাভাবিক। নইলে আমি এলাম কেমন করে? এখন গেলে তুই বুঝতেই পারবি না যে, আজ ভোরে অত-গুলো বোমা ফেটেছে।'

—'তাহলে আর ভাবনা কিসের?' মিলি নির্ভাবনায় বলল।

—'চিন্তা আছে বৈকি।' বিস্তি বিজ্ঞের মত কথা কইল, 'মেজদা বলছিল, গণ্ডগোল একবার শুরু হলেই মুস্কিল। হাঙ্গামা লেগেই থাকবে। তুষের আগুনেব মত ভিতরে জ্বলবে। সুযোগ পেলেই মারামারি আর বোমাবাজী শুরু হবে।'

রতীশ অন্যমনস্কভাবে থুতনীতে হাত বুলোচ্ছিল। বিস্তির মুখের দিকে তাকিয়ে সে শুধোল,—'আচ্ছা আপনাকে যদি আমরা সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে দিই। তাহলে কি একটু সুবিধে হবে?'

বিস্তি ফের হাসল। বলল,—'আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? গণ্ড-গোল হয়েছে বলেই কি আমরা সকলে বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকব? আমার বাবা অফিস যাবেন, বড়দারও চাকরি আছে। মেজদার হাসপাতাল ডিউটি। তারপর বাজার-হাট কেনাকাটা সবই হবে।'

মিলি ফিক করে হেসে বলল,—'তাহলে তুইও নির্ঘাত বেরোবি, কি বলিস?'

বিস্তি চোখ ঘুরিয়ে মুখখানা ঈষৎ হেলিয়ে জবাব দিল,—'দেখি চেষ্টা করে।'

রতীশ হাতঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বলল,—'আমি নীচে গিয়ে গাড়িতে বসছি মিলি, তুমি ওকে নিয়ে এসো।'

প্লেটে সন্দেশগুলো পড়ে। বিস্তি একটিও ছোঁয় নি। মিলি বলল,—'ওগুলো খেয়ে নে এবার। রতীশদার স্বভাব জানিস না তো? বেশীক্ষণ একলা থাকতে পারে না। একটু পরেই হর্নের তাড়া শুনতে পাবি।

বিস্তি সলজ্জ গলায় বলল,—'মিছিমিছি তুই ভদ্রলোককে ট্রাবল দিলি। আমি বাসে দিব্যি যেতে পারতাম।'

মিলি গা দুলিয়ে হি-হি করে হাসল। ট্রাবল বলছিস? দূর বোকা! বরং রতীশদা খুশী হয়েছে। তোকে পাশে বসিয়ে এতটা রাস্তা যাবে, একটা প্লেজার-ট্রিপ বল?'

বিস্তি কপট রাগ দেখাল। 'কি যা-তা বলছিস? এমনি করলে আমি কিন্তু তোদের থিয়েটারে নেই—'

—'আহা! রাগ দেখো না মেয়ের,' মিলি সকৌতুকে তাকাল। হেসে বলল,—'নে, খুব হয়েছে। এবার চটপট সন্দেশগুলো খেয়ে ফ্যাল দেখি।'

বিস্তি একটা সন্দেশ মুখে ফেলে ঢক-ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল। মিলি বাধা দিয়ে বলল,—'ওকি? বাকীগুলো কে খাবে?'

ওর গাল টিপে একটু, আদর করল বিস্তি। বলল,—আর পারব নারে। তুই মাসীমাকে বুঝিয়ে বলিস।'

ড্রাইভারের আসনে রতীশ। বিস্তি কাছে আসতেই সে দরজা খুলে দিয়ে সহাস্যে তাকাল। কোনো বাক্যব্যয় না করে বিস্তি লক্ষ্মী মেয়ের মত টুপ করে পাশের আসনে বসে পড়ল। মিলি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে বলল,—'পারমিশনটা আজই মাসীমার কাছে করিয়ে নিবি, বুঝলি?'

বিস্তি কোনো কথা বলল না। ঘাড় হেলিয়ে ঈষৎ হাসল।

বালীগঞ্জ প্লেস থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাটা যাবার কথা। কিন্তু গাড়ি যেন অন্য দিকে চলেছে। বিস্তি উসখুস করছে দেখে রতীশ বলল,—'একটু সাদার্ন অ্যাভেনিউ ঘুরে যাচ্ছি। ভাবছি আমাদের বাড়িটা আপনাকে একবার দেখাব।'

—'এত বেলাতে আবার ? দেরী হবে না'— বিস্তি মৃদু আপত্তি করল। রতীশ ব্যাপরটা পরিষ্কার করে বলল,—বাইরে থেকে শুধু বাড়িটা দেখবেন। আমি গাড়ি থামাচ্ছি নে। তাছাড়া রাস্তা খুব ফাঁকা। পৌঁছতে মিনিট পাঁচেক বড়জোর বেশী লাগবে।'

রবিবার। তায় বেলা দুপুর। পথে লোক চলাচল প্রায় নেই। রাস্তার ধারে বিরাট সব অট্টালিকা। হঠাৎ গাড়ির গতি মন্দ হতেই বিস্তি কৌতূহলী হল। তিনতলা একটা বাড়ির পাশে গাড়িটা প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

রতীশ ইঙ্গিত করে বলল,—'এই বাড়িটা আমাদের। মিলিদের বাড়ি থেকে খুব দূর নয়, কি বলুন ?'

বিস্তি তাকিয়েছিল। সামনের বাগানে নানা ফুলের বাহার। বড় বড় গোলাপ। তুলোর মত সাদা, লাল, নীল আরো কত সব মরশুমী ফুল। গেটের থামে মার্বেল পাথরে লেখা,—'স্মৃতির ভেলা।'

কয়েক সেকেণ্ড পরেই গাড়ি ফের সবেগে ছুটল। রতীশ শুধোল,— 'বাড়িটা কেমন লাগল আপনার ?'

—'খুব সুন্দর।' বিস্তি ঘাড় ফিরিয়ে রতীশের মুখের উপর চোখ রাখল। বলল,—'বাড়ির নামটা আমার খুব পছন্দ। কে দিয়েছেন বলুন না ?

রতীশ ঈষৎ হেসে জবাব দিল,—'নামটা আমার দাদু দিয়েছেন। উনি বলেন একটা বাড়ি মানেই হাজার স্মৃতি। তিন-চার পুরুষ ধরে মানুষের বাস। শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য,—কত স্মৃতি সেখানে ছড়িয়ে আছে।'

—'তা সত্যি।' মুগ্ধ নায়িকার মত বিস্তি কথা কইল, 'আমার বাবাও ঠিক আপনার দাদুর মত কথা বলেন, দেশের বাড়ি-ঘরের উপর বাবার ভীষণ মায়া।'

—'আপনার দেশ কোথায় ?'

—'বাঁকুড়ায়।' বিস্তি ইচ্ছে করেই আর গ্রামের নাম বলল না।

—'মাঝে মাঝে সেখানে যান নিশ্চয় ?'

—'উঁহুঁ।' বিস্তি তাচ্ছিল্যের সুরে বলল,—'আমরা কেউ যাই নে। দু-এক বছর অন্তর বাবা শুধু যান।'

রতীশ হঠাৎ বলল,—'জানেন, আপনার কথা কাল আমি মাসীকে চিঠিতে লিখেছি।'

—'আমার কথা ?' বিস্তি খুব অবাক হল, 'কেন বলুন তো ?'

রতীশ রহস্য করে বলল,—'সে কথা আর একদিন আপনাকে বলব। তবে আমার মাসীকে হয়ত আপনি চেনেন'—

—'আমি চিনি ? ওমা, কি বলছেন আপনি ! উনি থাকেন কোথায় ? কলকাতায় নিশ্চয় ?'

—'উহুঁ।' রতীশ ঘাড় নাড়ল 'উনি যেখানে থাকেন সে জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূর। প্রায় তেরশ মাইল।'

—'তাহলে আমি চিনব কেমন করে ? কলকাতা থেকে অত দূরে আমি কোনোদিন যাই নি।'—

'রতীশ হাসল। 'জানেন ছোটবেলায় মাসী খুব ভাল নাচতে পারত। সুন্দর ফিগার ছিল। এখনও অবশ্য চমৎকার দেখতে। বলা যায় না, আপনিও একদিন মাসীর মতন ফেমাস হবেন।'

—'কি জানি ?' বিস্তি হাত ঘুরিয়ে বলল,—আপনার কথার মানেই বুঝতে পারছি না। কি যে সব বলছেন।'

বিস্তির কথামত গলির মুখেই রতীশ গাড়ি থামাল। দরজা খুলে বিস্তি নীচে নামল। বলল—'ধন্যবাদ, গলির মধ্যে আর আপনাকে গাড়ি নিয়ে যেতে হবে না। এইটুকু আমি হেটেই যেতে পারব।'

রতীশ একটু হাসল। বলল,—'চলি তাহলে। শিগ্‌গির নিশ্চয় দেখা হবে আবার।' সে গাড়িটা ঘুরিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

অমিয় বারিক লেনটা এখন বেশ নির্জন। গলির মুখে একটা চায়ের দোকান। দু-তিনটে ছেলে হয়তো বিস্তিকে দেখেই দোকানঘর থেকে বেরিয়ে এল। পরনে চোঙা প্যান্ট, ঊর্ধ্বাঙ্গে চিত্র-বিচিত্র বুশ সার্ট। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। বয়স ষোল-সতেরোর বেশী নয় :

—'সেই মেয়েটা নারে ? পুজোর সময় ফাংশনে নেচেছিল ?' একজন শুধোল।

অন্ত একটি ছেলে বিন্তিকে শুনিয়ে গান ধরল,—'সোহাগ চাঁদবদনী ধনী, নাচো তো দেখি—'

বিন্তি দ্রুত হাঁটছিল। ছেলে তিনটিকে সে আগেও দেখেছে। ওরা এই গলিতে থাকে না। কিন্তু এর আগেও দু-একদিন ছেলেগুলো তার পিছু নিয়েছিল। বাজে ছোঁড়া সব—

বাড়ির কাছে এসে বিন্তি মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল। আশ্চর্য! ছেলেগুলো তখনও দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সেই লম্বা মতন ছেলেটা নাচের ভঙ্গিতে এক পাক ঘুরে ফের গেয়ে উঠল,—

নাচো তো দেখি,
বালা নাচো তো দেখি।

তারপর তিনজনেই বিশ্রীভাবে হি-হি করে হেসে উঠল।

## ॥ চার ॥

ছোটখাটো একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানীতেও তার কাজ হ'ল না।

রাস্তায় দু'পাশের বড় বড় অট্টালিকাগুলির দিকে তাকিয়ে মিলন কথাটা ভাবল। বেলা শেষ হতে দেরি নেই। এখনও অবশ্য সন্ধ্যে নামেনি। কিন্তু আর কতক্ষণ? একটা ভারী পর্দার মত কালো অন্ধকার মাটির বুকে এখুনি নেমে আসবে। পিছন ফিরে মিলন একবার অফিস বাড়িটাকে দেখল। আকাশচুম্বী মালটিস্টোরিড বিল্ডিং। প্রস্থে ক্ষীণ, কিন্তু ঊর্ধ্বে বহুদূর। তাদের অফিসঘরের জানালা থেকে রাস্তার মানুষগুলিকে ঠিক পুতুলের মত ছোট দেখায়। মিলন ভাবছিল যেমন হোক একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানীতে কাজ হলেও তার বিদ্যেবুদ্ধি কিছুটা কাজে লাগত। দিনের পর দিন অব্যবহারে মরচে ধরত না। কনস্ট্রাকশনের কাজ মানেই প্ল্যান···ডিজাইন। এত বড় স্কাইস্ক্র্যাপার না হলেও ছোটখাটো বিল্ডিং অনেক কোম্পানী তৈরী করছে। তার সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ এমনি সব মাঝারি

কণ্ট্রাক্টরের ফার্মে কাজ পেয়েছে। এখানে ঢোকার আগে মিলনও খুব চেষ্টা করেছিল। নিদেনপক্ষে এমনি একটা ফার্মে কাজ জোটাতে। যাতে করে তার পুঁথিপড়া বিদ্যের খানিকটা সদ্ব্যবহার হয়। কিন্তু মিলনের কপাল। কিম্বা হয়তো এই তার জীবনের অভিশাপ। এতদিন ধরে যা শিখল তা নিছক ফালতু মনে হচ্ছে। কৃপণের ধনের মত সব বোঝা হয়ে রইল। কোনোদিন কাজে লাগবে বলেও মনে হয় না।

মনে গভীর সেই ক্ষতটায় কে যেন খুঁচিয়ে যন্ত্রণা দেয়। তবু ভাগ্যকে মিলন দোষ দেয়না। সে যা হোক তবু একটা চাকরি জুটিয়েছে! মাস গেলে কিছু টাকা মাইনেও পায়। তার আরো বন্ধুবান্ধব, জানাশুনো লোক আছে। তাদের পেটে বিদ্যে কিছু কম নেই। ঘরে ডিগ্রী, সার্টিফিকেট সব মজুত। কিন্তু কাজ জোটাতে পারেনি। কারো হাতে একটা টিউশানির আয় পর্যন্ত নেই। সব নগ্ন বেকার।

ব্র্যাবোর্ণ রোড থেকে বেরিয়ে মিলন ট্রামলাইনটা তাড়াতাড়ি পার হ'ল। লালদীঘি পিছনে রেখে একটা ট্রামগাড়ি দ্রুত এগিয়ে আসছে, উল্টোদিক থেকে একটা দোতলা বাস। নিরাপদ হবার জন্য মিলন তাই ফুটপাতে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে সে এখন এসপ্ল্যানেড যাবে। পরশু শনিবার। চৌরঙ্গীপাড়ার একটা ম্যাটিনি শো-র টিকিট সে আজই কিনবে। তবু অন্যদিনে অফিসের ছুটি হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়। ধীরেসুস্থে বাড়ি পৌঁছতে মোটামুটি রাত্তির। আর এখন দিনকালই আলাদা। সন্ধ্যের পর কেউ বাইরে থাকতে চায় না। বেলা চারটে না বাজতেই অফিসে ভাঙনের চেহারা। দূর দূর থেকে যারা আসে, ট্রেনে কিংবা বাসে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে তাদের ব্যস্ততা বেশী। টিফিনের পরই অনেকের টেবিল পরিষ্কার, যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। শুধু কোনোমতে চারটে পর্যন্ত মুখ তুলে ভেসে থাকা। তারপর টুপ করে গাছের পাতার মত নিঃশব্দে খসে পড়া। ছুটির সময় পর্যন্ত যে কটা লোক থাকে, তাদের আঙুলে গোনা যায়।

সপ্তাহের অন্য দিনগুলো পানকৌড়ির মত ডুবসাঁতার দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া চলে। একবার অফিসে ঢুকলেই অত বড় দিনমান হুস করে কাবার। মুস্কিল শুধু শনিবারটাকে নিয়ে। দুটো বাজলে ছুটি। গেরস্থ মানুষের

মত মিলন তখুনি ঘরমুখো হতে চায় না। তাছাড়া একবার ঘরে ঢুকলেই চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী। ফের বেরোবার ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব হয় না। কিন্তু বেলা ছুটোর সময় অফিস থেকে বেরিয়ে সে যাবে কোথায়? গল্পগুজব, জমাটি আড্ডা দেবার জায়গা তার নেই। গার্ল-ফ্রেণ্ড দূরের কথা, এ-অফিসে তার একটা অন্তরঙ্গ বন্ধু পর্যন্ত হয়নি। সুতরাং শনিবারের দুপুর কাটাতে চৌরঙ্গীপাড়ার একটা সিনেমা হলে গিয়ে সে ঢোকে। তাই দু-একদিন আগে থাকতেই ম্যাটিনি শো-র একখানা টিকিট মিলন কেটে রাখে।

হাঁটতে হাঁটতে সে রেলের বুকিং অফিসটার কাছে পৌঁছল। ময়দানের মাঠে সন্ধ্যের ছায়া নামছে। দূরে গঙ্গার ওপারে পশ্চিমের আকাশে এখনও রক্তমেঘস্তূপের ছিটেফোঁটা। রাজপথের দুপাশে দুধশাদা নিওন বাতিগুলো প্রায় ভোজবাজির মত টুপটাপ জ্বলে উঠল। বহুদূরে একটা বড় বাড়ির গায়ে কোনো চা কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। বিদ্যুতের কৌশলে কেৎলির ভিতর থেকে কাপের মধ্যে কেবলি চা ঢালা হচ্ছে মনে হয়।

কাঁধের উপর কে যেন হাত রাখতেই মিলন পিছন ফিরে তাকাল। তার মতই এক যুবা পুরুষ। পরনে হাল্কা ছাই রঙের প্যাণ্ট-কোট, গলায় বাঁধা সুদৃশ্য লাল টকটকে টাই। শ্যাম্পু করা চুলগুলি বেশ ফোলানো ফাঁপানো, মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। বেশভূষা দেখলেই অবস্থা বেশ স্বচ্ছল বলে বোঝা যায়।

মিলন ওকে চিনতে পারল্। কিন্তু নামটা ঠিক মনে আসছে না। অনেক সময় তার এমনি হয়। ক'দিন আগে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। মুখ চেনা মানুষ, তবু কিছুতেই নাম মনে করতে পারেনি। শেষে ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিতে মিলন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

তার কাঁধের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে লোকটি এবার মুখের দিকে তাকাল। অভ্যেসমত গলার টাইটা একটু নাড়াচাড়া করে শুধোল—'কি রে মিলন, আমাকে চিনতে পারলি না? আমি অপরেশ—'

মিলন অপ্রতিভের মত কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল। বন্ধুর ডান হাতের আঙুলগুলি ঈষৎ চেপে ধরে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বলল,—চিনতে

পেরেছি বৈকি। মুখের দিকে তাকালেই চেনা যায় তোকে। কিন্তু কি জানিস, তোর নামটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। শেষে ভাবছিলাম জিজ্ঞেস করে ফেলি—'

অপরেশ হা-হা করে হাসল, 'তাহলে কিন্তু ভারী মজা হত রে।' মুখখানা কৌতুকে উজ্জ্বল করে সে বলল,—'আমি কি উত্তর দিতাম জানিস? বলতাম কোন নামটা শুনবেন মশায়? ছোটবেলায় স্কুলে আমার ক্লাসফ্রেণ্ডরা ঠাট্টা করে একটা নাম দিয়েছিল। সেই নামটা কি বলতে হবে?'

আঁধারে টর্চের আলো পড়ার মত মিলনের ক্লান্ত শুকনো মুখ হঠাৎ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বলল,—'আরে তাইতো, তোকে তো আমরা প্রিন্স বলে ডাকতাম। তখন অবশ্য ক্লাশে ওই নামেই তুই খুব পপুলার ছিলি। আমরা আড়ালে হাসাহাসি করতাম বটে, কিন্তু মনে মনে তোকে হিংসে করেছি, কি সুন্দর সব জামা-কাপড় পরে তুই স্কুলে আসতিস, এখন মনে পড়ছে তোর পকেটে একটা গোল্ড-ক্যাপ পার্কার কলম থাকত, আর হাতে সোনার ব্যাণ্ড-অলা ঘড়ি।'

অপরেশ সায় নিয়ে বলল,—'হ্যাঁ। কলমটা বাবার দেওয়া আর ঘড়িটা জন্মদিনে দাদু আমাকে প্রেজেণ্ট করেছিলেন।'

মিলন শুধোল,—'আচ্ছা, তোকে রাজপুত্তুর নামটা কে দিয়েছিল মনে আছে?'

'নিশ্চয়।' অমরেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল। 'মনে নেই আবার? ও নাম দিয়েছিল আমাদের ক্লাশের ঢ্যাঙা সুরেশ। কি দুষ্টু আর ফক্কড় ছেলে ছিল রে বাবা। আমাদের সঙ্গে কিন্তু আর একজন সুরেশও পড়ত রে। তোর মনে নেই? সেই যে ফর্সা রোগা মতন ছেলেটা? ডান চোখটা ঈষৎ ট্যারা। সবাই ওকে ডাকত ট্যারা সুরেশ বলে, তাই না রে মিলন?'

—'উঃ। তোর দেখছি 'সব মনে আছে,' মিলন খুশির সুরে কথা কইল। তার মুখ দেখে মনে হল সে কান পেতে বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটি অতি পরিচিত গানের সুর শুনছে।

'অনেক দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল। তা প্রায় সাত-আট বছর খুব হবে, কি বল?'

—'তা হবে বৈকি।' মিলন মনে মনে একটা হিসেব খাড়া করার চেষ্টা করল। 'আমরা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়েছি সিক্সটি টু তে। পাশ করে আমি ভর্তি হলাম শিবপুরে। তুই বোধহয় স্কটিশে ঢুকলি। তারপর পথে ঘাটেও তোকে কোনোদিন মিট করিনি। আজ স্রেফ বরাত জোর। তাই দেখা পেয়ে গেলাম।'

—'দেখা হবে কেমন করে?' অপরেশ হেসে বলল, আমি কলকাতা ছেড়েছি নাইনটিন সিকসটি থ্রি-তে। গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যেই চলে গেলাম। ফিরে এলাম এবছর জুন মাসের মাঝামাঝি।'

—'বলিস কি রে? এই সাত বছর তুই বাংলাদেশের বাইরে কাটিয়েছিস?—'

অপরেশ চুপ করে কি যেন ভাবল। গলার টাইটা অভ্যেসমত নাড়াচড়া করে বলল,—'শুধু বাংলাদেশের বাইরে কেন? এর মধ্যে তিন বছর তো ইণ্ডিয়ার বাইরেও ছিলাম।'

—'তাই নাকি?' মিলন সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। 'তুই গিয়েছিলি কোথায়? ইংলণ্ডে না আমেরিকায়।'

—'ইংল্যাণ্ডেই তিন বছর ছিলাম। স্টেটসে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হয়ে ওঠে নি। তবে কন্টিনেন্টের বহু দেশ ঘুরেছি। ফ্রান্স, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড হল্যাণ্ড—।' একটু থেমে অপরেশ হঠাৎ বলল,—'দুর! এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি গল্প করা যায়? এতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল। চল একটা রেঁস্তোরায় ঢুকে বসি। লেট আস সেলিব্রেট আওয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ডশিপ।'

বন্ধুর সঙ্গে টুকরো কথাবার্তা বলতে বলতে মিলন এগোচ্ছিল। সাত-আট বছর কলকাতায় না থাকলে কি হবে, এলাকাটা অপরেশের চেনা এবং পরিচিত বলেই তার মনে হল। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে খানিকটা এগিয়ে দুজনে বাঁ দিকে একটা গলির মধ্যে ঢুকল। মিনিট খানেক পরেই বেশ অভিজাত এবং আলোকজ্জল একটা রেঁস্তোরার সামনে অপরেশ তাকে নিয়ে এল।

পুশ-ডোর ঠেলে দুজনে ভিতরে ঢুকল। হলঘরের মত কক্ষটি ভারী

সুন্দর। আলো আর অন্ধকারে মেশামেশি। আসনগুলি প্রায় ভর্তি। খরিদ্দার দেখে একজন রিশেপসনিস্ট গোছের লোক এগিয়ে এসে বিনীত অভ্যর্থনা জানাল। তারপর এপাশে ওপাশে দ্রুত এবং সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে তাদের একটা ছোট টেবিলের কাছে নিয়ে গেল।

মুখোমুখি দুটি আসন। চেয়ারে বসে অপরেশ শুধোল,—'এখানে আগে কখনও এসেছিস?'

মিলন মাথা নাড়ল। এমনি অভিজাত সব রেঁস্তোরা সে বাইরে থেকে অনেকবার দেখেছে। কিন্তু ভিতরে ঢোকেনি। ছেলেবেলার বইয়ে পড়া রূপকথার রাজ্যের মত এই আলোছায়াময় প্রায় নিস্তব্ধ পরিবেশ তার কাছে একটা স্বপ্নের দেশ। বছর তিনেক আগে সে অবশ্য একবার পার্ক স্ট্রীটের এক নামী রেঁস্তোরায় গিয়েছিল। তিন-চার জন বন্ধু মিলে কি সব খেয়েছিল মনে নেই। কিন্তু বিলের অঙ্ক দেখে তাদের চক্ষু ছানাবড়া। বেমক্কা অনেকগুলো টাকা সেদিন বেরিয়ে গেল।

—'না আসাই অবশ্য সম্ভব।' অপরেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিল। বলল,—'মাস দুই হল এটা চালু হয়েছে। বার অ্যাণ্ড রেঁস্তোরা। তবে ড্রিংকসের মডারেট চার্জ। তাছাড়া ফুডগুলো খুব ডিলিসাস। আমার তো খুব পছন্দ—'

টেবিলের পর মেনু কার্ড রেখে অভ্যর্থনাকারী সেই লোকটি একটু দূরে দাঁড়াল। মিলন তাকিয়ে দেখল তার হাতে একটা ছোট নোটবুক আর পেন্সিল। সম্ভবত অর্ডার নেবার জন্য সে অপেক্ষা করছে।

—'কি খাবি বল? হুইস্কী চলবে তোর?' অপরেশ শুধোল।

—'হুইস্কী?' মিলন চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাল।

—'কেন আপত্তি আছে নাকি?' অপরেশ মুচকি হাসল। 'আচ্ছা কড়া জিনিস থাক। তুই এক পেগ জিন নে। খুব লাইট—আমরা বলি লেডিজ ড্রিঙ্ক। কেমন?'

মিলন ভাবল, সে পরিষ্কার করে বলবে। মদ সে খায় না। মানে এর আগে কোনদিন খায় নি। সে যে পরিবারে মানুষ সেখানে মদ একটি নিষিদ্ধ বস্তু। মেয়েদের নরম ঠোঁটের স্পর্শের মতই মদ তার যৌবনে এখনও

অনাস্বাদিত। সে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে এই দৃশ্য দেখলে তার বাবা শিউরে উঠবেন। মা হয়তো মূর্চ্ছা যেতেও পারেন।

তবু অপরেশের কাছে একথা স্বীকার করতে তার কেমন বাধল। মনে হল, তার আপত্তির কারণ শুনলে অপরেশ হা-হা করে হাসবে। বলবে,—'তুই একটা পিউরিটান বনে গেছিস তা তো জানতুম না।' তার অন্তরের ভিতরে বসে কে যেন সাহস জোগাল,—'আরে ঘাবড়াও মৎ।' এক পেগ মদ পেটে পড়লেই তোমার জাত যাবে না। তাছাড়া শুনলেই তো, জিন মেয়েরা গিলছে। না হয় ভাবলে মদের গেলাস নয়, তুমি দুধের কাপে চুমুক দিচ্ছ।'

অপরেশ হুইস্কী আর জিনের অর্ডার দিল। তার সঙ্গে কিছু খাবার। এক প্লেট চিকেন আর এক প্লেট চিংড়ির ফ্রাই।

—'তোর অফিসটা এখানে কোথায় ? মিলন শুধোল।

—'ক্যামাক স্ট্রীটে। আমাদের কোম্পানীর হেড অফিস বোম্বাইতে। ক'লকাতায় নতুন ব্র্যাঞ্চ খোলা হয়েছে।'

—'কিসের বিজনেস ?'

—'কুলিং সিস্টেম অ্যাণ্ড ফ্লেকসিবলসের। বেরিলীতে আমাদের কারখানা আছে। সেখানে তৈরি হয়। এগুলো সাধারণত: মোটরগাড়িতে আর জাহাজে লাগে—'

—'তুই কি পোস্টে আছিস ?'

—'অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। এখানের ব্রাঞ্চের চার্জে আছেন মিঃ থানাওয়ালা। উনি বোম্বাইয়ের লোক। কলকাতায় কয়েক মাস হল এসেছেন। কিন্তু মন উড়ু-উড়ু। তাছাড়া কলকাতা ওর স্যুট করছে না। গোপনে উনি তদ্বির-তদারক করছেন, যাতে শিগগির হেড-অফিসে ফিরে যেতে পারেন ; বলা যায় না, তখন হয়তো কোম্পানী আমাকেই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার করবে।'

—'উইস ইউ গুড লাক।' মিলন শুভেচ্ছা জানাল। ফের শুধোল,

—'আচ্ছা বিলেতে তুই কি পড়তে গিয়েছিলি ?'

—'সে অনেক কথা।' অপরেশ সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে এক

মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। বলল,—গিয়েছিলাম সেক্রেটারীশিপ পরীক্ষা দেব বলে। তারপর ভাবলাম কস্টিং পড়ব। শেষমেস কিছুই হল না। বিজনেস অ্যাডমিনস্ট্রেশনের একটা ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরে এলাম।'

—'এসেই চাকরি পেয়ে গেলি?—'

—'তা একরকম বলতে পারিস। অবশ্য একটা ভালো রেফারেন্স ছিল। বাবার এক বন্ধু ম্যানেজিং ডিরেকটরের সঙ্গে বিলেতে পড়ত। তার রেকমেণ্ডশনে সাহেব খানিকটা ভিজল। বাকিটুকু আমার চেহারা, পোশাক আর বিলাতের সার্টিফিকেটে কাজ হল।'

—'কি রকম পাচ্ছিস?' মিলন একটু হাসবার চেষ্টা করল।

—'নট এ লুক্রেটিভ সাম। আপাততঃ হাজার দেড়েক টাকা দিচ্ছে। কিন্তু ইনকামট্যাক্স, এটা-সেটে কেটে কি এমন আর হাতে থাকে বল?'

বয় এসে হুইস্কী আর জিন মাপ করে গেলাসে ঢালল। অপরেশ খানিকটা সোডা মেশাল তাতে। তারপর গেলাসটা তুলে বন্ধুকে বলল, —'আয় লেট আস ড্রিঙ্ক ইন মেমারি অফ আওয়ার ওল্ড স্কুল ডেজ।'

এক চুমুক গলা দিয়ে নামতেই মিলনের কেমন বিস্বাদ লাগল। একটা তিক্ত অনুভূতি, কানের কাছটা গরম, ঝাঁ-ঝাঁ ঠেকছে। মিলন প্লেট থেকে এক টুকরা মুরগীর মাংস তুলে মুখে দিল।

—'তারপর বল, তোর খবর কি? কোথায় আছিস?' এক ঢোক হুইস্কী গিলে অপরেশ বেশ বৈঠকী মেজাজে কথা শুরু করল।

'—আছি এক জায়গায়।' মিলন ম্লান হাসল।

—'কোথায় বল না? পাবলিক সেকটরে না কোনো প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজে।'

—'পাবলিক সেকটরেই,—মানে একটা সরকারী চাকরি করছি।'

—'গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস! তা মন্দ নয়। মাইনেপত্র একটু কম হলেও একটা সিকিওরিটি আছে। এই বাজারে সেটার মূল্য অনেকখানি।' সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিল অপরেশ। শুধোল,—'আচ্ছা, তুই তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলি, তাই না।'

—'হ্যাঁ,' মিলন সায় দিল।

'আছিস কোথায় ? পি ডবলিউ ডি না ইরিগেশনে ?'

—'শুনে কি করবি ?' মিলন উদাসীন হবার চেষ্টা করল।

—'বলতে আপত্তি কিসের ? কোথায় চাকরি করছিস বলবি না ?'

মিলন ঢক করে খানিকটা মদ গিলে ফেলল। জিভটা তেতো, বিবমিষা ভাব। একটা চিংড়ির ফ্রাই টুপ করে মুখ ফেলে সে সুস্থ হবার চেষ্টা করল। একটু পরে বলল,—'আমি কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টে একটা চাকরি করছি।'

—'কো-অপারেটিভ ?' অপরেশ বড় বড় চোখ করে তাকাল। 'সেখানে ইঞ্জিনিয়র কি প্রয়োজন ? কি কাজে লাগে ?'

মিলন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। কোনো জবাব দিল না। তারপর ধীরে ধীরে বলল,—'তুই ঠিক ধরেছিস। ওখানে ইঞ্জিনিয়রের কোনো কাজ নেই। ইণ্টারভ্যুর সময় অফিসারও আমাকে সেই কথা বলেছিলেন। আমি উত্তর দিলাম, আপনার কথা মানছি। কিন্তু আমরা বেকার ইঞ্জিনিয়াররা তাহলে কি করব ? কোথায় যাব বলতে পারেন ? অথচ দেখুন, হায়ার সেকেণ্ডারীতে আমি ছুটো লেটার পেয়েছি। স্কলারশিপ ছিল আমার—'

উত্তেজনায় মিলনের চোখ ছুটো চকচকে দেখাচ্ছিল। সে একটু হেসে ঠিক ওষুধ গেলার মত ফের খানিকটা মদ খেল। তারপর জ্বরো রুগীর মত বিস্বাদ মুখ করে বলল,—তবু চাকরিটা পেলাম বলে কোনোমতে টিকে আছি। নইলে কি করতাম, কে জানে !'

—'ভেরী স্যাড।' অপরেশ ছুঃখ প্রকাশ করল।

মিলন বলল,—অনেক আশা করে বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছিলেন। তার ধারণা ছিল, পাশ করে আমি একটা ভাল চাকরি পাব। সংসারে মোটা সাহায্য করব। কিন্তু আমার স্বপ্ন, বাবার আশা সব ঠুনকো কাচের মত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

—'বাদ দে ওসব কথা।' অপরেশ প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইলে। তারপর বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'লেট আস হোপ ফর গুড টাইম। আচ্ছা আমি তোর জন্ম চেষ্টা করব। অনেস্টলি বলছি মিলন,—আই শ্যাল ট্রাই ফর ইউ। রিয়েলী—'

বয় বিল নিয়ে এল। পকেট থেকে টাকা বের করে অপরেশ প্লেটের উপর রাখল। মিলন তাকিয়ে দেখল, দুটো দশ টাকা আর একটা পাঁচ টাকার নোট। টাকা দুই তিন ফেরৎ পাবার কথা। কিন্তু অপরেশের যেন অপেক্ষা করবার ইচ্ছে নেই, সে উঠে দাঁড়াতেই বেয়ারা একটা লম্বা সেলাম দিল। মিলন বুঝতে পারল বাকি পয়সাটা অপরেশ টিপস দিয়েছে।

রাস্তায় নেমে অপরেশ বলল,—তুই একটা আনাড়ি। এমন মুখ কুঁচকে মাল গিলছিলি যে আমার হাসি পাচ্ছিল।

মিলন কোন জবাব দিতে না পেরে শুধু হাসল।

অপরেশ ওর পিঠ চাপড়ে বলল,—'নেভার মাইণ্ড। চল একটা ভালো হোটেলে একদিন ডিনার খেয়ে আসবি।'

—'কোথায়?' মিলন সম্মোহিতের মত উচ্চারণ করল।

—'ড্রিমল্যাণ্ডে যাই চল। ওখানে ভালো ক্যাবারে ডান্স হয়। মেয়েটা নাকি বেপরোয়া নাচে। ওর নাম সুইসি,—সুইসি মুলার। শুনেছি এক একদিন আইনকানুন মানে না।'

'—বলিস কি? মিলন উত্তেজিত অথচ অনুচ্চকণ্ঠে শুধোল।

—সাচ বাত ইয়ার, একদম ঝুট নেই।' অপরেশ ঠিক নেশাগ্রস্থ মানুষের মত বিড়বিড় করে জবাব দিল। ফের বলল,—অলরাইট, একদিন চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসবি চল।'

একটা খালি ট্যাক্‌সি যাচ্ছিল। অপরেশ ইঙ্গিত করতেই সেটা দাঁড়াল। অপরেশ বলল,—'আমি সাউথে যাব। তুই কি ওদিকে থাকিস?'

—'নারে, আমি থাকি আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে।' হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিলন বলল,—বড্ড দেরি হয়ে গেল। আমাদের ওদিকটায় আবার ক'দিন গণ্ডগোল। আজকাল এমন হয়েছে, একটু রাত হলে নিজের পাড়াতে ঢুকতেই কেমন ভয় ভয় করে।'

—'চল তাহলে। তোকে চৌরঙ্গীর মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যাই। ওখন থেকে ট্রাম-বাস যা হোক কিছু পাবি।'

মিলন যখন বাড়ি পৌঁছল, তখন সবে আটটা বেজেছে। অমিয় বারিক

লেনটা এখনই বেশ নির্জন। কেমন ঝিমিয়ে-পড়া চুপচাপ ভাব। লোকজন প্রায় নেই। আগে কত রাত পর্যন্ত মানুষের পায়ের শব্দ, ছেলে-ছোকরাদের হাসির হররা এমনকি মেয়েদের চুড়ির টুং-টাং পর্যন্ত শোনা যেত।

দরজা খুলেই মনোরমা শুধোল,—'এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি বাবা? আমি ভেবে অস্থির।'

মিলন হেসে বলল, অফিসের পর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মা, তার সঙ্গেই গল্প করছিলাম। ছেলেটা আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। তখন পড়াশুনোয় তেমন সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু এখন বেশ ভালো রোজগার করে। কত টাকা মাইনে পায় জানো মা?'

দাদার কণ্ঠস্বর শুনে বিন্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে গলা বাড়িয়ে শুধোল,—'কত টাকা মাইনে পায় দাদা?'

—'দেড় হাজার', মিলন সগর্বে জানাল।

—'ওরে বাস! এত টাকা! কি চাকরি করে সে?'

—'একটা কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। বলছিল শিগ্‌গির ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হবে।'

মনোরমা হেসে বলল,—'তোর বোনের জন্যে অমনি একটি ছেলের সন্ধান কর। হেজিপেজি পাত্র হলে আমার মেয়ের মনে ধরবে না।'

মুহূর্তে বিন্তি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। বলল,—'মায়ের যত সব বাজে কথা। বিয়ের ভাবনা কে ভাবছে এখন?' তারপর সে ছুটে ঘরের মধ্যে পালাল।

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ের দিকে একবার তাকাল মনোরমা। তারপর বলল, —'তুই হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ব'স মিলু। আমি তোর চা আর জলখাবার নিয়ে আসছি।'

—'এখন আর কিছু খাব না মা, তুমি শুধু চা দাও।'

—কেন রে? মনোরমা সস্নেহে তাকাল, 'তোর সেই বন্ধু বুঝি খাইয়েছে?'

মিলনের বুকটা হঠাৎ ছাঁৎ করে উঠল। তার মুখে মদের গন্ধ নেই তো?

সে অবশ্য একটা পানের দোকান থেকে খানিকটা সুগন্ধী মশলা চেয়ে নিয়ে মুখে দিয়েছে। কিন্তু গন্ধটা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে কি ?

তবু মায়ের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে মিলন নিশ্চিন্ত হল। সে হেসে বলল,—'অপরেশ কিছুতেই ছাড়ল না মা। জোর করে একটা রেস্টুরেণ্টে নিয়ে গেল।'

—'বেশ তো' মনোরমা খুশিমনে বলল, 'তুই ঘরে গিয়ে বস। আমি এখুনি তোর চা নিয়ে আসছি।'

হাত-মুখ ধুয়ে মিলন ফের ঘরে ঢুকল। বাণীব্রত খাটে বসে সকালের কাগজখানা পড়ছিলেন। ছেলেকে দেখে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন,—'শোন মিলু, তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

—'কি কথা বাবা ?' মিলন কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—'আমি শেষ চেষ্টা করলাম মিলু। কিন্তু কিছু হল না।'

—'কিসের চেষ্টা বাবা ?'

বাণীব্রত বললেন,—'তোর মার কথামত দিন তিন-চার আগে একটা দরখাস্ত করি। বছরখানেক যাতে চাকরিটা থাকে সেজন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আজ সাহেব সেটি নামঞ্জুর করেছেন—'

মিলন অবাক হয়ে শুধোল,—'ওরা তোমায় এক বছর এক্সটেনশেন দিল না বাবা ? তুমি কোম্পানীর জন্য এত করলে, এতদিন বুকের রক্ত জল করে খেটেছ ! এর কোনো দাম নেই ?'

বাণীব্রত সখেদে বললেন,—'কি জানি ! তবে মাস-ছয়েক হয়ত কাজে রাখত। কিন্তু সাহেব হঠাৎ বলে বসলেন—'তোমার দুই ছেলে মানুষ হয়েছে। একজন ইঞ্জিনিয়র আর একজন ডাক্তার। তোমাকে এক্সেটেনশন দিলে দেশের ইয়ংম্যানরা সব চাকরি পাবে কেমন করে ?'

মিলন মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাণীব্রত বললেন,—'তোর দোষ কি। দেশের যা হাল, ঘরে ঘরে বেকার। তুই তবু ইঞ্জিনিয়র, ভালো ছাত্র ছিলি, ভালোভাবে পাশ করেছিস বলে যা হোক একটা চাকরি জুটিয়েছিস। আমাদের অফিসের কত লোকের ছেলে-মেয়ে সব বি এ, এম এ পাশ করে বসে আছে।'

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মনোরমা ঘরে ঢুকল।

মিলন শুধোল,—'হিরু কোথায় মা? তাকে তো দেখেছিনে—'

—'ওর এক বন্ধুর কাছে পড়তে গেছে, দু-তিনটে বাড়ির পরেই ওরা থাকে।'

উত্তরটা মিলনের ঠিক মনঃপুত হল না, সে ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত ভাবল, বলল,—'সন্ধ্যের পর ওকে বাড়ির বাইরে যেতে দিও না মা। দিনকাল সুবিধের নয়। কি থেকে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না।'

—'হিরু বড় হচ্ছে, আর ছোটটি নেই। আমার কথা কি সে শুনবে?' মনোরমা ধীরে ধীরে বললেন।

—বলে দেখো। তোমার কথা না শুনলে আমাকেই একদিন বলতে হবে।' মিলন ভারিক্কী চালে কথা কইল।

বাণীব্রত বললেন,—'আর মাস-দুই আড়াই কলকাতায় আছি। যা পারে করে নিক। তারপর ঘটি-বাটি গুটিয়ে চন্দনপুর যেতেই হবে। আর কোনো উপায় নেই।

চন্দনপুরে যাবার কথা উঠলে মনোরমা ফুঁসে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য! সে চুপ করে রইল। একটি কথা বলল না।

* * *

ঘরটা ফাঁকা। কিরণের আজ হাসপাতালে নাইট-ডিউটি। হঠাৎ ঘুঙুরের মিঠে বোল কানে যেতেই মিলনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার মনে হল বারান্দায় কে যেন নেচে বেড়াচ্ছে। ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুর বাজছে। কিন্তু এত রাত্রে নাচে কে!

দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে উঁকি দিতেই মিলন অবাক হল, আশ্চর্য! এই রাত্তিরে প্রায়ান্ধকার বারান্দায় ঠিক একটা আবছায়া মূর্তির মত বিন্তি একমনে নেচে বেড়াচ্ছে। মিলনের ইচ্ছে করল ওকে ডেকে ধমক দেয়। এত রাত্তিরে না ঘুমিয়ে কি পাগলামি শুরু করেছে?

কিন্তু মিলন কিছু বলল না। সে ফের বিছানায় গিয়ে শুলো। অনেক রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বিন্তি যদি চুপি চুপি নাচ প্রাকটিশ করে,

তাতে আপত্তি কিসের? পরীক্ষার সময় সেও তো অনেক রাত জেগে পড়াশুনো করত।

অনেকক্ষণ মিলনের চোখে ঘুম এল না। ঘুঙুরের বোল কানে আসছে। ছোটবেলায় তাদের বাড়িতে একটা লোক কাজ করত। সে বলত ঘুম না এলে চোখ বুজে ভেড়ার পাল গুনতে শুরু করো, একটা, দুটো, তিনটে—চারটে। তারপর ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে।

কিন্তু চোখ বন্ধ করে মিলন একটা ভেড়াও মনে করতে পারল না। সে ভাব-ছিল এক শ্বেতাঙ্গিনী নর্তকীর কথা। স্বপ্নালোকিত হলঘরের সুদৃশ্য সাজসজ্জা। কত হাসিখুশি সুবেশ নরনারী। টেবিলে কত আহার্য, রঙিন পানীয়, হাল্কা বিলিতি বাজনা, একটা রংচঙে প্রজাপতির মত মেয়েটা এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে নেচে যাচ্ছে। তারপর একসময়—'

বেপরোয়া ক্যাবারে নাচটা অপরেশ তাকে কবে দেখাবে?

## ॥ পাঁচ ॥

একটু সকাল সকাল বাড়ি ফেরার ইচ্ছে বাণীব্রতর। মনোরমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে হবে। হিরুর পাজামা তিনটেই ছিঁড়েছে। একটা প্যাণ্টও আর আস্ত নেই। ছেলে মুখ ফুটে কিছু বলে না। নইলে অনেক আগেই এসব কিনতে হত। কিরণেরও দুটো গেঞ্জি দরকার। বিন্তির জন্য একখানা শাড়ি কিনলে ভালো হয়। মেয়ে বড় হচ্ছে। ভালো জামা কাপড় পরবার শখ। সকাল-সন্ধ্যে মনোরমার কানের কাছে আব্দার-অভিযোগ।

বাণীব্রত শুনে বললেন,—'এই তো সেদিন বিন্তির জন্য একটা কাপড় কেনা হ'ল। এরই মধ্যে আবার?'

—'ওমা!' মনোরমা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল,—'তুমি আবার কবে ওর জন্যে কাপড় কিনলে? পূজোর সময় কেনা শাড়িটার কথা বলছ?'

'পূজো কেন?' বাণীব্রত একটা নিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকালেন, 'এই তো কাদন আগে ভাইফোঁটায় মিলু ওকে একটা শাড়ি কিনে দিল—'

—'তাই বলো!' মনোরমা হাসল, 'মেয়ে বলে ও শাড়ি তার দাদারা কিনে দিয়েছে। তোমাকে তো কিনে দিতে হয়নি।'

বাণীব্রত হাসলেন। মেয়েটার বুদ্ধি খুব। কথায় ওকে হারানো কঠিন। অবশ্য মেয়েরা এমনিই,—বেশী প্র্যাকটিক্যাল। সাংসারিক কাজে বুদ্ধি প্রখর। অথচ তার ছোট ছেলে হিরু কেমন যেন। নিরুত্তাপ, নির্বিকার। জামা-প্যাণ্ট ছিঁড়ে গেলেও সে মুখ ফুটে কিছু বলবে না। বড় জোর ছেঁড়া জামাটা মাকে সেলাই করার জন্য এগিয়ে দেবে।

'বরং মনোরমা বিরক্ত হয়ে বলেছে'—'ছেঁড়া জামা আর সেলাই করতে পারিনে হিরু। চল আমার সঙ্গে দোকানে। ছিট কিনে জামা করতে দিয়ে আসবি।' তারপর সস্নেহে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ফের শুধিয়েছে,—'হ্যাঁরে, আজকালকার ছেলেরা কত সুন্দর সব জামা-টামা পরে বেরোয়। আর তুই কিনা সেলাই-করা জামা পরে হাসিমুখে ঘুরবি?'

না, সেদিক থেকে হিরুর কোনো খুঁত নেই। বাণীব্রত জানেন তার ছোট ছেলেটি রত্ন। সেজন্যই হিরুকে নিয়ে বেশী চিন্তা। লেখাপড়ায় অবশ্য মিলুও ভালো রেজাল্ট করেছিল। হায়ার সেকেণ্ডারীতে স্কলারশিপ আর দুটো লেটার। আর কিরণ টায়ে-টোয়ে ফার্ষ্ট ডিভিসন পেয়েছিল। তারপর যথারীতি ডাক্তার হয়েছে। কিন্তু হিরুর উপর বাণীব্রতর আর একটু বেশী আশা। তার দাদাদের থেকেও হিরু ভালো রেজাল্ট' করবে। স্কলারশিপ তো পাবেই। হয়তো একটা ষ্ট্যাণ্ডও করতে পারে।

ঘড়িতে প্রায় সওয়া তিনটে বাজল। শীতের বেলা। এমনিতেই রোদ কম। বেলা না ফুরোতেই রাজপথে, বাড়ির গায়ে, আনাচে-কানাচে অপরাহ্ণের ঘন ছায়া। ছিটেফোঁটা রোদ্দুর এখন উঁচু আকাশ-চুম্বী অট্টালিকার মাথায় সলমা-চুমকির কাজের মত ঝিলমিল করছে।

অফিসারের ঘর থেকে বেরিয়ে বাণীব্রত ফের নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। টেবিলের উপর একরাশ ফাইল, নানা কাগজপত্র পড়ে। সেগুলি গুছিয়ে রাখতে হবে। আসানসোলের ব্র্যাঞ্চে একটা জরুরী চিঠি

লেখা দরকার। মুখে মুখে বয়ানটা তিনি যোগেশকে বলে যাবেন। বিকেলেই অফিসারকে দিয়ে চিঠিটা সে সই করিয়ে রাখবে।

বাণীব্রত ফাইল গোছাতে ব্যস্ত হলেন। কাজের টেবিল অগোছালো, কাগজপত্র নোংরা করে রাখা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। তার টেবিলে টুকিটাকি জিনিসপত্র সব সুন্দর করে সাজানো। সকালে এসে বাণীব্রত যখন চেয়ারে বসেন, তখন টেবিলের চেহারা প্রসাধন করা মুখের মত। বিকেলে বাড়ি ফেরার আগে টেবিলটি নিজের হাতে গুছিয়ে যেতে কোনোদিন ভুল হয়নি তার।

মুখ তুলতেই আদিনাথের সঙ্গে চোখা-চোখি হল। অ্যাকাউন্টস সেকশনের আদিনাথ সরকার। তার মতই প্রবীণ। মাথার চুল প্রায় শাদা। ললাটে বলিরেখা স্পষ্ট। বয়স তারই মত। কিম্বা দু-এক বছরের ছোট হবে তার চেয়ে। বাণীব্রত মাস দুয়েক পরেই রিটায়ার করবেন। আর আদিনাথের এখনও বছর দেড়েক চাকরি আছে

—'কি হে, আজ সকাল-সকাল চললে যে'—আদিনাথ শুধোল।

বাণীব্রত হেসে বললেন,—'গিন্নিকে নিয়ে একবার বাজারে যেতে হবে। ছেলে-মেয়েদের জামা কাপড় কিনব, আরো কি সব দরকার সে উনিই জানেন। আর যা দিনকাল, সন্ধ্যের পর বাইরে বেরোতে সাহস হয় না।'

—'তা যা বলেছ।' আদিনাথ সমর্থন করল। ফের শুধোল,—'তোমাদের পাড়ার অবস্থা কেমন? হাঙ্গামা-গণ্ডগোল বেশী নাকি?'

—'বেশী কম বুঝতে পারিনে। বাণীব্রত হাসলেন। 'মাঝে মাঝেই দু-পক্ষে ধুন্ধুমার লড়াই হচ্ছে। দুম্‌দাম্ বোমার শব্দ, হৈ-হল্লা আর চিৎকার শুনি। তবে ঘণ্টাখানেক পরেই সব চুপচাপ। অল ক্লিয়ার হয়েছে বোঝা যায়।'

আদিনাথ বলেন,—'আমাদের ওদিকের অবস্থাও তেমনি। এই তো খানিক আগে শুনলাম বনগাঁ লাইনের ট্রেণ বন্ধ। কি করে বাড়ি ফিরব, তাই ভাবছি।'

—'তাই নাকি? ট্রেণ বন্ধ? তাহলে এখনও অফিসে আছ কেন? বাড়ি ফিরবে কেমন করে?'

—'যেমন করে হোক যেতে হবে।' আদিনাথ মাথার চুলে হাত বুলোল। বলল,—'শ্যামবাজার থেকে বাস ছাড়ে। শেষকালে সেখানেই চেষ্টা করব।'

—'তাই বলো। শ্যামবাজার থেকে প্রাইভেট বাস যাচ্ছে। তাহলে একটা উপায় আছে।'

আদিনাথ ম্লান হেসে বলল,—উপায় হবে কিনা কে জানে। এমনিতেই বাসে যা ভিড়। একটা মাছি গলবার ফাঁক নেই। ট্রেণ বন্ধ হলে ষোল কলা পূর্ণ। ছাদে উঠে বসবার জায়গা মিলবে না।'

—'তাহলে কি করবে আদিনাথ?'

—'কি করবো আবার? খানিকক্ষণ চেষ্টা করে দেখব। বাসে উঠতে না পারলে বাগবাজারে পিসতুতো বোনের বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে দেব। তবে ওদেরও খুব জায়গার অসঙ্কুলান। মোটে দেড়খানা ঘর। হুট করে গিয়ে উঠলে খুব বিব্রত হয় বুঝতে পারি।'

—'শুধু কি তাই?' বাণীব্রত সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'সারাদিন খেটেখুটে নিজের বাড়িতে না ফিরলে মনটাই কেমন খিঁচড়ে যায়। সত্যি কথা, ছুটো কি বড় জোর তিনটে ঘর। কিন্তু তবু দিনের শেষে ঐ তো আশ্রয়। না গেলে মন ভরে না।'

আদিনাথ কেমন হতাশার সুরে বলল,—'আগে আগে তাই অবশ্য মনে হত। বিকেলের বেলা পড়লেই ভাবতাম কতক্ষণে বাড়ি ফিরব। তখন ছেলেমেয়ে বড় হয়নি। গিন্নির হাতে পায়ে ক্ষ্যামতা ছিল। খেটেখুটে ঘরখানা ঝকঝকে তকতকে করে রাখত।'

—'আর এখন কি ব্যাপার?' বাণীব্রত কৌতুক করলেন। ঘরদোর অগোছালো। গিন্নির তোমার দিকে নজর দেবার সময় নেই। তাই না?'

—তা নয় হে। আদিনাথ শুকনো গলায় জবাব দিল। 'বাড়ি ফিরতে মন চাইবে কেন বল? ঘরে দু-দুটো জোয়ান ছেলে লেখাপড়া শেষ করে বসে আছে। আজ দু-বছরের উপর বেকার। বড় মেয়েটা ঠুক ঠুক করে একটা প্রাইমারী স্কুলে যাতায়াত করছে। কিন্তু ওকে পাত্রস্থ করতে পারিনি। আর পারব বলেও মনে হয় না।'

কয়েক সেকেণ্ড দুজনেই চুপচাপ।

আদিনাথ ফের বলল,—'অবশ্য তোমার কথা আলাদা। ছেলে তিনটিই রত্ন। বড়টি ইঞ্জিনিয়র, মেজ ডাক্তার। ছোট ছেলেটিও পড়াশুনোয় ভালো। ফি-বছর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। বড় মেয়েটির বিয়েও দিয়েছ।—'

বাণীব্রতর মনে হ'ল আদিনাথের কথায় খেদ আর চাপা ঈর্ষার সুর। ম্লান হেসে তিনি বললেন—'ছেলেরা রত্ন ঠিকই। তবে রত্নোরও আর কদর নেই। সব ঝুটো। পাথরের দামে বিকোচ্ছে।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন বাণীব্রত। ফের শুধোলেন,—'আচ্ছা তোমার বড় ছেলেটি তো অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছিল, তাই না?'

—'হ্যাঁ, হিষ্ট্রীতে অনার্স। স্কটিশ চার্চ থেকে পাশ করেছে। পড়াশুনোয় ব্রিলিয়্যাণ্ট না হলেও ছেলেটা মন্দ ছিল না। সেইজন্যেই তো আরো খারাপ লাগে। যতদিন যাচ্ছে ওর মুখের দিকে তাকাতে পারিনে।'

—'অত হতাশ হ'য়ো না আদিনাথ।' বাণীব্রত সান্ত্বনা জানালেন। 'চাকরি একটা হবেই। মিছিমিছি মন খারাপ করে লাভ কি ব'ল?'

আদিনাথ নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খানিকটা স্বগতোক্তির মত খাটো গলায় বলল,—'মনের আর দোষ কি? ঘরে জোয়ান বেকার ছেলে আর সোমত্ত আইবুড়ো-মেয়ে, কেমন করে আমোদে আহ্লাদে থাকি বলতে পার?'

বাণীব্রত চুপ, মুখে কথা জোগাল না। কি বলবেন আদিনাথকে? তাদের অফিসেও বহুদিন লোক নেওয়া হয়নি। না হলে আদিনাথের ছেলের জন্য তিনি নিজে চেষ্টা করতেন। অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছে। একটা জুনিয়র ক্লার্কের পোস্ট নিশ্চয় জুটত। কিন্তু কোম্পানীর কি হয়েছে কে জানে। বছর দুই একটি লোকও নেয়নি। যে আসন খালি হচ্ছে, তা শূন্যই থাকে। নতুন লোক নেওয়ার কোনো তাগিদ নেই। মাঝারি আর ছোট সায়েবরা বলে, কোম্পানীর লাভের নদীতে এখন ভাটা। কারবারও মন্দা। অথচ খরচা বেড়েছে দ্বিগুণ। কিছুতেই পুষিয়ে উঠতে পারে না। তাই লোক নেবার গরজ নেই।

আপিসের ছেলে-ছোকরাদের কাছে বাণীব্রত অবশ্য অন্য কথা শুনেছেন। কোম্পানীর মতলব নাকি ভালো নয়। তলে তলে নানা ফন্দী ফিকির

আঁটছে। ওরা বলে কোম্পানী এখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে চায়। বেরিলীতে মস্ত কারখানা তৈরি হচ্ছে। নতুন যন্ত্রপতি, মেসিন সব সেখানেই চালু হবে। বেলুড়ের কারখানাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করবে। এখনই বলতে শুরু করেছে, কাঁচামাল ঠিকমত মিলছে না। অর্ডারপত্রের অভাব। তখন হেড-অফিসটাও অন্যত্র সরিয়ে নেবে। কলকাতায় একটা ছোটখাটো সেল্‌স অফিস থাকবে মাত্র।

বাণীব্রতর নিজের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। ভবিষ্যতে কোম্পানী কাজ-কারবার গুটিয়ে নিলে তার কি আসে যায়? আর মাস দুয়েক চাকরি আছে। তারপরই কোম্পানীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন। শুধু প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুয়িটির টাকা কটা পেলে হয়। ব্যস! তারপর ফার্গুসন অ্যাণ্ড মরিসন কোম্পানীর সঙ্গে তার কোনো যোগসূত্রই থাকবে না।

তবু তার ভাবনা হয়। কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে গেলে দেশের কি হাল হবে? ছেলে-ছোকরাদের চাকরি হবে কোথায়? এমনিতেই যা অবস্থা।

ঘরে ঘরে বেকার। আদিনাথের পাশ করা ছেলের মত আরো কত সুন্দর যুবক ইঁটের তলায় বহুদিন ধরে চাপা ফ্যাকাশে ঘাসের মত নিরানন্দ মুখে ঘরের কোণে লুকিয়ে আছে।

আদিনাথ শুধোল—'তারপর, তোমার দেশের বাড়ি সারানো হ'ল? রিটায়ার করে তো সেখানেই যাবে বলেছিলে?'

—হ্যাঁ, কলকাতায় থাকার আর ইচ্ছে নেই। কি জন্যে এখানে থাকব বলতে পার? অনুচ্চ অথচ ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে ফের বললেন,—আড়াইখানা মোটে ঘর। ঘুরতে ফিরতে গায়ে দেয়াল ঠেকে। তার জন্যে মাস গেলে এক কাঁড়ি টাকা ভাড়া গুণতে হয়। সে তুলনায় আমার দেশের বাড়ি স্বর্গ হে। উপর-নীচে মিলিয়ে ছ খানা ঘর। মস্ত উঠোন। খানিকটা বাগানও আছে। হাত-পা ছড়িয়ে তোফা থাক। এবার ছুটি নিয়ে দেশে গেছলাম। ঘরদোর সারিয়ে রং-টং করালাম। রিটায়ার করে বাকি দিন কটা নিশ্চিন্তে কাটাব। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানো?'

—'কি মুস্কিল আবার?' আদিনাথ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল।

বাণীব্রত পরিষ্কার বললেন—'চন্দনপুরে যেতে কেউ রাজি নয়। এমন কি তোমার বৌদি পর্যন্ত। আমার বাড়ি ওদের কারো পছন্দ হয়নি। ছেলেরা বলে চন্দনপুরের বাড়ির পিছনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আমি অপব্যয় করেছি—'

আদিনাথ মৃদু হেসে বলল,—'তুমি মিথ্যে রাগ করছ। তোমার দেশের বাড়িতে কেন ওরা যেতে চাইবে? ছেলেমেয়েদের কি দোষ বলো? ওরা জন্ম থেকে কলকাতায় আছে, এখানেই মানুষ। কলকাতার বাইরের জগতটা কি ওরা চেনে?'

বাণীব্রত এবার উত্তেজনার বশে বললেন, তাহলে তোমার বৌদিও কলকাতার লোক বলো। তিনি জন্মে কখনও পাড়াগাঁ দেখেন নি।—'

আদিনাথ হেসে ফেলল। কোনো কথা কইল না।

বাণীব্রত ফের বললেন—'তার কি ইচ্ছে জানো? রিটায়ার করার পরও আমি কলকাতায় থাকি। বড় আর মেজ দুই ছেলেই মায়ের সঙ্গে একমত। তারা বলে আমি ভুল করেছি। চন্দনপুরের বাড়ির পিছনে অতগুলো টাকা নষ্ট না করে কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট বাড়ি কেনা উচিত ছিল আমার।—'

—'ফ্ল্যাটবাড়ি?'

—'হ্যাঁ, ঐ যে আজকাল সব কো-অপারেটিভ করে ফ্ল্যাট কিনছে। নীচের জমিও তোমার নয়, আর মাথার ছাদও বারোয়ারী। 'শুধু দু'খানা কি তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট তোমার দখলে।' বাণীব্রত এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ফের শুরু করলেন,—'এতকাল তো সেই ফ্ল্যাটেই কাটালাম। বুড়ো বয়সে আবার কারো পায়রার খুপরীতে ঢুকতে মন চায়?'

কথায় কথা বাড়ে। আদিনাথ তাই চুপ করে রইল। আলোচনায় ছেদ টানার জন্য বলল,—'তুমি যে সকাল সকাল বাড়ি যাচ্ছিলে? ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ?'

হাতে ঘড়ি নেই। সেখানা কিরণ নিয়েছে। অনেকদিনের ঘড়ি। বিয়ের সময় শ্বশুরমশায় দিয়েছিলেন। ডাক্তারী পড়তে ঢুকেই কিরণের রিস্টওয়াচের প্রয়োজন হল। বাণীব্রত নিজের ঘড়িটা ওকে দিলেন। ইচ্ছে

ছিল, পরে একটা ঘড়ি কিনে দেবেন। ফের নিজেরটা ব্যবহার করতে শুরু করবেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। রিস্টওয়াচ আর কেনা হয়নি। খানিকটা ঢিলেমী, কিছুটা অর্থাভাবও। মনোরমা তো মাঝে-মধ্যেই গজগজ করে, তার বাবার দেওয়া ঘড়িটা কিরণকে দেওয়া কেন? ওটা তো তিনি বাণীব্রতকেই যৌতুক দিয়েছিলেন।

দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বাণীব্রত প্রায় চমকে উঠলেন। পৌণে চারটে হল। আর একটি মিনিটও দেরি করা চলে না। চারটে বাজলেই বাসগুলো ঠিক খড়-বোঝাই গরুর গাড়ির মত। ভিতরে ঠাসা-ঠাসি গাদাগাদি। পাঁচ-সাতটা বাস ছেড়ে বাণীব্রত কোনোমতে একটায় উঠবেন। তাহলে আর মনোরমাকে নিয়ে বেরোনো হবে না।

স্টপেজে দাঁড়িয়ে বাণীব্রত হতাশ। পনেরো বিশ মিনিট এক ঠ্যাঙে তালগাছের মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে! আমহার্স্ট স্ট্রীট যাবার বাসের দেখা নেই। হবে কোনো গণ্ডগোল জ্যাম কিম্বা বিনা নোটিশে হঠাৎ ধর্মঘট। কোনোটাই বিচিত্র নয়—।

তিত বিরক্ত হয়ে বাণীব্রত একটা ট্যাকসি ধরলেন। গা এলিয়ে দিয়ে আয়েস করে বসলেন। খানিকটা যেতেই রাস্তা ফাঁকা হল। একটা ট্রামকে পাশ থেকে দ্রুততর গতিতে অতিক্রম করে ট্যাকসি ছুটে চলল।

দরজা খুলে মনোরমা হাসল। 'ওমা! তুমি এসে গেছ। এখন যে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটে। ধন্যি তোমার টাইম-জ্ঞান বাপু—'

বাণীব্রত চেয়ে দেখলেন সাজগোজ করে মনোরমাও তৈরি। ইতিমধ্যে গা ধোয়া সারা, মুখখানা ঘষে মেজে তকতকে পরিচ্ছন্ন করেছে। চুল বাঁধা-ছাঁদা শেষ, মৌচাকের মত মস্ত খোঁপা। মনোরমার এখনও অনেক চুল। কত যুবতী মেয়ে হার মানবে।

স্ত্রীকে প্রস্তুত দেখে বাণীব্রতর ভালো লাগল। মুখে বললেন,—'যাও চটপট কাপড়টা বদলে নাও। আর দেরি করলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

মনোরমা শুধোল,—'এক কাপ চা খাবে না? এই তো খেটেখুটে ফিরলে—'

—'ফের চা? তাহলে কিন্তু দেরি হবে।—'

'কিচ্ছু দেরি হবে না,' মনোরমা স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভ্রুভঙ্গি করল। 'তুমি মুখ হাত ধুয়ে বস। আমি এখুনি চা বানিয়ে আনছি।'

বাণীব্রত বরাবর লক্ষ্য করে আসছেন, বাড়ি থেকে বেরোবার নামে মনোরমা ডগমগ, চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ে। ওর দোষ নেই। চার দেয়ালের মধ্যে বেচারী বন্দী। ছুটি ছাটায় এক আধটা সিনেমা কিম্বা কোনো আত্মীয়ের বাড়ি। মাঝে-মধ্যে কেনাকাটায় বেরোনো হয়। মনোরমার বহির্বিশ্ব এইটুকুর মধ্যে সীমিত। এর বাইরের পৃথিবীটা ভীষণ অচেনা ······পরপারের মত রহস্যময়।

খানিক বাদেই মনোরমা এল। শুধু চা নয়, হাতে জলখাবারের ডিসও। বাণীব্রত দেখলেন কাপড়খানা পাল্টে এসেছে মনোরমা। এখন বেরোলেই হয়। শুধু চা জলখাবারটুকু খেতে যা দেরি।

কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে এক চুমুক খেলেন বাণীব্রত। চায়ের স্বাদটা ভালো। কেমন সুন্দর গন্ধ, নিশ্চয় দামী চা। কিরণ কোথা থেকে এনেছে বলে মনে হয়। বাণীব্রত জানেন তার মেজ ছেলেটি মায়ের মত চা খোর। এবং কিছুটা বিলাসীও। দিনে কত কাপ চা গিলছে তা নিজেও মনে রাখে না।

বাণীব্রত হঠাৎ শুধোলেন,—'হিরু কোথায়, তাকে দেখছিনে।'

মনোরমা হতাশভাবে বলল,—সেই তো হয়েছে মুস্কিল। হিরু এখনও ফিরল না বলেই তো যেতে পারছিনে।'

'সে কি?' বাণীব্রত চোখ তুলে তাকালেন। 'হিরু গেল কোথায়?'

'কি জানি বাপু। তাকে পই পই করে বলে দিলাম। বিকেলবেলায় আমি তোর বাবার সঙ্গে একটু বেরুবো। কটা জিনিস না কিনলেই নয়। তুই একটু বাড়িতে থাকবি হিরু। সে বলল, নিশ্চয়। বিকেলবেলায় আমি কোথাও বেরুচ্ছিনে মা।'

'তাহলে? সে কি তোমায় না বলেই গেল?'

'না না।' মনোরমা হেসে বলল, 'বেলা তিনটের সময় দু-তিনটি ছেলে ওকে খুঁজতে এল। তাদের সঙ্গে বেরুল হিরু। আমাকে বলে গেল মা, আমি এখুনি ফিরে আসছি। তুমি তো সাড়ে চারটের সময় বেরুবে বলেছিল?'

'ছেলেকে তোমার বারণ করা উচিত ছিল। হুট্ করে অমনি বেরুবে কেন?'

মনোরমা কোন কথা বলল না। তার দুঃখ স্বামী বুঝবে না।

হিরু কি আর ছোটটি আছে? মাথায় মনোরমার চেয়ে আধ হাত বড়ো। ছোটবেলায় ছেলেকে ধমকধামক, চড়-চাপড় দিয়ে শাসন করেছে। কিন্তু এখন কি আর সেদিন? বড় জোর মুখে একবার বলতে পারে। কোনো ফল হবে বলে তার ভরসা হয় না।

কয়েক মুহূর্ত থেমে মনোরমা ফের বলল,—শোনো তোমাকে একটা কথা বলি। হিরু যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে গো।—

'কি আবার হয়ে যাচ্ছে?' বাণীব্রত ভ্রূ কোঁচকালেন।

'ঠিক বুঝতে পারি না। মনোরমাকে বেশ গম্ভীর চিন্তিত দেখাল। বলল—ছেলেটা কেমন চুপচাপ থাকে। মুখ দেখলে মনে হয়, ও যেন কি ভাবে। দিনের মধ্যে আমার কাছেই যা দু-একবার আসে, কথাটথা বলে। আগে বিন্তির সঙ্গে খুনসুটি করত। এখন কই তাও শুনি না।'

বাণীব্রত চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে বললেন,—হিরু বড় হচ্ছে। পিঠোপিঠি ভাইবোন হলেও কদিন আর মারামারি, খুনসুটি করবে?'

মনোরমা বাধা দিয়ে বলল,—না, না। ব্যাপারটা ঠিক তা নয় গো। আমি বলছি হিরু দিন দিন কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। ওর মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। আমি বেশ বুঝতে পারি।

স্ত্রীর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বাণীব্রতর চিন্তা হল, কি বলতে চায় মনোরমা? হিরুকে নিয়ে তার এত দুর্ভাবনা কেন? আর কদিন পরেই টেস্ট পরীক্ষা। এই তো উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নিজেকে তৈরি করার সময়।

'এখন তো আর স্কুল নেই। যতক্ষণ ঘরে থাকে, নিশ্চয় পড়াশুনো করে?'

মনোরমা চিন্তিত মুখে বলল, 'পড়াশুনো তো করে দেখি। বইপত্তর খুলে বসে থাকে। কিন্তু বিন্তি বলছিল হিরুর পড়ার টেবিলে কি সব অন্য বই-টই আছে।'

'কি বই? নভেল-টভেল পড়ে নাকি? কিন্তু পরীক্ষার সময় এসব কেন পড়ছে? তাহলে রেজাল্ট কেমন করে ভালো হবে?'

মনোরমা মাথা নেড়ে বলল,—'নভেল-টভেল নয়। বিন্তি জানে কি বই। তুমি একবার ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'বিন্তি কোথায়? তাকেও তো দেখছিনে—'

'আহা!' মনোরমা ঈষৎ হাসল, 'তুমিও যেন দিন দিন কেমন হচ্ছ। স্কুলের ছুটির পর বিন্তি ওর এক বন্ধুর বাড়িতে যায় না? সামনের মাসেই কি থিয়েটার করবে ওরা? ভালো নাচতে পারে এমনি একজন মেয়ে চাই। সেজন্যই বিন্তিকে ওদের দরকার। আমাকে এসে অনেক করে ধরল। তোমাকে তো তখন সব বলেছিলাম বাপু—

বাণীব্রত এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার মনে পড়েছে। সেই মিলি বলে মেয়েটি তোমার কাছে এসেছিল, তাই না? তার কোন দাদার বাড়িতে ফাংশন হবে।'

মনোরমা খুশি হয়ে বলল,—'যাতায়াতের কোন অসুবিধে নেই। ছুটির পর মিলির সঙ্গেই গাড়িতে চলে যায়। সন্ধ্যের মুখেই আবার গাড়িতে ক'রে ওরা পেঁৗছে দেয়। সেজন্যই আর আপত্তি করিনি।'

বাণীব্রত চুপ করে কি ভাবলেন। বললেন,—'তাতো বুঝলাম। কিন্তু ওরও তো সামনে পরীক্ষা। বিন্তি পড়াশুনোয় তেমন ভালো নয়। নাচ-গান নিয়ে মেতে থাকলে পরীক্ষায় যে ফেল করবে।'

'আহা! ফেল করবে কেন? তোমার যত সব অলক্ষুণে কথা। মেয়ে তো সকাল-সন্ধ্যে বই নিয়ে বসছে। ও ঠিক পাশ করে ক্লাসে উঠবে।'

'এ বছর পাশ করবে। কিন্তু ভবিষ্যত ভালো হবে না। মন এমন ছড়ানো থাকলে বইয়ের পাতায় কেমন করে চোখ বসবে?'

'কি যে বল, তুমি? মনোরমা মুখ ভার করে বলল, 'এই কাঁচা বয়সে একটু আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-গান করবে না? ইস্কুলের পড়া শেষ হলেই আমি ওর সম্বন্ধ দেখব। একটু ভালো ঘরে-বরে মেয়েকে দিতে হবে। আর তখন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কি অমনি হুট করে বেরুতে পারবে? না অমনি হৈ-চৈ, নাচ-গান তারা পছন্দ করবে।'

দরজায় খুট খুট করে শব্দ হল।

মনোরমা ব্যস্ত হয়ে বলল,—'ঐ বোধহয় হিরু এল। আমি যাই, খিলটা খুলে দিয়ে আসি।'

তার কথাই ঠিক। দরজা খুলতেই হিরু বাড়ির ভিতরে ঢুকল। বাণীব্রত তাকিয়ে দেখলেন ছেলের মুখখানা ঠিক গম্ভীর না হলেও কেমন অন্যমনস্ক। চোখের দিকে তাকালেই সন্দেহ হয়, তার মনের ভিতরে কোথায় যেন একটা গোপন কথা লুকিয়ে আছে। হিরু অতি সযত্নে এ বাড়ির আর সকলের কাছ থেকে সেই গোপনীয়তাটুকু রক্ষা করবার চেষ্টা করছে।

মনোরমা অভিমান করে বলল,—'হ্যাঁরে, এত দেরি করে ফিরলি। তোর বাবা কখন বাড়ি ফিরেছেন। আমি ভাবলাম তুই বুঝি সন্ধ্যের আগে ফিরবি না। শেষকালে উনুনে আঁচ দিতে যাব ভাবছিলাম।'

মায়ের কথা শুনে হিরু মুখ তুলে চাইল। ঈষৎ দুঃখিত হবার চেষ্টা করে বলল,—'সত্যি, আমার জন্যে তোমার দেরি হয়ে গেল মা। আমি মনে করলাম সাড়ে চারটের মধ্যেই পৌঁছুতে পারব। কিন্তু স্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তবু বাসে ওঠা গেল না। শেষে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।

বাণীব্রত গম্ভীর গলায় শুধোলেন,—'তুমি গিয়েছিলে কোথায়?'

'একটু কাজ ছিল বাবা,' হিরু পরিষ্কার উত্তর দিল।

বেলা তিনটের সময় তুমি বেরিয়েছ আর এখন পাঁচটা বাজে। এতক্ষণ কি রাজকার্য ক'রছিলে?'

হিরু শান্ত, অনুত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল,—'বন্ধুদের সঙ্গে একটু দরকার ছিল বাবা।'

'দরকারটা কি, তাই তো জানতে চাইছি।' বাণীব্রত বেশ রাগের সঙ্গে বললেন।

হিরু মাথা নীচু করে প্রায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল। একটি কথাও বলল না। শেষে মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে শুধোল,—'তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে না মা?'

'দেরি হচ্ছে বৈকি। মনোরমা ব্যস্তভাবে কথা কইল। স্বামীকে ইঙ্গিত করে ফের বলল,—'কই ওঠো, এখন না বেরুলে সন্ধ্যের মধ্যে কেনাকাটা সারা হবে কেমন করে?'

বাণীব্রত তবু বসে রইলেন। ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। শক্তগলায় শুধোলেন—'আমার কথার কিন্তু তুমি জবাব দাও নি হিরু।

'এখন থাক বাবা।' হিরু ধীরে ধীরে বলল, 'তোমরা কোথায় যাবে বলছিলে—'

'হিরু তো ঠিকই বলেছে। মনোরমা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, এখন কি ওই আগডুম বাগডুম জিজ্ঞাসা করার সময়? শীগ্‌গীর ওঠো দিকি। ওসব কথা পরে হবে।'

অগত্যা বাণীব্রতকে উঠতে হল। তাঁর স্বভাব এমনি। ছোটখাটো ব্যাপারে স্ত্রীর কথা মেনে নিয়েছেন। কখনও কলহ-বিবাদে যান নি। তবু আজ তাঁকে অন্যরকম মনে হল। মুখটা আমের আঁটির মত শক্ত স্থির। মনোরমা বুঝতে পারল স্বামীর মনের মাটিতে এখন ধূলি-তরঙ্গ, ঝড়ের দাপা-দাপি। বাড়ির বাইরে পা দিলে বাণীব্রত হয়ত ফের সহজভাবে কথা বলবেন।

যাবার সময় মনোরমা ফের বলল,—'তুই কিন্তু আর বাইরে যাস নি হিরু। এখুনি বিন্তি ফিরবে। তোর বড়দাও অফিস থেকে সোজা আসতে পারে।'

হিরু হেসে বলল,—তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। আমি কোথাও বেরুচ্ছিনে।

কাছেই একটা হকার্স কর্ণার। মনোরমা ওখান থেকেই জিনিসপত্র কেনে। সেন ব্রাদার্স, সাহা ষ্টোর্স, আরো কি সব দোকান। দু-একটা বেশ বড়। নানারকম ফ্যান্সী শাড়ি, টেরিলিন-টেরিকটনের জামা পর্যন্ত রাখে। ফুটপাত ধরে এই রাস্তাটুকু হেঁটেই যায় মনোরমা। ঘরের দরজা থেকে বেরিয়ে বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায় এই পথটুকু যেতে ভারী ভালো লাগে। যেন বন্দীজীবনের পর হঠাৎ মুক্তির আনন্দ। তবু ইদানীং কেমন একটা দুশ্চিন্তার ভাব। বুকের ভিতর ভয়ের শিহরণ। হাঁটতে গিয়ে হাতে-পায়ে আগের মত বল পায় না মনোরমা।

কেনাকাটা সারতে দেরি হল না। একটা দোকানেই সমস্ত জিনিস পাওয়া গেল। হিরুর পাজামার ছিট, বিন্তির শাড়ি, মায় কিরণের গেঞ্জি পর্যন্ত। মিলুই বা বাদ যাবে কেন? মনোরমা তার জন্য এক জোড়া মোজা

নিল। নাইলনের মোজা। দাম একটু বেশী পড়ল বটে। কিন্তু সুন্দর ডিজাইন। শুধু মনোরমার নয়, মিলুরও নিশ্চয় পছন্দ হবে।

ফেরার সময় আর হেঁটে এল না মনোরমা। কখন সন্ধ্যে নেমেছে। দোকানের বিজলি বাতির আলোয় বোঝা যায় নি। আর যা দিনকাল। একটা রিক্সা পেতেই স্বামী-স্ত্রী চটপট উঠে বসল। অমিয় বারিক লেনের কাছাকাছি আসতেই মনোরমা দেখল পিছন দিক থেকে একটা ঝকঝকে নতুন গাড়ি তাদের রিক্সাটিকে দ্রুত অতিক্রম করে গলির মুখে দাঁড়াল। চালকের আসনে ড্রাইভার নয়, একটি উনিশ-কুড়ি বছরের সুন্দর ছেলে। তার পাশে বিস্তি। গাড়ি থামার পরও দু-তিন মিনিট কেউ নামল না। মনে হল ভিতরে বসে তখনও ওরা কথাবার্তা বলছে। তারপর দরজা খুলে বিস্তি বেরিয়ে এল। গাড়ি ফের স্টার্ট নিলে সে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল। কিছুক্ষণ চুপচাপ অপস্‌য়মাণ গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বাড়ির দিকে এগোল।

ব্যাপারটা বাণীব্রতর চোখে পড়ে নি। অপাঙ্গে স্বামীর মুখের উপর নজর বুলিয়ে মনোরমা নিশ্চিন্ত হল। দেখতে পেলে বাণীব্রত নিশ্চয় পাঁচটা প্রশ্ন করতেন। কাদের গাড়ি? কার সঙ্গে এল বিস্তি? ওই ছেলেটি কে? রোজই কি ও বিস্তিকে পৌছে দিয়ে যায়? কি নাম ওর?

অবশ্য মনোরমারও খুব কৌতূহল হচ্ছিল। ছেলেটি মিলির কে হয়? ওর কথা তো কোনোদিন বলেনি বিস্তি? গাড়িটা নিশ্চয় ওদের। বাড়ি ফিরে মেয়েকে সব কথা জিজ্ঞেস করতে হবে।

কিন্তু ঘরে রীতিমত হৈ-চৈ। মিলন, কিরণ দুজনেই ফিরেছে। হিরু পড়ার ঘরে। বিস্তি মেঝের উপর পা ছড়িয়ে বসে দাদাদের সঙ্গে অনর্গল বকবক করছে। দোকান থেকে কিনে আনা জিনিসপত্র কটা নামিয়ে দিতেই তিন ভাইবোনে তাই নিয়ে মেতে উঠল, হিরু আসেনি, আসতে চায় নি। কিন্তু মনোরমা তাকে জোর করে ধরে আনল, হট্টগোলে মেয়েকে সেই কথাগুলো শুধোবার সে মোটে ফুর্সৎই পেল না।

অনেক রাত্তিরে কথাটা আবার তার মনে হল। বিস্তি পাশেই শুয়ে। মেয়েটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোচ্ছে। মনোরমা মেঝে থেকে উঠে স্বামীর খাটে বসল। বাণীব্রত একটা সুতির চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন।

মনোরমা স্বামীর বুকে, কপালে হাত বুলোচ্ছিল। স্ত্রীর কোমল করস্পর্শে তাঁর ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে বাণীব্রত শুধোলেন, 'তুমি ঘুমোও নি?'

'না', মনোরমা নরম গলায় কথা কইল। তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি।'

'কি কথা বলবে?'

'আচ্ছা, চন্দনপুরে যাওয়ার আগে বিন্তির একটা বিয়ে দিয়ে যেতে পারনা?'

'বিন্তির বিয়ে?' বাণীব্রত যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'তুমি ক্ষেপেছ! ওর কত বয়স?'

'বয়স এমন কিছু কম নয়। পনের পেরিয়ে ষোলয় পড়েছে। বাড়ন্ত গড়ন বলে একটু বেশীই লাগে।'

'তা হোক। এখন ওর বিয়ে দেব না। আগে ইস্কুলের গণ্ডীটা পার হতে দাও। কলেজে পড়বার সময় ওর সম্বন্ধ খুঁজব। ততদিনে মিলন, কিরণ দুজনেই ভালো রোজগারপাতি করবে। বোনের বিয়েতে ওরা সাহায্য করবে আমাকে!'—

তবু মনোরমা আর একবার চেষ্টা করল, 'আমার কথা শোন। পার তো কলকাতায় একটি ভালো সম্বন্ধ দেখে বিন্তির বিয়ে দাও। ও মেয়ে কলকাতা ছেড়ে একটি দিনও থাকতে পারবে না।' একটু থেমে সে ফের বলল,— 'জানো, মিলু আমাকে একটি ছেলের কথা বলছিল। সে ওর বন্ধু। এক সঙ্গে নাকি স্কুলে পড়ত। এখন দেড় হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। আচ্ছা ওর সঙ্গে বিন্তির সম্বন্ধ দেখলে হয় না?

বাণীব্রত ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে বললেন,—'তুমি স্বপ্ন দেখছ নাকি? ওসব বড় ঘরে আমরা কখনও মেয়ে দিতে পারি? রাত অনেক হয়েছে, —যাও ঘুমোও গে।'

প্রত্যাখ্যাত হয়ে মনোরমা ফের মেঝেতে এসে শুল। মেয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তার মায়া হল। ঘুমোলে কি সুন্দর দেখায় বিন্তিকে। একটু ভাল ঘরে-বরে না দিতে পারলে মেয়েটা সুখী হবে না। সারাজীবন মনের দুঃখে জ্বলবে।

বিন্তি অবশ্য ঘুমোয় নি। সে জেগে ছিল। মা-বাবার কথাবার্তা কানে যেতেই তার ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু সে চোখ খোলেনি। এতক্ষণ কান খাড়া করে প্রত্যেকটি কথা শুনেছে।

মা শুয়ে পড়তেই বিন্তি অন্ধকারে মুচকি হাসল। যাকে তাকে বিয়ে করতে তার বয়ে গেছে। বাবা তো ঠিকই বলেছেন। এখন কি বিয়ের পিঁড়িতে বসবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে?

বিয়ের কথা মনে হতেই বিন্তির মনের পর্দায় একটি মুখ ভেসে উঠল। উনিশ বছরের একটি ছেলের মুখ,—সে রতীশ। কাল টিফিনের ঘণ্টায় স্কুল ছুটি। আবার রিহার্সালও হবে না, মাকে অবশ্য সে কথা বলেনি। তার কারণ আছে। কাল রতীশ তার জন্য অপেক্ষা করবে। স্কুল থেকে একটু দূরে মোড়ের কাছে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। মিলি চলে গেলেই বিন্তি সেখানে হাজির হবে। ম্যাটিনি শোতে চৌরঙ্গী পাড়ায় একটা ছবি দেখবে তারা। বিন্তি কখনও ইংরেজী সিনেমা দেখেনি। কিন্তু রতীশ বলছে বইটা অপূর্ব,—সুন্দর রঙীন ছবি। কি যেন নাম,—'ব্লো হট্, ব্লো কোল্ড।

## ॥ ছয় ॥

হাসপাতালের গেট পেরোলেই রাস্তা। খানিকটা এগিয়ে গেলে ট্রামের লাইন। বাঁ দিকে গেটের চওড়া থামটার উপর গা এলিয়ে একটা বোগেনভিলিয়ার ঝাড় দিব্যি তরতর করে খানিকটা উঠে ডালপালা মেলেছে। থোকা থোকা লাল ফুলে কি বিচিত্র সেজেছে গাছখানা, ঠিক যেন অলঙ্কার-পরা একটি সুন্দরী মেয়ে। বোগেনভিলিয়া গাছটাকে এখন রীতিমত রূপবতী মনে হচ্ছে।

গেট পেরিয়ে কিরণ আর বেশী এগোল না। একটু আগে থেকেই সে ধীরে ধীরে পা ফেলছিল। হাসপাতালের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে ট্রাম লাইনটার কাছে এসে শ্লথগতি গাড়ির মত ক্রমে নিশ্চল হল।

রাস্তার ওপারে খানিক দূরে একটা সিনেমা হল। বিশ ত্রিশ গজের বেশী হবে না। বাড়িটার প্রায় মাথায় বসানো একটা সাইনবোর্ডের উপর হালফিল এক নায়িকা অভিনেত্রীর চেনা মুখ। কিরণের চোখ তুটো প্রথমে সেখানেই স্থির হল, কিন্তু অল্প তু-এক সেকেণ্ডের জন্য। ফের চোখ নামিয়ে খুব ব্যগ্রতার সঙ্গে সিনেমা হলটার সামনে এবং ধারেপাশে কাউকে খুঁজতে লাগল।

বেলা বারোটায় রীতাবরীর আসবার কথা। এই সিনেমা হলটার সামনে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করবে। শুধু আজ নয়, আরো কতদিন রীতাবরী এখানে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালের গেট পেরোবার আগেই কিরণ ওকে দেখতে পেয়েছে। দূর থেকে রীতাবরীকে চিনতে তার একটুও সন্দেহ হয়নি।

হাতের কবজি উল্টিয়ে কিরণ একবার হাতঘড়ি দেখল। বেলা অনেক, প্রায় সওয়া বারোটা বাজে। জ্বরো রুগীর মুখে থার্মোমিটার গুঁজে দিলে পারা যেমন তীরের মত ঠেলে উপরে ওঠে, বেলা ঠিক তেমনি চড়চড়িয়ে বেড়েছে।

সূর্য মাথার উপরে। দেহের ছায়া হ্রস্ব,—পোষা জানোয়ারের মত পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে; সামান্য হলেও কার্তিকের রোদের ঝাঁঝ আছে। জষ্ঠিমাসের কাঠফাটা রোদ্দুর নয় ঠিক, কিন্তু তাই বলে পৌষ মাঘের মতো নরম মোলায়েম নয়। রোদে পিঠ দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই গা তেতে ওঠে। কপালে চিবুকের কাছে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে অসোয়াস্তি লাগে।

মুখ তুলে আরো কয়েকবার কিরণ এ-পাশে ও-পাশে তাকিয়ে হতাশ হ'ল। না, সিনেমা হলের সামনে কিম্বা আশে-পাশে কোনো মেয়ে দাঁড়িয়ে নেই। অথচ বেলা বারোটার সময় রীতাবরীর আসার কথা। তবে কি কিরণকে দেখতে না পেয়ে সে চলে গেছে? অথবা ওর ট্রেন লেট। গাড়ির গণ্ডগোল তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। হামেশাই লেগে আছে।

কিন্তু কিরণ কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? খিদেয় তার পেট চুঁই চুঁই করছে। সওয়া বারোটা বাজে। বাড়ি পৌছতে নির্ঘাত একটা হবে। কোন সকালে চা, টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে ডিউটিতে বেরিয়েছে কিরণ।

তখন সাড়ে সাতটার মত হবে। তারপর এই চার-পাঁচ ঘণ্টায় দু-তিন কাপ চা আর কয়েকটা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া কিছুই তার পেটে যায় নি।

আউটডোরে বানের জলের মত রুগী। সামাল দিতে হাউস-স্টাফরা হিমসিম খায়। অসুখের খুঁটিনাটি শোনার সময় কোথায়? সেই হাঁ দেখে হাওড়ার লোক চেনার অবস্থা। কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে চিকিৎসা করার চেষ্টা। নিয়মমাফিক পরীক্ষা করে ওষুধপত্তর দিতে হলে এমন পাঁচটা হাসপাতালের দরকার। তা ভিন্ন এত রুগীর ঠিক ঠিক বিলিব্যবস্থা কেমন করে হবে?

তবু হাসপাতাল থেকে কিরণ আজ তাড়াতাড়ি বেরিয়েছে। নইলে বেলা একটার আগে কবে সে ছাড়া পায়? বেশী ভিড় থাকলে আরো দেরি। হাসপাতালের আউটডোরে পঙ্গপালের মত শ-য়ে শ-য়ে রুগী আসছে। আজ বারোটা পর্যন্ত সকলকে পরীক্ষা করে আসা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। অল্প কিছু রুগী রয়ে গেল। নেহাৎ রীতাবরী এসে সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাই ওদের টিকিটগুলো বন্ধু অম্বরীষকে গছিয়ে হাতমুখ ধুয়ে সে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এসেছে।

কিরণ ভাবছিল চট করে একবার স্টেশনে যাবে কিনা। গাড়ির গণ্ডগোল থাকলে এখনি জানা যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি ট্রেন এসে থাকে আর রীতাবরী যদি স্টেশন থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসে, রাস্তায় যা মোটর-গাড়ি আর রিকশর ভিড়। তেমনি জনস্রোত। মুখোমুখি দেখা হবেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

কাঁধের উপর কার হাত পড়তেই কিরণের চিন্তা ছিন্ন হল। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল পরিতোষ পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। তারই মত হাউস-স্টাফ পরিতোষ পাল। তবে কিরণ আছে মেডিসিনে আর পরিতোষ গাইনিকোলজী অ্যাণ্ড অবস্টেট্রিকস্ ডিপার্টমেন্টকেই বেছে নিয়েছে।

মুচকি হেসে পরিতোষ শুধোল,—'কিরে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রঙ দেখছিস নাকি?'

রঙ অর্থাৎ মেয়ে। কথাটা পরিতোষের আবিষ্কার,—নিজস্ব কোডও বলা চলে। পরিতোষ বলে,—'মেয়েরাই তো আসল রঙ বাবা। মনের

আকাশে ওরাই তো রঙ ছড়ায়। তাছাড়া মেয়ে মানেই একটি রঙবাহার শাড়ি। সুতরাং ওরা রঙ ছাড়া আর কি বল?'

কিরণ চোখ নাচিয়ে একটা তেরছা ভঙ্গি করে মৃদু হাসল। বলল,—'বেশ মুডে আছিস মনে হচ্ছে। চার ঘণ্টা একনাগাড়ে রুগী দেখার পর এত রস কিসের?'

পরিতোষ দু-তিন সেকেণ্ড ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ফের শুধোল,—'ব্যাপার কি তাহলে? রাস্তার ধারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

—'একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। বেলা বারোটায় আসবার কথা। কিন্তু এখনও দেখা পাচ্ছি নে।'

—'কার জন্যে এমন হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছিস? একটু খুলে বল না বাবা।' পরিতোষ জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল।

কিরণ আড়চোখে বন্ধুর মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিল। পরিতোষকে সে ভালোভাবে চেনে। ভীষণ কৌতূহল ওর। ঠিক মেয়েদের মত স্বভাব। একটু রহস্যের গন্ধ পেলেই হল, ব্যস, পরিতোষকে আর দেখতে হবে না। গ্রীষ্মদিনের কাটা ফলের গায়ে উড়ে বেড়ানো ভন্‌ভনে নীল মাছির মত সে আর সরতেই চাইবে না।

রাস্তার উপর দৃষ্টি মেলে কিরণ আর একবার বহুদূর পর্যন্ত দেখে নিল। পরিতোষের দিকে মুখ না তুলেই সে বলল,—'একটু দাঁড়া না, কার জন্যে অপেক্ষা করছি চোখেই দেখতে পাবি।'

—'আমার সময় নেই রে,—ভেরি বিজি।' পরিতোষ একটু হেলেদুলে ফের সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল,—'তাছাড়া কখন সে আসবে তারও তো ঠিক নেই। কতক্ষণ থাকব বল?'

কিরণ এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বন্ধুর মুখোমুখি হল। বলল,—'তাড়া কিসের? কোথাও যাবি নাকি?'

—'হ্যাঁ। ভবানীপুরে যেতে হবে একবার—'

—'ভবানীপুরে?' কিরণ ভুরু কোঁচকাল। 'এখনই যাবি? কি দরকার সেখানে?'

—'উহুঁ, এখন নয়। খাওয়া দাওয়া সেরে একটু রেস্ট নিয়ে বেলা আড়াইটে নাগাদ বেরবো। ফিরতে দেরি হবে। ডক্টর তালুকদার একটা অপারেশন কেসে অ্যাসিস্ট করবার জন্য ডেকেছেন,' পরিতোষ বেশ আস্থার সঙ্গে কথা কইল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কিরণ মজা অনুভব করল। এসব কথা পরিতোষ একটু রেখে ঢেকে বলতে ভালবাসে। অবশ্য বেশীক্ষণ নয়। আলতো খোঁচা দিলেই তার মনের ভাব গলগল করে বেরিয়ে আসে। কিরণ তাই ইচ্ছে করেই প্রথমে একটু সংযত হল। আর ব্যাপারটা কি সে আঁচ করতে পারছে না? বড় বড় ডাক্তারদের পিছু পিছু ঘোরা পরিতোষের স্বভাব। উদ্দেশ্য একটাই। হাসপাতালের বাইরে, কোনো প্রাইভেট কেসে তাকে যদি অ্যাসিস্ট করবার জন্য ডাকা হয়, তাতে জ্ঞান আর অর্থ দুইই লাভ। তাছাড়া পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। রুগীর বৃত্তটা ধীরে ধীরে বাড়ে।

মুচকি হেসে কিরণ শুধোল,—'অপারেশন কোথায় হবে?'

—'মৃণালিনী নার্সিং হোমে। একটা সিজারিয়ান কেস। কাল রাত্তিরে নাকি পেশেন্ট এসেছে। এখনও ডেলিভারী হয়নি। নার্সিং হোমের ব্যাপার বুঝিস তো,—কে ঝামেলা পোহায়। পেট কেটে ছেলে বের করে দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল। তাছাড়া সিজারিয়ান হলে নার্সিং হোমের ডাক্তার নার্স সকলেরই পকেট ভারী হয়।'

কিরণ আগের মতই হেসে বলল,—'তোরও আজ পকেট ভারী হবে। একশ' টাকা নির্ঘাত পাবি।'

—'পাগল নাকি? অত টাকা কে দিচ্ছে? ডক্টর তালুকদারকে চিনিস না তো, ব্যাটা হাড় কঞ্জুষ,—বড় জোর গোটা পঞ্চাশ টাকা দেবে। তার বেশী নয়।' একটু থেমে সে গলার স্বরটা ঈষৎ খাটো করে বলল,—'আসলে নার্সিং হোমটা তো ওরই সম্পত্তি।'

মৃণালিনী নার্সিং হোমটা ডকটর তালুকদারের, এমন কথা কাগজে কলমে নিশ্চয় নেই। কিন্তু লোকে তাই বলে। ডাক্তার-নার্স, মেডিক্যাল স্টুডেন্ট অনেকের মুখেই শুনেছে কিরণ। নার্সিং হোমটা ডক্টর তালুকদারের বেনামী কারবার। কিন্তু তাই নিয়ে কোনোদিন সে মাথা ঘামায় নি।

বন্ধুর মুখের উপর চোখ রেখে কিরণ বলল,—'পঞ্চাশ আর একশ, যাই হোক, তবু তো তুই কিছু কামাচ্ছিস। আমার বরাতে অ্যালাউন্সের টাকা ক'টাই জোটে। কিন্তু এতে কারো চলে, তুই বল —'

পরিতোষ বিজ্ঞের মতো জবাব দিল,—'তুই যেমন গিয়েছিস মেডিসিনে, বুক দেখে আর নাড়ি টিপে টাকা রোজগার করতে গেলে সময় লাগে,— তাড়াতাড়ি হয় না। টাকা যদি কামাতে চাস, তাহলে সার্জারি না হলে আমার মতো মিড-গাইনিতে আসতে হবে। তাছাড়া সাধারণ অসুখে, জ্বরে-জাড়িতে কে ডাক্তারের চেম্বারে আসছে বল? নিজেরাই সব দোকান থেকে ট্যাবলেট কিনে রোগ সারাচ্ছে।'

—'তা যা বলেছিস।' কিরণ সায় দিল।

পরিতোষ বলল,—'আরে আমি তো অনেকদিন থেকে বড় ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখছি। শ্রেফ টাকা রোজগার করব বলে।'

—'তাই নাকি? তুই ছোটবেলা থেকেই ডাক্তার হবার কথা ভাবতিস?'

পরিতোষ ঘাড় হেলিয়ে প্রশ্নটা স্বীকার করে নিল। খুব উৎসাহের সঙ্গে চোখ বড় করে শুরু করল,—'একটা মজার ঘটনা বলি শোন্। আমি তখন স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ি। ইংরেজী লেটার-রাইটিং এর পিরিয়ড, স্যার এসে বললেন'—'ভবিষ্যতে কি হতে চাও, তাই জানিয়ে বন্ধুকে একটা চিঠি লেখ দিকি। আমি বেশ সুন্দর করে লিখলাম, ভবিষ্যতে আমি ডাক্তার হতে চাই। খুব বড় ডাক্তার। কলকাতায় আমার চেম্বার হবে। ষোল টাকা ভিজিট। আমার একটা বড় গাড়ি থাকবে। সেই গাড়িতে করে আমি সকাল-বিকেল আসব যাব। রুগী দেখবার জন্যে কলে বেরুবো। শেষকালে লিখলাম, অনেক—অনেক টাকা রোজগার করব বলেই আমি ডাক্তার হতে চাই।'

কিরণের বেশ মজা লাগছিল। সে বলল,—'গ্র্যাণ্ড লিখেছিলি চিঠিখানা। তোর স্যর নিশ্চয় খুব ভালো বললেন।'

'আহ্, আগে সবটা শোন না।' পরিতোষ ওকে থামিয়ে দিল। বলল, —'খাতাটা পড়ে স্যর আমাকে কাছে ডাকলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন, —'কি লিখেছ এসব? এখন থেকেই তুমি অনেক টাকা রোজগারের কথা

ভাব বুঝি? ক্লাস শুদ্ধ ছেলে তাই শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। আর অপমানে, লজ্জায়, চোখ মুখ লাল করে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। লেখাটা কেটে দিয়ে সার বললেন 'যত সব পাগলামি। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা ভালো নয় পরিতোষ। আমার প্রায় কান্না পাচ্ছিল, কি জবাব দেব স্যরকে? বাবা সরকারী অফিসের লোয়ার ডিভিসন কেরানী —ছা-পোষা মানুষ। ছেঁড়া কাঁথার উপমাটা স্যার বোধহয় মিথ্যে বলেন নি।

—'তারপর?'

—'তারপর আবার কি? আমি কেন ডাক্তার হতে চাই, তাই উনি লিখে দিলেন। আমাদের গরীব দেশে মানুষের অন্ন-বস্ত্রই জোটে না। চিকিৎসা তো দূরের কথা। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে। সেখানে রোগে, বিনা চিকিৎসায় কত লোক মারা যাচ্ছে। এই নিরন্ন, দুঃখীদের জন্য কিছু করাই আমার ব্রত। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে এদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলেই আমি ধন্য হবো।' এক মুহূর্ত থেমে পরিতোষ বলল, —'সে বছর ক্লাসের পরীক্ষায় এই প্রশ্নটাই এলো। আর আমি স্যরের কথাগুলো হুবহু মুখস্থ লিখে অনেক নম্বর পেলাম।—

কিরণ হাসতে হাসতে বলল,—'বেশ অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স তো। অবশ্য এই রকমই হয় রে। পরীক্ষার খাতায় আমরা যে কলমে লিখি, জীবনের পাতায় তার আঁচড়টিও পড়ে না। জীবন ভিন্ন,—তার অন্য রঙ। অন্য দৃষ্টি। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ ডক্টর তালুকদারও নিশ্চয় তোর দলে। উনিও পরীক্ষায় তোর মত দীন দরিদ্র গ্রামবাসীর সেবার কথা লিখে প্রচুর নম্বর পেয়েছেন। তারপর বিলিতী ডিগ্রীওলা বড় ডাক্তার হয়ে বেনামে মৃণালিনী নার্সিং হোম খুলে বসেছেন।'

—'দেখবি ওর চেয়েও বড় নার্সিং হোম করব আমি।' পরিতোষ প্রায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মত বলল। 'একবার বিলেত থেকে ঘুরে আসি আগে।'

—'নিশ্চয়। আই উইস ইউ সাকসেস।' কিরণ ওর পিঠ চাপড়ে উল্লাসে ফের বলল,—'নে একটা সিগারেট ছাড় দিকি।'

পরিতোষের পকেটেও সিগারেট নেই। হাসপাতালের গেটের পাশের

দোকানটা বন্ধ। রাস্তার ওপারে ফুটপাতের গায়ে একটা দোকান খোলা দেখে সে বলল,—'চল্ ওখান থেকেই একটা প্যাকেট নিই।'

ওষুধের কটু গন্ধের মত ঝাঁঝালো দুপুর হলে কি হবে, রাস্তায় লোকজনের কিছু কমতি নেই। তেমনি বাস-ট্রাম, ঠ্যালা আর রিকশাগাড়ির প্রতিযোগিতা। শিয়ালদহর অবশ্য এমনি চেহারা। শুধু খুব সকালের দিকে ঘণ্টা দেড়-দুই নিরাভরণ বিধবার মত ঈষৎ ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তারপর থেকেই অবিরাম জন স্রোত। বেলা নটা বাজলেই অসংখ্য মানুষ ঠিক পিঁপড়ের পালের মত পিল পিল করে কোথা থেকে বেরিয়ে আসছে। রাত নটা দশটা অব্দি এমনি ভিড়।

সিগারেট ধরিয়ে কিরণ ভাবল, এবার বাড়ি ফিরবে। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না। রীতাবরী নিশ্চয় আজ এল না। মনের ভিতর ট্রেন মিস করার মতো একটা অস্পষ্ট ব্যথা। বাড়িতে মা তার জন্য ভাত আগলে বসে আছে। খানিকটা হেঁটে মোড়ের কাছে সে বাসে উঠবে ভাবল।

হঠাৎ বাঁ দিকে তাকাতেই কিরণের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আশ্চর্য! রীতাবরী এল কখন? পরনে সবুজ শাড়ি আর সবুজ রঙের জামা। জলের মাছের মত স্বাস্থ্য মেয়েটার। এই মুহূর্তে ঠিক একটা সবুজ বনটিয়ার মত লাগছে ওকে। যেন কোথা থেকে উড়ে এসেছে। কিরণ কাছে না গেলেই আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাবে।

গ্রীবা বাড়িয়ে রীতাবরী হাসপাতালের গেটটার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত চাউনি। কিরণকে দেখতে না পেয়ে সে খুব ব্যস্ত এবং কিছুটা হতাশ হয়ে উঠেছে মনে হ'ল।

ইঙ্গিতে রীতাবরীকে দেখাল কিরণ। পরিতোষ এক নজর তাকিয়ে বলল,—'তোর গার্ল ফ্রেণ্ড বুঝি? কি নাম ওর?'

—'রীতাবরী।'

—'বেশ নাম।' পরিতোষ তারিফ করে বলল।

—'চল, আলাপ করিয়ে দিই তোর সঙ্গে।' কিরণ প্রস্তাব করল।

'পাগল নাকি? এখন সময় কোথায়? পরে একদিন হবে।' ঈষৎ

হেসে পরিতোষ ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইল। যাবার আগে গলা খাটো করে সে ফের বলল,—'শুধু নাম কেন, তোর গার্ল ফ্রেণ্ডের চেহারাও চমৎকার। কিন্তু মেয়ের বাবা কি করেন বললি না তো? বিয়ের পর তোকে বিলেত পাঠাবেন নাকি?'

কিরণ চুপ করে রইল। এ কথার কি উত্তর দেবে সে? পরিতোষ এমনই,—'ভীষণ ক্যারিয়রিস্ট। তারা সকলে অবশ্য অল্পবিস্তর তাই। নিজের ভালো, ভবিষ্যতে উন্নতি কে না চায়? কিন্তু তবু পরিতোষ যেন বড্ড বেশী সিরিয়স। ক্যারিয়র ছাড়া জীবনে কিছুই বোঝে না। ওর প্রতিটি পদক্ষেপ অঙ্ক কষে মাপা। যে কোনো কাজের মধ্যে পরিতোষ উন্নতির সিঁড়ি খোঁজে। চট করে খুঁজে না পেলে নিজের মন থেকেই সে একটা উদ্দেশ্যের ছবি গড়ে নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরিতোষ সব কিছু বিচার করে। তার বেলাতেও ব্যতিক্রম হয় নি।

তাকে দেখে রীতাবরী সলজ্জ হেসে বলল,—'ওমা! তুমি কোন দিক থেকে এলে? আমি গেটের মুখে বারবার তাকাচ্ছি।'

—'তাকালে কি হবে? তুমি তো এইমাত্তর এসে দাঁড়ালে।' কিরণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথা কইল।

'আহা! রাগ করছ কেন?' রীতাবরী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটি মেয়েলি কটাক্ষ করল। বলল,—'শুধু তোমার জন্যে এসেছি মশায়। নইলে মা খুব বারণ করছিল। বলছিল,—'আজ কি তোর না গেলেই নয়?'

কিরণ বলল,—'আমি আধঘণ্টার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, খালি ভাবছি, তুমি বুঝি এইবার এলে। আর একটু পরে চলেই যেতাম।' সে ইচ্ছে করে পরিতোষের বৃত্তান্তটা চেপে গেল।

—'সত্যি! তোমার যত দুর্ভোগ।' রীতাবরী সমবেদনার সুরে বলল, 'কোন সকালে খেয়ে দেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ। হাসপাতালের খাটা-খাটুনির পর রাস্তার মধ্যে এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে কারো ভালো লাগে?'

কিরণ নরম গলায় শুধোল,—'তোমার কেন দেরি হল বল তো? ট্রেন লেট না অন্য কিছু?'

—'ট্রেন সামান্য লেট। কিন্তু অন্য ব্যাপারও আছে।' রীতাবরী হাঁসের মত ঘাড় বেঁকিয়ে হাসল। বলল,—'আমাদের ওদিকে আজ বন্ধ ডেকেছে। দোকানপাট সব তালা আঁটা। রাস্তায় বাস রিকসাগাড়ি কিছুই চলছে না।'

—'তাহলে এলে কেমন করে? তোমাদের বাড়ি থেকে স্টেশন তো অনেকটা দূর—'

—'কেমন করে আবার?' রীতাবরী ভুরু নাচিয়ে রহস্য করল। বলল, —'হেঁটে স্টেশনে এলাম। তাই তো দেরি। নইলে হয়তো আগের ট্রেনটা পেয়ে যেতাম।

—'কি ফ্যাসাদ! তোমার কপালেও দুর্ভোগ দেখছি?' কিরণ ম্লান হাসল। ফের শুধোল,—'কিন্তু তোমাদের ওদিকে বন্‌ধ্ কেন? আজকের কাগজে কই দেখলাম না?'

—'আহা! কাগজে আর কত খবর ছাপবে?' রীতাবরী বিরক্তমুখে বলল,—'কিসের বন্‌ধ্? কেন বন্‌ধ, তাই নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে বল? কাল রাত্তিরেও আমরা ব্যাপারটা জানতাম না। আজ সকালে বাজার করতে বেরিয়ে দাদা প্রথম খবর পেয়েছে।'

—'নিশ্চয় কিছু ঘটেছে। নইলে বন্‌ধ্ ডাকবে কেন?' কিরণ ভুরু কুঁচকে কথা কইল। 'তোমাদের ওদিকে তো কদিন ধরেই খুব গণ্ডগোল, মারামারি চলছিল, তাই না?'

—'ও বাবা! সে আবার বলতে।' রীতাবরী বিস্ময়ে চোখ দুটি বড় করে তাকাল। 'আমাদের ওদিকের যা অবস্থা। গণ্ডগোলের কোনো কালাকাল, সময়-অসময় নেই। সকাল-সন্ধ্যে, রাত্তির-দুপুর যে কোনো মুহূর্তে মারামারি লেগে গেলেই হল। অমনি দুম দুম বোমা ফাটবে। হৈ-হৈ চিৎকার। মাঝে মাঝে গুলির শব্দও মনে হয়। একদিন কি হয়েছে জানো? সন্ধ্যের মুখে বাজার থেকে ফিরছি। হঠাৎ আমার সামনে গজ দশ-পনের দূরে একটা বোমা বিকট শব্দে ফাটল। বললে বিশ্বাস হবে না দোকান-পাটগুলো নিমেষে চটপট বন্ধ হয়ে গেল। আমি কোনোমতে প্রায় দৌড়ে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম।

—'ইস্। কি সাংঘাতিক কাণ্ড। একটা ছুটো স্প্লিণ্টার ছুটে এসে তোমার গায়ে লাগতে পারত।'

—'কিছু অসম্ভব নয়। রীতাবরী ঘাড় ছুলিয়ে জবাব দিল। 'পথেঘাটে এমন ঘটনা কি আর হচ্ছে না? আমরা কতটুকু খোঁজ রাখি বলো?'

ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ট্রাম ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। ঢং ঢং শব্দ। সামনে জ্যাম্—বৌবাজারের মুখে অনেক গাড়ি। ট্রামটা তাই দাঁড়িয়ে পড়ল। লাইনের উপর উজ্জ্বল রোদ্দুরে,—এখানে ওখানে কেমন চকচকে দেখাচ্ছে।

নিশ্চল গাড়িটার দিকে চোখ পড়তেই রীতাবরী হঠাৎ হাতঘড়ির উপর ঝুঁকল। 'এই যাঃ। আর মোটে দশ মিনিট দেরি। এই ট্রামটাতেই তাহলে উঠে পড়ি, কি বল? সে সম্মতি পাবার আশায় কিরণের মুখের দিকে তাকাল।

—'এখুনি যাবে?' কিরণের কণ্ঠে হতাশার সুর বাজল। সে বললে, 'এইমাত্র তো এলে, এখনও পনের মিনিট হয়নি।'

—'কি করব বলো?' রীতাবরী ওকে বোঝাতে চাইল। 'একটার সময় মিঃ চ্যাটার্জির ক্লাস। ভারী সুন্দর পড়ান ভদ্রলোক। এতদূর যখন এসেছি, তখন ওঁর ক্লাসটা আর মিস করতে চাই না।'

—'বেশ তাহলে চল', কিরণ অনিচ্ছুক বালকের মত রাজি হল। ছুঃখ করে সে বলল,—'দূর। এমন করে আর ভাল লাগে না। পনের মিনিট কি আধঘণ্টার জন্য দেখা। অমন করে না এলেই পার।'

—'আহা রাগ করছ কেন?' রীতাবরী মুখ ফিরিয়ে হাসল। সামনের রবিবার আবার আসছি। সমস্ত ছুপুর তোমার সঙ্গে ঘুরব। তাহলেই হবে তো?'

—'রবিবার তো তোমার ক্লাস নেই।' কিরণ সন্দেহের চোখে তাকাল। 'ক্লাস না থাকলে তোমাকে কলকাতায় আসতে দেবে? মানে তুমি বেরোতে পারবে কি?'

—'পারব, পারব। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।' রীতাবরীর গলায় প্রত্যয় বেজে উঠল। ঠোঁট টিপে হেসে সে বলল,—'বেশ মানুষ তুমি। ক্লাস

নাই বা রইল। কিন্তু রবিবার কি লাইব্রেরী খোলা নেই? আমি তো সেখানে আসতে পারি।'

—'নিশ্চয় পার।' কিরণ মনে মনে ওর বুদ্ধির তারিফ করল। মুখে বলল,—'কিন্তু আমি কোথায় থাকব? এইখানে, না কলেজ স্ট্রীটে ইউনিভার্সিটির সামনে?'

—'উহুঁ! রীতাবরী সজোরে মাথা নাড়ল। 'কলেজ স্ট্রীটে কে যাচ্ছে? তুমি প্ল্যাটফর্মে বইয়ের স্টলটার সামনে থেকো। আমরা শেয়ালদ থেকেই এসপ্ল্যানেডের ট্রামে উঠব। তারপর গংগার ধারে কিম্বা—

বাকিটুকু কোনো রহস্য কাহিনীর পরবর্তী পরিচ্ছেদের মত সে ইচ্ছে করেই উহ্য রাখল।

## ॥ সাত ॥

আমহার্স্ট স্ট্রীটের স্টপে ট্রাম ছাড়ল কিরণ। রীতাবরী আরো এগিয়ে কলেজ স্ট্রীটে নামবে। এদিকটায় তেমন ভিড় নেই। শেয়ালদর মত গম গম করে না। আকাশ ফাঁকা,—নীল, সর্বত্র নীল, শুধু কার্তিকের রোদের জমজমাট আসর। ঘড়িতে ঠিক একটা বাজল। অমিয় বারিক লেনটা এখান থেকে কাছেই,—তেমন দূরে নয়। হাঁটলে বড় জোর দশ মিনিট লাগে। তবু দুপুরে কিরণের পা উঠছিল না। সে বাসের আশায় উটের মত মুখ উঁচু করে রাস্তার দিকে তাকাল। পথে আরো যানবাহন,—ট্যাকসি, রিকশ, লরীও যাচ্ছে। কিন্তু বাস কোথায়? এ লাইনে এমনিতেই বাস কম। দুপুরে আরো দুরবস্থা, বাসের জন্য দাঁড়ালে আধ ঘণ্টা কিম্বা চল্লিশ মিনিটও লাগতে পারে। বেগতিক বুঝে কিরণ অনিচ্ছুক পা দুটোকে টেনে বাড়ির দিকে চলল।

হাঁটতে হাঁটতে সে রীতাবরীর কথা ভাবছিল। চিন্তা করলেও আশ্চর্য লাগে। কেমন করে সে ওর প্রেমে পড়ল। অথচ মাস ছয়েক আগেও

কিরণ ওকে চিনত না। এই তো জুন মাসে ওর সঙ্গে পরিচয়, সেও একটা অদ্ভুত, বিচিত্র যোগাযোগ। এমন সব ঘটনা বুঝি কলকাতাতেই সম্ভব।

সেদিন দুপুর থেকেই আকাশ মেঘলা। বেলা তিনটে নাগাদ হুড়মুড় করে জল নামল। অবশ্য খানিক পরেই ঝমঝমে বৃষ্টি কমল, কিন্তু জল থামল না। ততক্ষণে রাস্তার গর্তে—ফাটলে, নীচু জায়গায় জল বেশ জমেছে। পথে প্যাচপেচে কাদা। পা বাড়ানো এক নরকযন্ত্রণা।

কলেজ স্ট্রীটে এসে আচমকা কিরণ ফেঁসে গেল। এত জলে যাবে কেমন করে? অথচ শ্যামবাজারে একটা জরুরী দরকার আছে। বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ সেখানে পৌঁছতেই হবে। এদিকে কোথায় কোন রাস্তায় পাড়ার ছেলেরা স্টেটবাসের কণ্ডাকটরকে দু-ঘা মেরেছে। তার প্রতিবাদে দুপুর থেকে বাস বন্ধ। এতক্ষণ ট্রাম চলছিল। এখন তাও যাচ্ছে না। বৃষ্টির জলে ট্রামও নিশ্চয় কোথাও আটকা পড়েছে। মাঝে মাঝে দু-একটা প্রাইভেট বাস দেখা দিচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে মাছি গলবারও ফাঁক নেই।

ওয়াই এম সি এ-র দরজার কাছে কিরণ কোনোমতে গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখনও জলের ফোঁটা বেশ বড়। হু-হু হাওয়া। বৃষ্টির ছাঁটে জামাকাপড় কেমন মিইয়ে গেছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিল কিরণ। আর গাড়ির আশায় রাস্তার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল।

হঠাৎ চোখের সামনে প্রায় ভোজবাজির মত ব্যাপার। একটা ফাঁকা ট্যাকসি এগিয়ে চলেছে। দেখতে পেয়ে কিরণ জলের মধ্যেই পথে নামল। ক্রশিং-এর মুখে গাড়িটা নিশ্চল হবার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রায় দৌড়ে গিয়ে পিছনের সীটে বসল। উল্টোদিক থেকে রীতাবরীও এসেছিল ট্যাকসিটা নেবে বলে। কিন্তু কিরণ সেটা আগেই দখল করেছে। জলে ভিজতে ভিজতে বেচারী বিফল মুখে ফের কোথাও মাথা গুঁজতে যাচ্ছিল।

কি ভেবে কিরণ শুধোল,—'আপনি কোথায় যাবেন? শ্যামবাজারের দিকে নাকি?'

রীতাবরী মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল। বলল,—হ্যাঁ, ওদিকেই তো যাবার ইচ্ছে।'

একলা মেয়েছেলে, তায় অচেনা। কিরণের দ্বিধা হচ্ছিল বলতে। বিশ্বাস

কি? যদি মুখের উপর স্পষ্ট না বলে বসে। সে বিশ্রী হবে,—প্রায় অপমান। কিন্তু আকাশে কালো মেঘ,—বৃষ্টি ধরবে বলেও মনে হয় না। এই দুর্যোগে ফের কি আর একটা ট্যাকসি পাবে?

'ইচ্ছে হলে আপনিও এই ট্যাসকিতে যেতে পারেন।' ঈষৎ চিন্তিতভাবে কিরণ প্রস্তাব করল। 'আমিও শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছি।'

কিন্তু রীতাবরী তখুনি গাড়িতে উঠল না। ভুরু কুঁচকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটার দ্বিধা আর সংশয় কিরণের ভালো লাগল। তা সত্যি, চেনা-জানা নেই, একবার বলতেই কেন হুট করে তার সঙ্গে ট্যাকসিতে এসে বসবে? কিন্তু বৃষ্টি যেন আবার ঝেঁপে এল। সেই সঙ্গে জলের ছাঁট। পথে দাঁড়িয়ে ও এমন করে ভিজছে কেন? কিরণ প্রায় ধমক দিয়ে বলল,—'আঃ। কি করছেন আপনি? গাড়িতে উঠে আসুন, না হলে চটপট কোথাও গিয়ে দাঁড়ান, একেবারে ভিজে গেলেন যে।'

কিরণের কথায় কিংবা বৃষ্টি জোরে এল বলে রীতাবরী এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। সে পাশে বসতেই কিরণ লজ্জিতভাবে হাসল। বলল,—'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আমি ডাক্তার কিনা। আপনি জলে ভিজছেন দেখে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারিনি।'

ডাক্তার শুনে রীতাবরী চোখ তুলে আর একবার ওকে দেখল। বলল,—'না, না, এতে মনে করবার কি আছে? আপনি তো ঠিকই বলেছেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে জলে ভিজলে অসুখ-বিসুখ করতে পারে।'

সমস্ত পথে আর কোনো কথা হয়নি। অবশ্য কতটুকু সময়? ফাঁকা রাস্তা। বৃষ্টি-বাদলায় লোকজন কম। ছাতায় মাথা ঢেকে যারা হাঁটছে, তারা সকলেই প্রায় ঘরমুখো। কিরণ অবশ্য অন্য রকম আশা করেছিল। গাড়িতে উঠে রীতাবরী নিশ্চয় তাকে ধন্যবাদ জানাবে। মামুলি ভদ্রতাসূচক দু-একটা কথা। কিন্তু মেয়েটা হয়তো দেমাকী। নইলে অমন মুখ টিপে বসে থাকে।

গ্রে স্ট্রীটের ক্রসিংটা পেরোতেই রীতাবরী নামবে বলল। ইঙ্গিত বুঝে ড্রাইভার তখুনি গাড়ি থামাল। নামার আগে একটা কাণ্ড করল রীতাবরী।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করল। তারপর ট্যাকসির ড্রাইভারের দিকে সেটি এগিয়ে দিল।

কিরণ ভুরু কুঁচকে বলল,—'একি! আপনি ভাড়া দেবেন কেন? আমি তো ট্যাকসিটা নিয়েছি। আরো খানিকটা পথ আমাকে যেতে হবে।'

—'তাতে কি হয়েছে?' রীতাবরী মিষ্টি হাসল। 'আমি এটা দিই। আপনি আবার বাকি পথের ভাড়া দেবেন।'

এই নিয়ে অনেক কথা, অনুরোধ-বিরোধ হতে পারত। কিন্তু পাঞ্জাবি ড্রাইভার পরিষ্কার জানাল তার কাছে চেঞ্জ নেই। সুতরাং দশ টাকার নোট নিয়ে সে কি করবে?

রীতাবরী ফাঁপরে পড়ল। তার কাছে আর টাকা ছিল না। তবু সে ভ্যানিটি ব্যাগের এদিক-ওদিক তন্ন তন্ন ভাবে খুঁজছিল। যদি দু-একটা টাকা বাড়তি থেকে যায়।

ওর হতাশভাব দেখে কিরণ মুচকি হাসল। বলল,—'আহা! আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? টাকাটা না হয় পরে আমাকে দেবেন।'

রীতাবরী মুখ না তুলেই জবাব দিল,—'পরে আবার আপনাকে কোথায় পাচ্ছি?'

—'কেন পাবেন না?' কিরণ ওর দুর্ভাবনা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। বলল,—'পরশু আবার কলেজ স্ট্রীটে আসব। ওয়াই এম সি এ-তে একটা কাজ আছে। বেলা তিনটের সময় ওখানে আমাকে নিশ্চয় দেখতে পাবেন।'

কিরণ ভাবতে পারেনি। কথাটা তার মনেও ছিল না। ওয়াই এম সি এ-র দরজার সামনে রীতাবরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে খুব অবাক হয়ে শুধোল,—'একি!' আপনি এখানে?'

রীতাবরী কোনো ভূমিকা না করেই বলল,—'ট্যাকসি ভাড়াটা বাকি ছিল। তাই দিতে এসেছিলাম।'

কিরণের সেদিনের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। হ্যাঁ, সে বলেছিল বটে। শুক্রবার ওয়াই এম সি এ-তে তার কাজ আছে। বেলা তিনটের সময়

ওখানে তাকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আশ্চর্য। রীতাবরী সে কথা ভোলে নি। ঠিক মনে রেখেছে। ঘড়িতে অবশ্য তিনটে বেজে পাঁচ-ছ মিনিট হবে। মেয়েটি তাহলে আরো আগে থেকে এখানে অপেক্ষা করছে?

ওর হাতে বইখাতা। এইমাত্র বোধহয় কলেজ থেকে বেরিয়েছে।

কিরণ হেসে বলল,—'চলুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

—'আমার সঙ্গে, কথা?' রীতাবরী অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকাল। ফের শুধোল,—'কি কথা? কোথায় বলতে চান?'

—'কফি হাউসে চলুন। ওখানে যেতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নেই?—'

—'ভীষণ আপত্তি আছে।' রীতাবরী ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। বলল, —'ওখানে ইউনিভার্সিটির কত ছেলেমেয়ে। অনেকে আমাকে চেনে। আপনার সঙ্গে কফিহাউসে ঢুকলে ওরা কি ভাববে বলুন তো?'

কে কি ভাবল, এই নিয়ে রীতাবরীর ভীষণ দুশ্চিন্তা। আশঙ্কা অহেতুক জেনেও সে ভয় পেত। প্রথম প্রথম তার সঙ্গে থাকতে চাইত না। খালি ভয়-ভাবনা—যদি কেউ তাদের দেখে ফেলে। তার দাদা, বাবা, কিংবা কোনো আত্মীয় বন্ধু। তাহলেই তো সে ফেঁসে যাবে। জিজ্ঞেস করলে কি বলবে রীতাবরী? কি কৈফিয়ৎ দেবে তাদের কাছে?

অবশ্য দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত সাহসও বেড়েছে। ইদানীং আর তত ভয় করে না। ছুটিছাটার দিনে কোনো ছল-অজুহাতে রীতাবরী কলকাতায় চলে আসে। দুজনে মিলে গঙ্গার ধারে যায়,—ফোর্টের কাছে মখমলের মত সবুজ ঘাসের উপর কিংবা আউটরাম ঘাটের জেটিতে গিয়ে বসে। পশ্চিমের আকাশে সূর্য হেলে পড়ে……গঙ্গার বুকে গাংচিল পাক খায় আর ওড়ে। কোন ফাঁকে যে সময়ের কণাগুলি হারিয়ে যায় কেউ খেয়াল করে না।

কিরণ একদিন মজা করে বলল,—'এখন কিন্তু তোমার খুব সাহস হয়েছে। দিব্যি আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমার বাবার সঙ্গে এবার আলাপ করে আসা দরকার। কবে নিয়ে যাবে বল দিকি?'

—'দাঁড়াও এত তাড়াতাড়ি কিসের?' রীতাবরী ভুরু কুঁচকে তাকাল।

চোখ ঘুরিয়ে রহস্য করে বলল,—'তোমাকে আর একটু বাজিয়ে-টাজিয়ে দেখি মশায়। এত শীগগির কি মা-বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া চলে?'

—'খুব চলে। কিরণ স্পষ্ট জবাব দিল। 'তুমি না নিয়ে গেলে এবার আমি নিজেই তোমাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবো।'

কিরণের গলার স্বরে পরিহাস ছিল না। একটা জিদ কিংবা অনমনীয় শক্তভাব ফুটে উঠল। বুঝতে পেরে রীতাবরী ব্যস্তভাবে বলল,—'এই, না-না। অমন কাজ কর না। শেষে একটা বিশ্রী লজ্জার ব্যাপার হবে।'

—'লজ্জা কিসের?' কিরণ ওকে প্রশ্ন করল। 'বরং এমনি লুকিয়ে-চুরিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে দেখা করতে আমার আরো বেশী লজ্জা করে।'

—'বিশ্বাস কর। উপায় থাকলে তোমাকে অনেক আগে আমি বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম।' রীতাবরী ম্লান হাসল। বলল,—'এসব ব্যাপারে আমার বাড়ির লোকেরা কনজারভেটিব। এই মেলামেশা আলাপ-পরিচয়, কেউ পছন্দ করবে না। উল্টে সন্দেহের চোখে দেখবে। এমন কি আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসা, একা একা ঘোরাফেরা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে।........'

অমিয় বারিক লেন বেশী দূরে নয়। আর মিনিট চার-পাঁচ হাঁটতে লাগবে। একটু এগোলেই বাঁদিকে আঁকাবাঁকা পীর মহম্মদ লেন। কিরণ ভাবল, রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকের ফুটপাত ধরবে। অমিয় বারিক লেনটা ডানদিক থেকে বেরিয়েছে। সুতরাং ওপাশে যাওয়াই সুবিধের হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিকট একটা বোমার শব্দ। খুব নিকটেই কোথাও যেন সেটা ফাটল। কয়েক মুহূর্ত পরেই আর একটা....তারপর আরো তিন-চারটে বোমার শব্দে কানে প্রায় তালা লাগবার জোগাড়। দু-পাশের বাড়ি-ঘর-গুলো থরথর করে কেঁপে উঠল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল। যাত্রী নিয়ে দু-একটা রিকসা উত্তর দিকে যাচ্ছিল। তারা মুখ ঘুরিয়ে যেদিক থেকে আসছিল, আবার সেদিকে ফিরে গেল। পথচলতি মানুষগুলো কর্পূরের মত কোথায় মিলিয়ে গেল, কিরণ ঠাহর করতে পারল না। দোকানপাটের দরজা প্রায় বন্ধ, কিংবা খিড়কির দোরের মত অল্প একটু খোলা রইল। কিরণ

ভাবছিল কি করবে। মাথা তুলে সে দেখল, কেউ কেউ ছাদে উঠে কি যেন লক্ষ্য করছে। অনেকে দোতলা কিংবা তিনতলার জানালায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে। গণ্ডগোলটা সম্ভবত পীর মহম্মদ লেনের ভিতরে। বোমার শব্দ ওখান থেকেই এসেছে। ইতস্তত চিৎকার, হৈ-চৈ। কতকগুলি মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। কিরণ আর এক মুহূর্ত দেরি না করে, রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকের ফুটপাতে এসে দাঁড়াল।

পিছন থেকে কে যেন তাকে উদ্দেশ্য করে বলল,—'হাঁ করে কি দেখছেন দাদা? চটপট ভিতরে ঢুকে পড়ুন। এখুনি রাস্তার উপরে বোমবাজী হলে কি করবেন?'

ঠিক তখুনি পীর-মহম্মদ লেনের ভিতর থেকে কারা যেন দৌড়ে বেরিয়ে এল। চার-পাঁচজন মস্তান গোছের ছোকরা,—উনিশ-কুড়ির মধ্যে সব বয়স। কেমন অপরাধীর মত অস্থির দৃষ্টি। প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র,—ছোরাছুরি লোহার রড। একজনের হাতে বন্দুকের নলের মত হাত দুই লম্বা কি একটা বস্তু।

বনের মধ্যে হঠাৎ দস্যুর দলকে এগিয়ে আসতে দেখলে পথিক যেমন গাছপালার আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করে, কিরণ তেমনিভাবে খুব দ্রুত একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। সে তাকিয়ে দেখল, আরো অনেকে আগেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। প্রায় সাত-আট জন লোক। সকলেই খুব ভীত, সন্ত্রস্ত। যেন কিছু একটা ঘটতে পারে, এই দুর্ভাবনায় তারা অস্থির।

আশ্চর্য। যুবকের দল কিন্তু কোনো দিকে তাকাল না, কাউকে গ্রাহ্য করল না। তারা খুব ব্যস্তভাবে রাস্তা পেরিয়ে এদিকের ফুটপাতটায় এসে উঠল। তারপর তেমনি দৌড়ে আরো খানিকটা দক্ষিণে উজিয়ে ডানদিকের একটা গলির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হল।

ঘরের দরজা ঈষৎ ফাঁক করে অনেকেই দেখছিল। কে একজন বলল,—ইস। কি সাংঘাতিক কাণ্ড। ওই কোঁকড়া চুলওলা ছেলেটির হাতে একটি পাইপগান আছে মশায়।

আর একজন টিপ্পনী কাটল,—'শুধু পাইপগান কেন বলছেন? প্রত্যেক

মস্তানের হাতেই তো একটি করে যন্তর দেখছি। খোঁজ নিয়ে দেখুন পকেটের ভিতর হয়ত রিভলবারও আছে।

কানফাটানো শব্দে ফের একটা বোমা ফাটল। এবারে গলির ভিতরে নয়, রাজপথের বুকে। কিরণ মুখ উঁচু করে দেখল পীর মহম্মদ লেনের মুখে আট-দশজন জোয়ান ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। বোমাটা নিশ্চয় এরাই কেউ ছুঁড়ে মেরেছে। শত্রুপক্ষ চম্পট দিয়েছে দেখে নতুন মস্তানেরা আর এগোল না।

পীর মহম্মদ লেনের সামনে আরো দু-চার মিনিট দাঁড়িয়ে তারা গলির মধ্যে নিজেদের ডেরায় ফিরে গেল।

কিরণ ভাবল, আর কতক্ষণ এমন ইঁদুরের মত গর্তের ভিতর লুকিয়ে থাকবে? তার নিজেকে একটা ভীরু কাপুরুষের মত মনে হচ্ছিল। ঘরের মধ্যে তার মত আরো সাত-আটজন মানুষ। সকলেই হীনবল, শংকায় ব্যাকুল। শুধু এই ঘরই বা কেন? গলির ভিতরে, রাজপথের দুপাশে প্রতিটি ঘরেই এখন আশ্রয়প্রার্থীর ভিড়। আশ্চর্য! কয়েকটা মাত্র ছেলের ভয়ে তারা এতগুলি লোক দুর্যোগের রাতের মত কেমন জড়সড় হয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাচ্ছে।—

পিছন থেকে কে একজন বলল,—'চলুন মশায়, এবার বেরিয়ে পড়া যাক। এরপর আবার পুলিশের হাঙ্গামা শুরু হবে।'

—'পুলিশ?' কিরণ ভুরু কুঁচকে শুধোল।

—'হ্যাঁ। মস্তানরা সব হাওয়া,—পুলিশের তো এই আসবার সময়।' লোকটি ব্যঙ্গ করে বলল, 'দাঁড়িয়ে থাকলে দেখবেন, কয়েকটা নিরীহ নির্দোষ ছেলেকে পুলিশ কেমন করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

এরকম টিকা-টিপ্পনী, সরস সমালোচনা ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে হামেশাই কানে আসে। এসব কথার একতরফা শুনানীই ভাল। কোনো আলোচনা করতে যাওয়া মানেই বোকামী। বলতে গেলে কথার সুতো বাড়তে থাকবে। কিরণ তাই কোনো জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় অনেক লোক। গণ্ডগোল কমে যেতেই ভিড় বেড়েছে। এখানে সেখানে জটলা, আলোচনা। কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে কিরণ একটা ছোট ভিড়ের পাশে দাঁড়াল। সমস্ত শরীরটা বাইরে রেখে সে

উটের মত ভঙ্গিতে মুখটা ভিতরে গুঁজে দিয়ে কথা শুনবার চেষ্টা করতে লাগল।

কে একজন বলল—ওরা তক্কে তক্কে ছিল মশায়। ছেলে দুটো একসঙ্গে ফিরছিল। ফাঁকে পেয়ে চার-পাঁচজনে মিলে একেবারে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

—'তারপর? দুটোই শেষ।'

—'তা বলতে পারব না। তবে শুনলাম একজনের পেটে ছুরি মেরেছে। বোমা লেগে আর একজনের ডান পা কিংবা বাঁ হাতটার নাকি আধখানা উড়ে গেছে।

—'ইস! কি সাংঘাতিক কাণ্ড। দিনে দিনে দেশের কি হাল হচ্ছে মশায়?' শ্রোতা সখেদে বলে উঠল। ফের শুধোল,—'তা ছেলে দু'টোর বয়স কত? বাঁচবে মনে হয়?'

—'কি করে বলব? আমি তো আর চোখে দেখিনি। তবে শুনলাম কাঁচা বয়েস,—দু'জনেই স্কুলের ছেলে।'

—'স্কুলের ছেলে?' কিরণ অস্ফুটে বলল। তার মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করতে লাগল। একটা অজানা ভয়ের স্রোত শিরা-উপশিরায় ছড়াচ্ছে। মনের ভিতর চিন্তাগুলো সব ভোঁতা....একটা অমঙ্গল আশংকা, দুর্বল সন্দেহ ঘুণপোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে। অমিয় বারিক লেনটা তো এখান থেকে দূরে নয়। সে যা মনে করতেও ভয় পায়, তাও কি সত্যি ঘটতে পারে?

আর একটি মুহূর্ত দেরি না করে কিরণ ভিড় সরিয়ে বেরিয়ে এল। কেউ তাকে লক্ষ্য করল না, তার দিকে তাকাল না। পীর মহম্মদ লেনটা বাঁ দিকে রেখে সে খুব দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

দরজা খুলে ছেলের মূর্তি দেখে ভীষণ ভয় পেল মনোরমা। কিরণের একি চেহারা! মুখ কালিবর্ণ, অস্থির দৃষ্টি। উস্কোখুস্কো চুল, গায়ের জামাটা ঘামে ভিজে সপসপ করছে।

—'কি হয়েছে তোর কিরণ?' মনোরমা ব্যস্তভাবে শুধোল। 'অমন হাঁপাচ্ছিস কেন বাবা?'

—'বলছি মা। আগে তুমি আমাকে বলো, হিরু কোথায়? সে কি স্কুল থেকে ফিরেছে?'

—'কেন বল তো?' মনোরমা ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'হিরু তো আজ স্কুলে যায় নি। সকাল থেকে বাড়িতেই আছে। ডাকব তাকে?'

—'না, না। ডাকতে হবে না।' কিরণ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'হিরু আজ স্কুলে না গিয়ে ভালই করেছে মা। একটু আগে পীর মহম্মদ লেনের ভিতর দুটো ছেলে বোধ হয় খুন হয়ে গেল।'

—'খুন হয়ে গেল? বলিস কিরে?' মনোরমা যেন আর্তনাদ করে উঠল।

হ্যাঁ মা, উত্তেজনায় কিরণের চোখ দুটো চকচকে দেখাল। সে বলল,—'ছেলে দুটো সম্ভবতঃ স্কুল থেকে ফিরছিল। বাগে পেয়ে একজনকে ওরা ছুরি মেরেছে। বোমা লেগে আর একজনের ডান পা কিংবা বাঁ হাতটার আধখানা উড়ে গেছে। দুজনের কেউই বোধ হয় বাঁচবে না।'

—'গণ্ডগোলটা কোথায় হচ্ছিল কিরণ?' পিছন থেকে পুরুষ কণ্ঠে কেউ প্রশ্ন করল।

চেনা গলা। তবু কিরণ অবাক হল। এখন বড়জোর দুটো হবে। কিন্তু এত সকালে বাবা কেমন করে অফিস থেকে ফিরলেন? তবে কি হিরুর মত উনিও আজ বাড়িতে আছেন? সকালবেলায় খাওয়া-দাওয়া করে অফিসে যান নি?

দরজার সামনে বাণীব্রত দাঁড়িয়েছিলেন। কেমন ক্লান্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে। পরণে একটা আধময়লা জামা আর ধুতি। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়েছিলেন, ছেলের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

—'পীর মহম্মদ লেনে খুব গোলমাল, খুন জখম হয়ে গেল বাবা।' কিরণ ধীরে ধীরে বলল। 'দুটো ছেলে বোধ হয় মারা যাবে। এতক্ষণ তো বিকট শব্দে বোমা ফাটছিল সেখানে, তোমরা শুনতে পাওনি?'

—'শুনেছি বৈকি।' মনোরমা এগিয়ে এসে বলল। 'কিন্তু বোমার

শব্দ তো এদিক-ওদিক চারদিক থেকেই পাচ্ছি কিরণ। একটু আগে যে পীর মহম্মদ লেনে বোমা ফাটছিল, তা কেমন করে বুঝব বল?'

—'তুমি কি এতক্ষণ সেখানেই ছিলে? বাণীব্রত ভ্রূ কুঁচকে শুধোলেন।

—'ঠিক সেখানে নয় বাবা।' কিরণ ঘটনাটা প্রাঞ্জল করতে চেষ্টা করল। 'আমি আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে বাড়ি ফিরছি। পীর মহম্মদ লেনের কাছাকাছি আসতেই একটা গণ্ডগোল, বোমার আওয়াজ কানে এল। অমনি দোকান-পাট সব ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল বাবা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রাস্তাটা ফাঁকা। মানুষজন কে কোথায় পালাল, তা বুঝতেও পারলাম না। ভয় পেয়ে আমিও তাড়াতাড়ি একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।'

—'বেশ করেছিস বাবা।' মনোরমা সস্নেহে ছেলের মুখের দিকে তাকাল। বলল,—'গণ্ডগোল, মারামারির সময় বাইরে থাকতে নেই। সকলেই ধারে কাছে কোথাও আশ্রয় নেয়।'

বাণীব্রত চুপ করে কি ভাবছিলেন। জানালার ফাঁক দিয়ে বহু দূরের এক টুকরো নীল আকাশ চোখে পড়ে। কি শান্ত, সুন্দর ছবি! সেদিকে তাকিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মত তিনি বললেন,—'কলকাতার বাস এবার গুটোতে পারলে বাঁচি। চন্দনপুরে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই কিরণ।'

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলে শুধোল,—'কলকাতা ছাড়তে পারলেই তুমি স্বস্তি পাবে বাবা? চন্দনপুরে গেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে?'

—'তা জানি না।' বাণীব্রত মৃদু হাসলেন। 'তবে সেখানে নিশ্চয় এসব দুর্ভাবনা নেই। তোদের কলকাতার এই গণ্ডগোল, মারামারি, খুনো-খুনী কিছুই সেখানে পৌঁছবে না।'

জানালার ফাঁকে নীল আকাশটার দিকে তাকিয়ে বাণীব্রত ফের উন্মনা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন,—'জানিস কিরণ, আমাদের চন্দনপুরের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা গন্ধরাজ গাছ আছে। ডালপালায় এখন প্রকাণ্ড হয়েছে সেটা। চন্দনপুরে রোজ ভোরে ঘুম ভাঙ্গলে দেখতাম, গন্ধরাজ গাছটার ডালে বসে একটা পাখি কি সুন্দর শীস দিচ্ছে।'—

কিরণ হেসে বলল,—'কলকাতার উপর তুমি মিছিমিছি রাগ করছ বাবা।

এত গণ্ডগোল, মারামার কেন হচ্ছে, কারা এসব করছে তাই নিয়েও ভাববার আছে। সমস্যার সমাধান না হলে চন্দনপুরে গিয়ে নিস্তার নেই। গণ্ডগোলের ঢেউ যে একদিন সেখানে পৌঁছবে না তাই কি জোর করে বলা যায়?'

বাণীব্রত কোনো জবাব দিলেন না। ছেলে আরো কি বলে তাই শুনবার জন্য ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিরণ বলল,—'শুধু কলকাতা কেন, সমস্ত পশ্চিমবাংলার অবস্থা চিন্তা কর বাবা। ঠিক জ্বরে বেহুঁশ একটা রুগীর মত হাল। বিকারের ঘোরে সে অর্থহীন প্রলাপ বকছে। মাঝে মাঝে হাত-পা ছুঁড়ছে। তাকে সুস্থ, স্বাভাবিক করে তোলাই আপনজনের কাজ। ফেলে পালিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই বাবা।'

বাণীব্রত বললেন—'আর সে যদি সুস্থ, স্বাভাবিক না হয়ে ওঠে?'

—'তাহলেও আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ঘরের চালে আগুন লাগলে কেউ কি বাড়ি ছেড়ে পালায় বাবা? জল ঢেলে, লাঠি মেরে আগুন নেভাতে হয়।'

—'কি জানি।' বাণীব্রত অন্যমনস্কের মত বললেন, 'তোদের সব কথাই কেমন হেঁয়ালির মত কিরণ। আমরা পুরনো লোকেরা ঠিক বুঝতে পারি না।'

—'ওসব তর্কের কথা এখন থাক। খাবি চল দিকি। দু'টো কখন বেজে গেছে, সে খেয়াল কারো আছে?' মনোরমা ছেলেকে তাড়া দিল। ফের স্বামীকে বলল,—'তুমি অমন দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শরীর খারাপ বলে, অফিস থেকে চলে এলে! বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাক গে।'

—'বাবার শরীর খারাপ নাকি?' কিরণকে চিন্তিত দেখাল।

—'ও কিছু নয়।' বাণীব্রত ব্যাপারটা লঘু করতে চাইলেন। অফিসে গিয়ে শরীরটা হঠাৎ কেমন খারাপ লাগল। বুকের কাছে একটা ব্যথা, তাই ট্যাকসি ডেকে বাড়ি চলে এলাম।'

—'বুকের কাছে ব্যথা?' কিরণ ভুরু কোঁচকাল। বলল,—'ঠিক আছে। কাল সকালে আমার সঙ্গে তুমি হাসপাতালে চল বাবা। প্রফেসর

সিন্‌হাকে দেখাব। ব্লাড, ইউরিন, প্রেসার,—দরকার হলে একটা ইলেকট্রো কার্ডিয়োগ্রাফও করতে হবে।'

*    *    *

ছেলের সামনে ভাতের থালা সাজিয়ে রেখে মনোরমা বলল,—'তোকে একটা কথা বলব কিরণ ?'

—'কি কথা মা ?'

—'বিস্তি বড় হচ্ছে। তার জন্যে কিছু ভাবিস ?'—

—'কেন ? কি হয়েছে বিস্তির ? কোনো অসুখ-বিসুখ ?'

—' বালাই ষাট। অসুখ কেন হতে যাবে ? আমি তোকে অন্য কথা বলছি কিরণ।' একটু থেমে মনোরমা ফের শুরু করলেন,—'তোর বাবার কথা শুনলি তো ? চন্দনপুরে উনি যাবেনই। যুক্তি-তর্ক, কারো অনুরোধ মানবেন না। কিন্তু যাবার আগে বিস্তির একটা বিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। ওই নাচুনী মেয়ে কখনও চন্দনপুরের মত গ্রামে গিয়ে থাকতে পারে ?'

—'বিস্তির বিয়ে ?' কিরণ ঠোঁট কামড়ে প্রশ্নটা ভাবল। মা অনেক দূর তলিয়ে দেখেছেন। বলার মধ্যে যুক্তি আছে। কিন্তু আশ্চর্য ! বিস্তির বিয়ের কথা ভাবতে রীতাবরীর মুখটা কেন তার মনে পড়ছে ?

## ॥ আট ॥

সন্ধ্যের খানিক আগে রিহার্সাল শেষ হল।

শুরুতে অবশ্য আরো একটু তাড়াতাড়ি হ'ত। আসলে প্রথম দিকে যেমন হয়,—কেউই তেমন সিরিয়াস ছিল না। প্রতিদিন একজন কিংবা দু'জন গরহাজির। ফলে পুরো বইটার মহলা হয়ে উঠত না। কিন্তু এখন তড়িঘড়ির ব্যাপার। সামনেই ফাংশন। হাতে আর মোটে সাত-আটটা দিন। সময় বেশী নেই বলে রতীশ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই ক'টা দিন ভালো করে তামিল না দিলে ফাংশনের রাত্তিরে নাটক জমবে কেন ?

বিন্তির পা দুটো টন টন করছিল। মোটে দেড় ঘণ্টার বই। কিন্তু ওরই মধ্যে তার তিন-চারটে নাচ আছে, ভালো করে তালিম নেবার জন্যে প্রত্যেকটি নাচ একবার-দুবার এমনকি তিনবারও নেচেছে বিন্তি। সে নাচে ভালো, সকলেই প্রশংসা করছে। মায় নৃত্য-পরিকল্পনা যার সেই ভদ্রলোক পর্যন্ত। বিন্তি নিজেও খুব খুশি। এই নাটকের সে নায়িকা,—নর্তকী রূপসেনা। তার নাচগুলি মুখ্য আকর্ষণ। বইটাতে নাচ আর গান বেশী। অভিনয়ের তেমন সুযোগ নেই। সুতরাং অন্য কারো বাহবা কুড়োবার আশা কম।

মিলি এসে বলল,—'চল বিন্তি। তোর গাড়ি রেডি। নীচে সারথিমশায় তোকে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

ড্রাইভার এসেছে শুনে বিন্তি তখুনি উঠল। লোকটা সর্বদাই গাড়ি নিয়ে এখানে সেখানে ছুটছে। ভীষণ ব্যস্ত, সময় মতো তাকে পাওয়াই কঠিন। রতীশদের বাড়িতে গাড়ি দুটো,—কিন্তু ড্রাইভার একজন। তবু অসুবিধে নেই। কারণ সকলেই ড্রাইভিং জানে, লাইসেনস আছে। ইচ্ছেমত গাড়ি নিয়ে যে কেউ বেরোতে পারে। ড্রাইভার না থাকলে রতীশই তাকে পৌছে দিতে যায়। আর তাই নিয়ে মিলি আড়ালে ঠাট্টা করে, মুখ টিপে হাসে। অবশ্য শুধু মিলি নয়, অন্য মেয়েরাও ফিসফিস, গা-টেপাটেপি করে। সে রতীশের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠলেই ওরা টেরিয়ে টেরিয়ে তাকায়। কেউ বা ফিক করে হাসে।

নীচে এসে বিন্তি দেখলে গেটের কাছে গাড়িটা দাঁড়িয়ে। কিন্তু চালকের আসনে ড্রাইভার নয়, রতীশ বসে আছে।

মিলি তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে মিহি গলায় বলল—'কিরে, সারথিকে দেখে খুশি হ'লি তো ?

বিন্তি খুব খুশি। ড্রাইভারের সঙ্গে যেতে তার একটুও ভালো লাগে না। এতখানি পথ স্রেফ মুখ বুজে যাওয়া। অথচ রতীশ গাড়ি নিয়ে গেলে দুজনে গল্পে মত্ত থাকে। সমস্ত পথটা কখন হুস করে ফুরিয়ে আসে বিন্তি টেরও পায় না।

কিন্তু এসব ব্যাপারে মনের খুশি ভাঙতে নেই। আশেপাশে আরো

মেয়েরা আছে, তারা শুনলে কি ভাববে ? তাছাড়া মিলিটা সাংঘাতিক,—ভীষণ দুষ্টু। ওর মুখে কিছু আটকায় না। এমনিতেই যখন তখন তাকে ঠাট্টা করে। বলে,—'রতীশদা নির্ঘাত তোর প্রেমে পড়েছে। ব্যাপারটা তুই লুকোচ্ছিস।'

—'পাগল নাকি ?' বিস্তি মৃদু হাসে। ভুরু কুঁচকে কেমন একটা ভঙ্গি করে শুধোয়,—'দুদিন গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিলেই ছেলেরা বুঝি প্রেমে পড়ে যায় ?'

—'কি জানি !' মিলি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা দোলায়। ব'লে,—'তুই যা চাপা মেয়ে। প্রেমে মজলেও আমার কাছে কি কোনোদিন ভাঙবি ?'

রতীশদের বাড়িটা ভারী সুন্দর। চারপাশে অনেকখানি লন। সবুজ ঘাস, ঠিক মখমলের মত নরম। এখানে সেখানে নানা গাছ। সামনের দিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে বাগান। মালিটার বাহাদুরি আছে। এই কার্তিকের শেষেই কত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটিয়েছে বাগানে। কি সুন্দর সব মরশুমী ফুল। প্রত্যেকটির বিচিত্র বর্ণবাহার। গাড়িতে ওঠার আগে বিস্তি কয়েক সেকেণ্ড মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

সাদার্ণ অ্যাভিনিউ ধরে খানিকটা পথ গিয়ে গাড়িটা ফের একপাশে থামল। বিস্তি পিছনের সীটে বসেছিল। গাড়িটা থামতেই সে দরজা খুলে বেরিয়ে আবার রতীশের পাশে এসে বসল। আসলে প্রতিদিনই এই লুকোচুরি। গেটের সামনে গাড়িতে ওঠার সময় বিস্তি পিছনের সীটে বসে। অল্প কিছুটা পথ গিয়ে গাড়িটা ফের থামে। আর তখন আসন বদল করে বিস্তি সামনের সীটে রতীশের কাছে চলে আসে।

গাড়ি ফের চলতে শুরু করলে বিস্তি শুধোল,—'বইটা মনে হয় ভালো হবে, তুমি কি বল ?'

—'নিশ্চয়। তোমার নাচ তো খুব সুন্দর হচ্ছে। সবাই প্রশংসা করে। এমনকি মন্মথবাবু পর্যন্ত।' একটু থেমে রতীশ যোগ করল,—উনি কিন্তু চট করে কাউকে ভালো বলেন না।'

কথাটা সত্যি। মিলির কাছ থেকেও বিস্তি শুনেছে। মাস্টারমশায়

তার নাচের প্রশংসা করেছেন। এই নাটকের নৃত্যগুলি মন্মথবাবুর পরিকল্পনা। তাদের ক'জনকে নাচ শেখান, তালিম দেওয়ার ভার উনি নিয়েছেন। অথচ বিস্তি যে ভালো নাচে, একথা কোনোদিন মন্মথবাবুর মুখ থেকে সে শোনেনি। উনি শুধু বলেছেন,—'তুমি চেষ্টা করে যাও। একদিন হয়তো ভালো নাচতে পারবে।'

সন্ধ্যের মুখে সাদার্ন অ্যাভিনিউ প্রায় ফাঁক। ইদানীং সব রাস্তারই বোধ হয় এই দশা। গাড়ি জোরে ছুটছিল বলে হাওয়ায় মাথার চুলগুলো উড়ছে। কানের কাছে, মুখের নরম চামড়ায় জোরে বাতাস লাগছে। বিস্তি কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে বলল—'ভীষণ হাওয়া। কাচটা তুলে দাও দিকি।'

রতীশ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বেশ কসরৎ করে উইণ্ড গ্লাসটা তুলে দিল।

বিস্তি নড়েচড়ে আরাম করে বসল। বলল,—'রোজ রোজ আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছ। ওরা সবাই আড়ালে হাসাহাসি করে।'

'তাই নাকি?' রতীশ আড়চোখে তাকাল। 'কিন্তু রিহার্সালের পর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব, এই কথা ছিল না আমাদের?'

—'আহা। তার জন্যে তো ড্রাইভার আছে মশায়।' বিস্তি মুচকি হাসল। 'রোজ রোজ তোমার অত পৌঁছে দেবার গরজ কিসের?'

—'ড্রাইভার কোথায়?' রতীশ সামনের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল। 'সে বোধহয় এখনও ফেরেনি। তার সঙ্গে যেতে হলে তোমার আরো এক ঘণ্টা নির্ঘাত দেরি হত।'

'ও বাবা!' তাই নাকি?' বিস্তি প্রায় আঁতকে উঠল, তাহলে বাড়ির লোকে আমাকে আর আস্ত রাখত না।' কয়েক সেকেণ্ড পরে সে ফের বলল,—'কিন্তু তোমার কথা ওরা কেউ বিশ্বাস করবে না মশায়, মিলি তো নয়ই। সে পরিষ্কার বলে—সব রতীশদার চালাকি। তোকে নিজে পৌঁছে দেবে, তাই ছলছুতো করে ড্রাইভারকে অন্য কাজে পাঠিয়ে দেয়। আমরা যেন আর কিছু বুঝিনে।'

—'তাই নাকি? মিলি বুঝি তোমাকে এই সব বলে?' রতীশ হা-হা করে হাসল।

—'শুধু এই নয় মশায়,' বিস্তি সহাস্যে তাকাল। 'তোমার বোনটি একটি চিজ্। সে আরো অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে।'

—'আবার কি জিজ্ঞেস করে?' রতীশ শুধোল।

—'আহা! তুমি দিন দিন ভীষণ ন্যাকা হচ্ছ।' বিস্তি সুন্দর একটি ভ্রূভঙ্গি করল। বলল,—'মিলি কি জানতে চায়, তুমি বুঝতে পার না?

—'কিছুটা পারি বৈকি।' রতীশ হেসে ফেলল। আড়চোখে বিস্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তবু তোমার কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছে করে যে।'

বিস্তি মুখ নামিয়ে অল্পক্ষণ ভাবল। ব্যাপারটা মুখ ফুটে জানাতে বোধহয় তার লজ্জা করছিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ঈষৎ সংকোচের সঙ্গে সে বলল,—'জানো, মিলি আমাদের ভীষণ সন্দেহ করে। ওর ধারণা তুমি নির্ঘাত আমার প্রেমে পড়েছ। তাই আমার দিকে তোমার এত নজর। আমাকে একা পেতে চাও বলেই রোজ গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে ছুটছ—'

—'বাঃ। মিলিটা তো খুব ইনটেলিজেণ্ট। ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করেছে' রতীশ বোনের বুদ্ধির তারিফ করলে। মুচকি হেসে বিস্তিকে শুধোল,—'তুমি প্রেমের সম্পর্কটা স্বীকার করলে তো?'

—'পাগল নাকি?' বিস্তি চোখ ঘুরিয়ে জবাব দিল। 'তাহলে আর তোমাদের বাড়ি যেতে পারব? মিলি আমাকে দিনরাত্তির ক্ষেপিয়ে মারবে। তাছাড়া এসব কথা তাড়াতাড়ি স্বীকার করবার প্রয়োজন কি?'

—'ঠিক বলেছ তুমি।' রতীশ খুশি হয়ে বলল। 'আরো কিছুদিন যাক না। ভালবাসার কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানাতে নেই। প্রেমের একটা রঙ আছে বিস্তি। সে রঙ ঠিকই চোখে পড়বে। দশজনের কাছে লুকোবার উপায় নেই।'

রতীশ খুব সুন্দর কথা বলতে পারে। বিস্তির ভীষণ ভালো লাগে। ওর

কথাগুলো সে আবিষ্টের মত শোনে। প্রতিটি শব্দ বিস্তির কানে এমন মধুর মনে হয়। মিলির জন্মদিনে প্রথম ওর সঙ্গে আলাপ। সেদিন কি সুন্দর দেখাচ্ছিল রতীশকে। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। গলায় একটা টকটকে লাল রঙের টাই। পরনে ছাই-রঙা স্যুট আর ঘিয়ের রঙের সিল্কের জামা। রতীশের ঠোঁট দুটোর এমন সুন্দর লালচে রঙ। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হলে বিস্তির বুকের ভিতরটা আজও কেমন শিরশির করে।

গড়িয়াহাটার ক্রসিঙে লাল আলোর সঙ্কেত দেখে গাড়িটা দাঁড়াল। ছোটোখাটো জ্যাম্। সারবন্দী অনেকগুলো গাড়ি। ক্রসিঙটা পার হতে সময় লাগবে। রতীশ স্টিয়ারিং থেকে হাত নামিয়ে বলল,—'মিলি কিন্তু সত্যি কথা বলেছে। দশজনের ভিড়ে তোমাকে দেখে, কাছে পেয়ে আমার মন ভরে না বিস্তি। আমি সকলের কাছ থেকে আড়াল করে তোমাকে একা পেতে চাই। আর একলা পাব বলেই এই পথটুকু আমি নিজে ড্রাইভ করে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে ভালবাসি।'

সবুজ বাতি জ্বলে উঠতেই গাড়িটা ফের স্টার্ট নিল। সন্ধ্যে হতে অল্প কিছুক্ষণ বাকি। রতীশ বলল, 'এখনই বাড়ি ফিরতে চাও?' গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে গেলে হত না?'

মুমূর্ষু রোগীর মত বিকেল প্রায় মরতে বসেছে। গ্রাম-বাংলায় এখন গোধূলির ছবি। বড় গাছের নীচে, ঝোপ-ঝাপের তলায় আবছা অন্ধকার ঘন হতে শুরু করেছে। গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসতে বিস্তির বোধহয় অমত ছিল না। তবু মৃদু আপত্তি করে সে বলল,—'বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে না?'

—'কিচ্ছু দেরি হবে না।' রতীশ ওর মনের মেঘ সাহসের বাতাসে উড়িয়ে দিতে চাইল। হাতঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে ফের বলল,—'এখন প্রায় ছ'টা বাজে। আমি সাতটার আগে তোমাকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দেব।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। গাড়িটা প্রায় নিঃশব্দে চলেছে। কয়েকটি মৌন মুহূর্ত নিঃশেষ হল।

নীরবতা ভেঙে বিস্তি, প্রথম বলল,—'ছাখ, মাঝে মাঝে আমার ভীষণ ভয়

করে। মনে হয় তোমার সঙ্গে অনেকদূর এগিয়ে গেছি। শেষকালে কি হবে বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, তুমি আমায় ভুলে যাবে না তো?'

—'কি জানি!' রতীশ ভুরু কুঁচকে কিছু চিন্তা করছিল। ফের বিস্তির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল,—উল্টোটাও তো হতে পারে। আমার তো ভয় হয়, তুমিই না শেষে আমাকে ভুলে যাও।'

—'আমি ভুলে যাব? কি বলছ তুমি? বিস্তি প্রায় প্রতিবাদ জানাল।

—'বারে! এ সব কথা কি আগে থেকে বলা যায়?' রতীশ হাসল। 'আর ক'বছর পরে হয়তো তুমি একজন মস্ত বড় নৃত্যশিল্পী হবে। দেশজোড়া নাম, কত লোক চিনবে তোমায়। তখন আমার মত একজন সাধারণ মানুষকে তোমার পক্ষে চিনে রাখা একটু কঠিন হবে বৈকি।'

—'যাও, তুমি ভীষণ বাজে কথা বলতে পার।'

—'বাজে কথা নয় বিস্তি, আমার মাসীর কথা তোমাকে বলেছি না? আগে যখন নাম হয়নি, তখন মাসী আমাদের কত খোঁজখবর নিত। নিয়মিত লেটার আসত, আর এখন একটা চিঠি দিলে এক মাসের আগে উত্তর পাই না। তাও একপাতার ছোট্ট চিঠি। অবশ্য আমি বুঝতে পারি, মাসীর কোনো দোষ নেই। হপ্তার সাতটা দিন অত ব্যস্ত থাকলে চিঠি লিখবে কখন? মানুষটার ফুরসৎ কোথায়?'

একটু থেমে রতীশ ফের বলল,—'ফেমাস হওয়ার এই এক জ্বালা। নিত্য নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। বইয়ের পাতা ওলটানোর মত পরিবেশ পালটাচ্ছে। পুরানো মানুষগুলোর মুখ আর মনেই থাকে না।'

বিস্তি মুখ তুলে শুধোল—'তোমার মাসী বুঝি খুব ফেমাস মহিলা? কিসে এত খ্যাতি? ভালো নাচতে পারেন? কি নাম বললে না তো?—'

—'উহুঁ! নাম এখন বলব না। তবে আমার মাসীকে তুমি নিশ্চয় চেন। আর নাচের কথা শুধোচ্ছ? এককালে মাসী অবশ্য খুবই ভালো নাচত। এই কলকাতায় কত শো করেছে। মাসী নাচবে শুনলে কম টিকিট বিক্রি হত শহরে?'

—'কি আশ্চর্য!' বিত্তি বিস্ময়ে চোখ ছুটো বড় করল। 'তুমি ঠিক বলছ, তোমার মাসীকে আমি চিনি? কিন্তু কেমন করে চিনব বল তো? উনি তো কলকাতার বাসিন্দা নন। যেখানে থাকেন, সে জায়গাটা এখান থেকে তেরশ মাইল দূর।'

—'সে কথাও সত্যি!' রতীশ হেসে উত্তর দিল। 'মাসী যেখানে আছে, কলকাতা থেকে সেটা অনেক দূর।' সাত সমুদ্দুর না হোক, তের নদীর পার তো বটেই।'

—'তাহলে বলো আমি কেমন করে ওঁকে চিনতে পারি?' বিত্তি একটা যুক্তি খাড়া করতে চাইল। কয়েক সেকেণ্ড পরে রতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ফের শুধোল,—'আচ্ছা মিলির কাছে তো কোন দিন তোমার এই মাসীর গল্প শুনি নি।'

—'আহা! মিলি কেমন করে মাসীর কথা জানবে? উনি তো আমার নিজের,—মানে মার রক্তের সম্পর্কের বোন নন।'

—'তাহলে?'

—'মাসী আমার মার বন্ধু। অবশ্য বয়সে অনেক ছোট। আট-দশ বছর আগের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। মাসে একবার কি ছুবার আমরা মাসীদের বাড়ি বেড়াতে যেতাম। তারপর মাসী হঠাৎ একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। অনেক দিন কোন খোঁজ খবরই পাই নি। আর এখন তো মাসী রীতিমত ফেমাস। কলকাতার কত লোক নাম বললেই চিনবে। মাঝে মাঝে মা অবশ্য ছুঃখ করে। বলে,—আট-দশ বছর আগের দিনগুলো আশা বোধ হয় এক রকম ভুলেই গেছে।'

—'এই যাঃ!' বিত্তি হাততালি দিয়ে উঠল। 'ভুল করে মাসীর নামটাই কিন্তু বলে ফেললে।'

—'ওটা সাবেকী নাম।' রতীশ একটুও অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিল। 'ও নামে এখন মাসীকে কেউ চিনবে না। মা তাই সেদিন বলছিল, নতুন নাম নিলে মানুষটাও বোধ হয় বদলে যায়। আমাদের আশারও ঠিক সেই দশা হয়েছে।'

আউটরাম ঘাটের কাছে এসে গাড়িটা থামল। গঙ্গার বুকে জলের

উপর আবছা অন্ধকারের ছায়া একটা ভারী পর্দার মত ঝুলছে। ময়দানে কেল্লার চার পাশে এখন আর নজর চলে না। সর্বত্রই আঁধারের কালিমা থিক থিক করছে। দূরে রেড রোডের ওপারে চৌরঙ্গীর আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদশীর্ষ, গল্পে-পড়া রূপকথার রাজপুরীর মত স্বপ্নময় মনে হয়।

গাড়ি থেকে নেমে রতীশ ফের কথা কইল। 'তাই তো বলছিলাম তুমিও একদিন মাসীর মত ফেমাস হবে। আর তখন কলকাতার এই দিনগুলোর কথা কে জানে, হয়তো তুমিও বেমালুম ভুলে যাবে।'

—'ককৃখনো না।' বিস্তি প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠল। 'মেয়েরা অত চট করে কিছু ভোলে না মশায়, বুঝলে? তবে তোমার মাসীর সঙ্গে মিছিমিছি আমায় তুলনা করছ। আমি ভালো করে নাচতে শিখলে তবে আমার নাম-ডাক হবে।' একটু থেমে সে ফের বলল,—'কে জানে, আমার হয়তো আর নাচ শেখাই হবে না।'

—'কেন? নাচ শেখা ছেড়ে দেবে নাকি?'

—'সে অনেক কথা রতীশ।' বিস্তি ম্লান মুখ করে বলল। 'আমরা হয়তো আর বেশী দিন কলকাতায় থাকব না।'

—'কলকাতায় থাকবে না? তাহলে কোথায় যাবে?'

—'দেশে। বাঁকুড়া জেলায় চন্দনপুর বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানেই আমাদের বাড়ি। রিটায়ার করে বাবা এখন গ্রামে ফিরে যেতে চান।'

—'আশ্চর্য! শহর থেকে আবার কেউ গ্রামে ফেরে? আমি তো জানতাম গ্রাম থেকেই লোকে শহরে চলে আসে। একবার এলে আর কেউ সেখানে ফিরে যায় না। যেতে চায় না। কেন যাবে বলো? কি আছে গ্রামে?—'

—'ঠিক ভাই। আমার মা বার বার সেকথা বলেন। কি হবে গ্রামে গিয়ে? রিটায়ার করলেই কি লোকে দেশে ফিরে যায়? খরচ-পত্তর সেখানেও যেমন, এখানেও তেমনি। কিন্তু বাবা অবুঝ, ভীষণ জিদ করছেন। কারো কথা শুনবেন বলে মনে হয় না।'

—'খুব মুস্কিল ব্যাপার।' রতীশ চিন্তিতভাবে বলল। 'তোমার

এমন সুন্দর ফিগার। ভালো করে নাচ শিখলে একদিন নাম-যশ সব হবে তোমার। আর তুমি কিনা নাচ ছেড়ে দিতে চাইছ—'

—'চন্দনপুরে গেলে আর কেমন করে নাচ শিখব?' বিস্তি একটা হতাশ ভঙ্গি করল। ফের বলল,—'তবে এখনও কিছু পাকাপাকি হয় নি। এই যা ভরসা।'

রতীশ হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,—'তোমাকে গ্রামে যেতে দেব না বিস্তি। চন্দনপুরে গেলে তোমার প্রতিভার অপমৃত্যু হবে। দরকার হলে তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলতেও রাজি আছি।'

—'পাগল। বাবা তোমার কথা শুনবেন কেন? আমার মা, দাদারা দিন-রাত্তির কত বোঝাচ্ছে। কিন্তু চন্দনপুর বাবাকে একটা শক্তিশালী চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। হাজার বোঝালেও মত বদলাবে বলে বিশ্বাস হয় না।'

অন্ধকার ঘন হতে গঙ্গার তীর নির্জন হয়ে এল। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হবার পর বাতাসের শিরশিরানি আরো তীক্ষ্ণ ছুঁচোল হয়ে উঠেছে। দিন ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা নিঃশেষ হয়ে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। কৃষ্ণপক্ষ বলে আকাশে চাঁদ নেই। এতক্ষণ আশে-পাশে দু-চারজন লোক দেখা যাচ্ছিল। রাত বাড়ছে দেখে তারা কে কোথায় সরে পড়ল।

গাড়িতে বসে স্টার্ট দেবার আগে রতীশ বাঁ হাত বাড়িয়ে বিস্তির গলাটা জড়িয়ে ধরল। প্রথমে আলগোছে নরমভাবে, কিন্তু বিস্তি উখখুস করছে দেখে সে বেশ হেলে পড়ে হাতটা ভারী এবং কিছুটা শক্ত করল।

—'এই কি করছ! ছাড়ো, ছাড়ো—' বিস্তি নিজেকে মুক্ত করতে চাইল।

রতীশ মাথা হেলিয়ে বলল,—'লক্ষ্মীটি, এখানে কেউ নেই। শুধু একটা —, বাকিটুকু সে ইঙ্গিতে প্রকাশ করল।

বিস্তি ছদ্ম কোপ দেখিয়ে বলল,—'আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করব। রোজ রোজ এসব ইংরেজী সিনেমার মত কাণ্ড আমার একটুও ভালো লাগে না। এই জন্যেই বুঝি তুমি আমাকে গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে আস?'

'দূর। তুমি মিথ্যে রাগ করছ।' রতীশ ওকে ছেড়ে ফের সোজা হয়ে

বসল। তারপর ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল,—'আমি তোমাকে ভালোবাসি বিস্তি, ভীষণ ভালোবাসি। একদিন না দেখা হলে ছটফট করে মরি।'

—'সত্যি বলছ?' বিস্তি ঠোঁট ফুলিয়ে কেমন আব্দার করে শুধোল।

—'সত্যি, সত্যি। তিন সত্যি। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না বিস্তি?' রতীশ সরে ওর গা ঘেঁসে বসল।

—'বিশ্বাস করি বৈকি। নইলে তোমার সঙ্গে এমনি ঘুরতে পারি?' বিস্তি অকপটে মনের কথা ব্যক্ত করল।

এবং সেই মুহূর্তে রতীশ আবার ওর গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর রাক্ষস যেমন সুন্দরী মেয়েকে অসহায় পেলে তার হৃদয়ের রক্ত চুষে খায়, রতীশ অনেকটা তেমনি ভঙ্গিতে নিজের মুখখানা ওর বুকের মাঝখানে প্রায় গুঁজে দিল। বিস্তির সমস্ত দেহে শিরশিরানি ও রোমাঞ্চ। সে প্রায় থর থর করে কাঁপছিল। ধীরে ধীরে রতীশ তার মুখটা উপরে তুলে বিস্তির নরম গাল, গলা এবং কানের লতির নীচের দিকটা আলতোভাবে স্পর্শ করল। আবছা অন্ধকারে রতীশের উষ্ণ নিশ্বাস তার মুখের উপর এসে পড়ছিল। লালচে ঠোঁট দুটো ক্রমেই নিশানার দিকে এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে সে চোখ বুঁজে প্রায় অনাস্বাদিত দুর্লভ স্বর্গসুখের কল্পনায় স্বল্প কটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে লাগল।

মিনিট তিন-চার পরেই গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। বিস্তি প্রায় নির্জিবের মত সীটে মাথা হেলিয়ে চুপ করে বসেছিল। খানিক পরে রতীশ বলল,—'কাল হয়তো তাড়াতাড়ি রিহার্সাল শেষ হবে। বাড়ি ফেরার পথে একটা নতুন জায়গা ঘুরে যেতে চাও?'

—'কোথায়?' বিস্তি মুখ না তুলেই শুধোল।

—'পার্ক স্ট্রীটে। একটা ভালো রেঁস্তোরায়। দেখবে বিকেলবেলায় আমাদের বয়সী কত ছেলেমেয়ে সেখানে গেছে। বাজনা শুরু হলেই সকলে মিলে কেমন নাচতে শুরু করবে। অবশ্য তোমার মত অত সুন্দর নাচের ভঙ্গিমা নয়। ওরা সাধারণত টুইস্ট নাচে। একবার দেখলেই তুমি সহজেই শিখে নিতে পারবে।

বিস্তি এবার উৎসাহের সঙ্গে শুধোল, —'ছেলেমেয়ে সব একসঙ্গে নাচে ? খুব মজা হয় তাহলে ?'

'—খুউব। তুমি গেলেই বুঝতে পারবে—'

—'কিন্তু আমার বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যাবে না ?'

'একটুও না। আমি তোমাকে ঠিক সাতটার সময় গলির মুখে পৌঁছে দেব।' রতীশ তাকে আশ্বাস দিল।

* * *

সদর দরজা খোলা ছিল। বাড়িতে পা দিতেই বিস্তি অবাক। বারান্দায় রীতিমত বৈঠক চলেছে। চৌকো টেবিলটার চারপাশে বাণীব্রত, কিরণ, মনোরমা এবং হিরণও উপস্থিত। কিরণের হাতে তু-তিনটে কাগজ এবং আরো কি সব বস্তু। খুব হৈ-চৈ করে সে মা, বাবা এবং ছোট ভাইকে কি যেন বোঝাতে চাইছে।

—বিস্তিকে দেখে মনোরমা বলল,—'এই যে, এতক্ষণে ফিরলি মা ? সন্ধ্যে থেকে উনি দশবার করে খোঁজ করছেন।'

বিস্তি মুখ নীচু করে বলল,—'কাল থেকে রিহার্সাল চলছে বাবা। সামনের সপ্তাহেই তো ফাংশন। আর কটা দিন হয়তো এমনি দেরী হবে। তার জন্যে তুমি কিছু বল না বাবা।'

বাণীব্রত সস্নেহে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। দিনে দিনে কুমোরের হাতে গড়া প্রতিমার মত মেয়ের রূপ যেন খুলছে। কতটুকুই বা বয়েস। জীবনের গলি ঘুঁজি, বাঁকা পথ কিছুই জানে না। সন্ধ্যের পর বিস্তি বাড়ি না ফিরলে তিনি তাই ব্যস্ত হয়ে উঠেন।

মেয়েকে বললেন,—'সামনে তোর পরীক্ষা আসছে বিস্তি। সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি না ফিরলে কখন পড়াশুনো করবি ? তা বেশ, আর কটা দিন যাক। ফ্যাংশনের পর তুই কিন্তু ঘরের বাইরে বেশী বেরোস নি মা।

তু দিন হল বাণীব্রত অফিসে যান নি। সেই অসুস্থ হবার পর থেকেই ঘরে আছেন। বিস্তি তাই কাছে এসে শুধোল,—'তোমার শরীর ভাল আছে তো বাবা ?'

—'সেই কথাই তো এতক্ষণ হচ্ছিল মা।' বাণীব্রত হেসে বললেন,

'কিরণ আজ রিপোর্টগুলো পেয়েছে। তেমন কোন গণ্ডগোল নেই। ভাবছি কাল থেকেই আবার অফিসে বেরুবো।'

'—কিছু পাওয়া না গেলেও তোমাকে সাবধানে থাকতে হবে।' কিরণ অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত বাপকে সতর্ক করে দিতে চাইল। বলল,—'ডাক্তার সিন্‌হা আমাকে তাই বললেন। চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিছু বিধি-নিষেধ তোমাকে মেনে চলতে হবে বাবা।'

'—নিশ্চয়।' বাণীব্রত স্বীকার করলেন। বুড়ো বয়সে অনিয়ম কেন সহ্য হবে বল? এখন ভাঙা শরীর, জোড়াতালি দিয়ে যে কটা দিন কাটে। তবে তোর ভরসাতেই আছি কিরণ। তেমন কিছু হলে বুড়ো মা-বাপকে নিশ্চয় দেখবি।'

বিন্তি বলল—কিন্তু চন্দনপুরে চলে গেলে মেজদাকে তুমি কোথায় পাবে বাবা? ওকে তো কলকাতাতেই থাকতে হবে।'

—'তাতে ক্ষতি নেই।' বাণীব্রত একটুও চিন্তা না করে জবাব দিলেন, 'চন্দনপুর তো দূরে নয়। মোটে এক রাত্তিরের পথ। চিঠি লিখলেই কিরণ চন্দনপুরে গিয়ে বুড়ো মা-বাপকে দেখে আসবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে মিলন ঘরে ঢুকল। তাকে খুব উত্তেজিত এবং চঞ্চল দেখাচ্ছিল।

বাণীব্রত ছেলের দিকে তাকিয়ে শুধল,—'কি ব্যাপার মিলু? তোকে খুব ব্যস্ত আর ছটফটে দেখাচ্ছে।'

মিলন একটা চেয়ারের উপর ধপাস করে বসে পড়ে বলল,—'আমি একটা ভালো চাকরি পাচ্ছি বাবা। মানে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ, মনে হয় এটা পেয়ে যাব।'

—'তাই নাকি? মনোরমা উজ্জ্বল মুখ করে বলল। 'এ তো মস্ত সুখবর মিলু। এত দিনে ঠাকুর বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন।'

—'চাকরি হলে তোকে কোথায় জয়েন করতে হবে? এই কলকাতায় না আরো দূরে?'—বাণীব্রত প্রশ্ন করলেন।

—'অনেক দূরে বাবা। আমার চাকরিটা সাত-সমুদ্দুর তের নদীর পারে—'

—'তার মানে? চাকরি করতে তোকে কোথায় যেতে হবে রে মিলু?' মনোরমা চিন্তিতভাবে শুধোল।

মিলন ধীরে ধীরে বলল,—'ইউনাইটেড স্টেটস্ মানে আমেরিকায় মা।'

॥ নয় ॥

সকলে চুপ।

দু-তিন মিনিট কারো মুখে কথা নেই। মনে মনে কেউ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিরণ, হিরণ, বিস্তি এমন কি মনোরমা পর্যন্ত। বাণীব্রতও ভাবতে পারেন নি তার বড় ছেলে মিলু এতদিন পরে ইঞ্জিনীয়রের চাকরি নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দেবে। ইদানীং বাণীব্রত অবশ্য ওর কথা তেমন চিন্তা করতেন না। কত জিনিস নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন? ভাবনা চিন্তার তো শেষ নেই। বর্ষার গাছগাছালির মত কেবলি গজাচ্ছে। এক একটা এমন বেড়ে ওঠে, যে অন্যগুলো তার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। মিলনের ব্যাপারটাও তেমনি, ছেলে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেরিয়ে এল, তখন বাণীব্রত দিনরাত ওর কথা ভাবতেন। কবে মিলন চাকরি পাচ্ছে, এই ছিল চিন্তা। প্রথম প্রথম উৎসাহ করে মিলন চাকরির দরখাস্ত পাঠাত। ইণ্টারভ্যু দিয়ে বাড়িতে ফিরে সাড়ম্বরে গল্প-টল্প করত। চাকরিটা সে নির্ঘাত পাচ্ছে, এমনি একটা ভাব। ছেলেটার মুখে তখন হাসি লেগে থাকত। ভোরবেলার তাজা ফুল-টুলের মত সুন্দর হাসি। তারপর প্রায় দু-বছর ধরে মিলন বেকার হয়ে রইল। কত চেষ্টা, ইণ্টারভ্যু। তবু ইঞ্জিনিয়রের চাকরি আর জুটল না। শেষে এই কেরানীর পোষ্টের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা একদিন বাড়িতে এল। চিঠির কথা শুনে বাণীব্রতর সেদিন ভাল লাগেনি, তার মিলু, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা ছেলে মিলন শেষে একটা সাধারণ কেরানী হতে চলল, মিলন চাকরি পেয়েছে একথা কতদিন অফিসে বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলতে পারেন নি। সেই ছেলে এতদিন পরে

ইঞ্জিনিয়রের চাকরি নিয়ে বিদেশে যাচ্ছে। কথাটা শুনে বাণীব্রতর মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব। দুঃখ-আনন্দ মিশ্রিত এক বিচিত্র উত্তেজনা।

প্রথমে বিন্তিই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। প্রায় নাচের ভঙ্গিমায় এক পাক ঘুরে সে সহর্ষে বলে উঠল,—'উঃ! আমার কি আনন্দ হচ্ছে। সত্যি, তুমি আমেরিকায় যাচ্ছ বড়দা?'

মনোরমা ছেলের মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে ছিল। মিলুকে আজ তার নতুন লাগছে, কতদিন যেন ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকায় নি মনোরমা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর চোখের দৃষ্টি, কপালের রেখা, চিবুকের দৃঢ়ভঙ্গি ঠোঁটের হাসি কিছুই লক্ষ্য করে নি। অত বড় ছেলেকে এখনও ঠিক শিশুই ভাবে মনোরমা, আর তাই বা মনে করবে না, কেন? মিলুর মুখের দিকে তাকালেই আজও তার প্রথম মাতৃত্বের সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে। সে মা হতে চলেছে জানাজানি হবার পর দেহে মনে কি আশ্চর্য উত্তেজনা। স্বামী স্ত্রী দু'জনে এই নিয়ে কত কথাবার্তা। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে গল্প। ছেলে হবার আগেই ওর কি নাম রাখবে তাই নিয়ে মনোরমা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বাণীব্রত হেসে বলতেন,—রাম জন্মাবার আগেই সাতকাণ্ড রামায়ণ গাইতে চাও নাকি?'

—'আহা! আমি কি তাই বলছি?' মনোরমা চোখ ঘুরিয়ে সলজ্জ হাসল। 'আমি তো শুধু একটা নাম ঠিক করে রাখতে চাই গো।'

—'আর ছেলে না হলে?'

—'না গো না,' স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে মনোরমা উত্তর দিত, 'আমি জানি,' সে ফিসফিস করে মৃদুস্বরে বলত,—'তুমি দেখো, ঠিক খোকা হবে আমার।' সেই মিলু। তার বড় ছেলে মিলন। এখন চব্বিশ বছরের এক সুপুরুষ যুবা, ছেলেবেলায় ওকে আরো সুন্দর দেখাত, তার মত ফর্সা গায়ের রং। বড় বড় চোখ। কোঁকড়ান এক মাথা চুল। সামনে তাকিয়ে মনোরমা যেন ছোট্ট মিলুকেই দেখছিল। দেড়-দু বছরের এক দামাল শিশু ... টলতে টলতে এখনই তার কোলের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বিন্তির কথা শুনে মিলন হাসল। বলল,—'কেন রে? আমি আমেরিকা যাব একথা তোর বিশ্বাস হয় না বুঝি?'

—'দূর। তা কেন? আমি বলছিলাম আমাদের ক্লাসের রঞ্জার কথা।' বিন্তি মাথা দুলিয়ে জবাব দিল। ফের মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,— 'জানো মা রঞ্জার বড্ড দেমাক।'

—'দেমাক কেন রে বিন্তি?' মনোরমা হেসে শুধোল।

—'কেন আবার? ওর দাদা যে ইংলণ্ডে থাকে। কি চাকরিবাকরি করে সেখানে, তাই রঞ্জার মুখে খালি লণ্ডনের গল্প মা, শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেল, আর তাই নিয়ে মেয়ের কি দেমাক, মাটিতে পা যেন পড়ে না।'

মিলন মুচকি হেসে বলল,—'তুই এবার ক্লাসে গিয়ে আমেরিকার গল্প শুরু কর। দেখবি রঞ্জার কথা আর কেউ শুনতেই চাইছে না।'

'গল্প পরে করব', বিন্তি ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কাল ক্লাসে তোমার ফরেন যাওয়ার কথাটা সকলকে জানিয়ে দিই।' একটু থেমে সে ফের শুধোল— 'আচ্ছা বড়দা, যাওয়ার আগে তুমি খবরটা পেপারে ছাপাবে না?'

বিন্তিটা নেহাৎ ছেলেমানুষ। ওর কথা শুনে মিলনের মজা লাগছিল। বলল,—'সে তো পরের কথা, আগে অন্য সব ব্যবস্থা করি।'

মনোরমা বলল,—'যাওয়ার আগে আমাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাস মিলু, অত দূর দেশে যাবি। মায়ের পুজোর ফুল একটু সঙ্গে রাখবি বাবা।'

হিরণ এমনিতেই চুপ চাপ....সব কথাতে নিস্পৃহ। কোনো ব্যাপারেই মাথা গলায় না, বাড়িতে চুপচাপ থাকে। ইদানীং আরো বেশী স্তব্ধ হয়ে গেছে। সে হঠাৎ মুখ তুলে বলল—'তুমি শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় চললে বড়দা? ধনতন্ত্রের দেশে গিয়ে চাকরি করবে?'

—'ধনতন্ত্রের দেশে? তার মানে? কি বলতে চাইছিস তুই?'

হিরণ একটুও না দমে জবাব দিল,—'ঠিকই বলছি বড়দা। তুমি নিজেও জান ইউনাইটেড ষ্টেটস একটা পুঁজিবাদী দেশ। যে দেশে পুরো সমাজ-ব্যবস্থা পুঁজিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, সেটা ক্যাপিট্যালিষ্ট কান্টি

ছাড়া আর কিছু নয়।' মুখ নামিয়ে সে ফের বলল,—'ধনতন্ত্রের যে মেসিনটা সেখানে চালু তুমি তারই একটা নাটবল্টু হবে বড়দা।'

—'চুপ কর তুই,' মিলন ভাইকে ধমক দিল। 'কতকগুলো বুলি শিখেছিস শুধু। সে দেশের কতটুকু জানিস? হাজার হাজার মাইল দূর থেকে বইয়ের দু-পাতা পড়ে একটা দেশকে জানা যায় না।'

বাণীব্রত মধ্যস্থতা করে বললেন,—'হিরুর কথায় তুই মিছিমিছি রাগ করছিস মিলু। ও তোর ছোট ভাই। এখনও স্কুলের গণ্ডী পেরোয় নি। কতটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি? একটু থেমে আবার ছোটছেলেকে শুধোলেন, —'তোর বড়দা কি অন্যায় কাজটা করছে হিরু? এতদিন চেষ্টাচরিত্র করেও এদেশে একটা ইঞ্জিনিয়রের চাকরি জোটাতে পারে নি। এখন ভালো কাজ নিয়ে যদি অন্য দেশে যাবার একটা সুযোগ পায়, তাহলে সেটা ছেড়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের পরিচয় হবে?'

কিরণ এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। চুপ করে শুনছিল। সে এবার মুখ উঁচু করে বলল,—'হিরুর সঙ্গে আমিও একমত বাবা, কিন্তু আমার যুক্তিটা আলাদা। শুধু চাকরি করার জন্য নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি ঠিক সমর্থন করতে পারি না।'

মিলন ভুরু কুঁচকে মেজভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। 'বেশ তো, তোর বক্তব্যটা শুনি। হিরুর আপত্তি ধনতন্ত্রের দাস হতে যাচ্ছি বলে। আর তুই অখুশি, কারণ আমি বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছি। তাই না?'

কিরণ হেসে বলল,—'তুমি মিছিমিছি চটছ দাদা। আমার কথাটা আগে শোন, ইউনাইটেড ষ্টেটসে চাকরি পেলে তুমি নিশ্চয় সেখানে যাবে। আমি কিম্বা হিরু কি তোমায় যুক্তি-তর্কের জাল বিছিয়ে ধরে রাখতে পারব?'

ভাইয়ের মিষ্টি কথায় মিলন একটু নরম হ'ল, শুধোল,—'তোর যুক্তিটা কি তাই বল দিকি?'

মাথার চুলে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে নিয়ে কিরণ শুরু করল,— 'আমার কথাটা এমনিতে সহজ, তেমন মারপ্যাঁচ কিছু নেই বলেই মনে হবে। কিন্তু এর মধ্যেও ভাবনা-চিন্তার বস্তু আছে দাদা। অবশ্য হিরুর মত আমি অত গোঁড়া নই। শুধু ধনতন্ত্রের দেশ বলেই কাউকে অস্পৃশ্য ভাবতে

পারি না। আমি বলতে চাই যে তোমার মত একটি ভালো বুদ্ধিমান ছেলের কাছ থেকে তার দেশ কি লাভ করল, সেকথা কি কেউ একবারও চিন্তা করছে? তুমি হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছ। ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষাতেও বেশ ভালো রেজাল্ট করেছ। কিন্তু যে দেশে তুমি জন্মেছ, যার জল-হাওয়া ফল-শস্য তোমাকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে, জীবনীশক্তি জুগিয়েছে, তার প্রতি কি তোমার কোনো কর্তব্যবোধ নেই দাদা?'

হিরুর কথার মধ্যে তীরের অগ্রভাগের মত একটা খোঁচা ছিল। সকলেই তা বুঝেছে, কিন্তু কিরণের বক্তব্যে অন্য মেজাজ, ভিন্ন সাড়া। কোথায় যেন একটা আবেদনের সুরও আছে।

বাণীব্রত শুনে বললেন,—'কিন্তু কর্তব্য-জ্ঞানটা কি শুধু তোর দাদার একার হবে, যে দেশে পড়াশুনো করে, ভালোভাবে পরীক্ষায় পাশ করে মিলুর মত ছেলে চাকরি পায় না, সে দেশের মানুষের এতখানি কর্তব্যবোধ আশা করা বোধহয় ঠিক নয় কিরণ।'

হিরু মুচকি হেসে বলল,—'এদেশে চাকরি-বাকরি এখন মগডালের রোদ্দুর বাবা। খবরের কাগজের পাতায় বিজ্ঞাপনের গায়ে মাঝে মাঝে ঝিলমিল করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মগডালের ছিটেফোঁটা রোদ্দুরে কারো কোনো উপকার হয় না।'

মিলন ঘাড় বেঁকিয়ে ছোটভাইকে দেখছিল, সে বলল,—'হিরুটা বড় বড় কথা শিখেছে বাবা। আমার তো ওকে ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড্ বলে মনে হয়। অথচ এই বয়সে এত হতাশার কোনো মানে হয় না।'

কিরণ বলল,—'এদেশে এখন হতাশার জোয়ার বইছে দাদা। একটা ব্যাধিও বলতে পার। কোনো কাজে উদ্যম নেই, যে কোনো প্রচেষ্টাকেই হতাশা গ্রাস করতে চায়। সবাই ভাবে কি হবে করে? এই তো অবস্থা। আসলে জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়াই কঠিন। আমার বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটাই তোমাকে পরে বলতাম।'

—'কেমন করে মানুষ আশা করবে বলতে পারো? হিরু আগের মতই ব্যঙ্গ করে কথা কইল। 'এই সমাজ ব্যবস্থায় হতাশা অনিবার্য,—আসতে বাধ্য। ঘরে ঘরে বেকারী, দারিদ্র্য, জীবন-ধারণের তিক্ত গ্লানি।

ছুঃখ-কষ্ট ঠিক অক্টোপাশের মত মনের রসটুকু নিংড়ে নিচ্ছে। মানুষকে নিশ্বাস ফেলার অবসর দিচ্ছে না।' একটু থেমে সে ফের শুরু করল,—'তুমি পড়াশুনা পরীক্ষা পাশের কথা বলছিলে বাবা? কিন্তু একবার ভেবে দেখ, ও ছুটো কি প্রায় প্রহসনে পর্যবসিত হয়নি? আমরা কি পড়ি, কি লিখি, কেমনভাবে পাশ-টাশ করি সেকথা শুধু দেশের লোকে নয়,—এবার বিদেশের মানুষও টের পাবে।'

—'বেশ তো, তাহলে কি করতে হবে বল?'—

—'এই পুরনো পচা সমাজ-ব্যবস্থায় কিচ্ছু হবে না মেজদা, একে ঢেলে সাজানো দরকার। সবকিছু ভেঙেচুরে একটা নতুন পৃথিবী গড়তে হবে।'

কিরণ হা-হা করে হেসে উঠল। বলল,—তোর কথাগুলো শুনতে খুব ভালো হিরু। কিন্তু কাজের বেলায় ধোপে টিকবে না। অবশ্য তোর সঙ্গে আমি একমত যে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অনেক গলদ। সমস্ত সিস্টেমটাই কেমন গতিহীন, মন্থর, জগদ্দল পাথরের মত আমাদের বুকে প্রায় চেপে বসেছে। নিশ্চয় এর পরিবর্তন দরকার। কিন্তু পরিবর্তন মানেই কি সব কিছু ভাঙতে হবে? আমাদের যা আছে, তাকে ঘষে-মেজে রং বদলে নিলেও তো নতুন করা যায় হিরু। আমি সে কথাই বলি। দেশে দারিদ্র্য আছে ঠিকই, কিন্তু পাগলের মত সব কিছু ভাঙতে শুরু করলেই তো গরীবের মাটির সরা সোনার বাটিতে পরিণত হবে না? আমি স্বীকার করি দেশে বেকারী ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে, তার জন্য এখনই কিছু করা দরকার, চাই নতুন কাজকর্ম। চাকরি-বাকরির সুযোগ। কিন্তু সেই সুযোগ সৃষ্টি করতেও একটা সুস্থ অনুকূল পরিবেশ দরকার হিরু। ধ্বংসের আবহাওয়ায় তেমন পরিবেশ কখনও সৃষ্টি হতে পারে না।'

উত্তরে হিরু উত্তেজিতভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মনোরমা তাকে প্রায় ধমকে থামিয়ে দিল। বলল—'আঃ। চুপ কর দিকি। কি চেঁচামেচি শুরু করেছিস তোরা। তোদের তর্কাতর্কিতে আমার যে মাথা ধরবার জোগাড় হ'ল।'

বিস্তি কোমরে হাত রেখে বলল,—'তোমার ছোট ছেলেটিকে একটু থামাও মা, তখন থেকে বড়দের সঙ্গে কেবল সমানে তর্ক করছে।'

হিরু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বোনের দিকে একনজর তাকিয়ে উঠে পড়ল। মনোরমা বিরস মুখ করে মেয়েকে বলল,—'দিলি তো ছেলেটাকে রাগিয়ে। কেন যে ওর সঙ্গে অত লাগিস বাপু।'

মিলন ঈষৎ চিন্তিত ভাবে বলল,—'আচ্ছা, হিরুটা কেমন হয়ে গেছে, তাই না-রে কিরণ? কেমন বড় বড় সব কথা বলে, গম্ভীরমুখে তাকায়। দিন-রাত্তির কি এইসব চিন্তা-টিন্তা করে নাকি? অথচ বছর দেড়-দুই আগেও কি রকম ছেলেমানুষের মত কথা বলত। আমার কাছে কম আব্দার করেছে? কবে যে এতবড় হয়ে গেল, আমরা বুঝতেই পারলাম না।'

বিন্তি মুখ তুলে বলল,—'জানো বড়দা, পড়ার ঘরে অনেক রাত্তির অব্দি ছোড়দা কি-সব বই-টই পড়ে!'

মনোরমা হেসে বলল—'তুই থাম দিকি। ওসব ওর পড়ার বই-টই হবে মিলু। অনেক রাত্তির পর্যন্ত না পড়লে হিরু কি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারত?'

—'পড়ার বই নয় মা। আমি জোর করে বলতে পারি।' বিন্তি মাথা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে বলল, একদিন ঘরে ঢুকে দেখি ছোড়দা খুব মনোযোগ দিয়ে কি একটা বই পড়ছে, আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে বালিশের নীচে রেখে দিল।'

বিন্তির কথা বলার ভঙ্গি দেখে মিলন না হেসে পারল না। সে বলল,—'তাহলে কোনো নভেল-টভেল হ'বে। পাছে তুই পড়তে চাস, তাই চটপট লুকিয়ে ফেলেছে।'

—'উহুঁ, ব্যাপারটা অত সহজভাবে নেওয়া ঠিক হবে না দাদা', কিরণ বেশ ভারিক্কী চালে মন্তব্য করল। হিরু লুকিয়ে কি বই পড়ে আমাদের জানা উচিত, আজকাল রাজনীতির গন্ধ মাখানো নানা ধরণের বই বেরিয়েছে বাজারে। সাধারণতঃ লাতিন আমেরিকা কিংবা আফ্রিকার কোনো অনগ্রসর দেশ, তার নানা সমস্যা অথবা সেই সব দেশের মুক্তি-সংগ্রামী কোন রাজনৈতিক নেতার বৈপ্লবিক জীবনকে উপজীব্য করে এই বইগুলো লেখা হয়। হিরুর বয়সী স্কুল-কলেজের ছেলেরা এই ধরণের বই পড়তে ভীষণ ভালবাসে। অবশ্য মোহটা ঠিক কিসের তা সঠিক বলতে পারব না। তবে

মনে হয়, বইগুলোর মধ্যে যে নতুন ধরণের রাজনীতির কথা, সংগ্রামের গল্প আছে—সেটাই ওদের এমন গভীরভাবে আকর্ষণ করে।'

বাণীব্রত মনোযোগ দিয়ে মেজছেলের কথা শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ স্বগতোক্তির মত বললেন,—'হিরুর চাল-চলন আমারও ভাল লাগে না। কেমন কেমন মনে হয়।' ফের চিন্তিতভাবে কিরণকেই যেন আদেশ করলেন, —'তুই তো ইচ্ছে করলে ওর বইপত্তরগুলো ঘেঁটে দেখলে পারিস। আজে-বাজে বই পড়ে ছেলেটা আবার না বিগড়ে যায়।'

মনের বিরক্তি আর চেপে রাখতে না পেরে মনোরমা স্পষ্ট বলল,—'তুমি থাম দিকি। ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে শুরু করলে। ওসব অলক্ষুণে চিন্তা ছাড়। হিরু আমার সোনার টুকরো ছেলে ফি-বছর ক্লাসের পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছে। এমনিতেও খুব বাধ্য। কথার উপর কোনোদিন জবাব দেয় না। বিগড়ে অমনি গেলেই হল?'

বাণীব্রত বড় আর মেজ দুই ছেলেরই মুখের উপর চোখ বুলোলেন। তার স্বপক্ষে দুটো কথা ওরা নিশ্চয় মাকে বলবে। বাণীব্রত তাই আশা করছিলেন। কিন্তু মিলন আর কিরণ দুজনেই চুপ করে রইল। কোনো কথা বলল না।

বিন্তি গল্পের আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঈষৎ ঠোঁট উল্টিয়ে কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে বলল,—'তুমি মিছিমিছি মাকে চটিয়ে দিচ্ছ বাবা। ছোড়দার নিন্দে মা একটুও সইতে পারে না। কেন ওসব কথা বলছ?'

মনোরমা ভুরু কুঁচকে বিন্তির মুখের দিকে তাকাল। এতবড় ধিঙ্গি মেয়ে কিন্তু দিন দিন কথাবার্তার কি ছিরি হচ্ছে। গুরুজনদের পর্যন্ত এতটুকু সমীহ করে না। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ির লোকে বেহায়াপনা দেখলে কি ছেড়ে কথা কইবে? বলবে, মা-বাপের কাছ থেকেই এমনি শিক্ষা পেয়েছে।

মায়ের চোখের সামনে বিন্তি আর দাঁড়াল না। সে চলে যেতে মনোরমা শুধোল,—'বিদেশের এই ভালো চাকরিটার খবর তোকে কে দিল রে মিলু? নিশ্চয় তোর জন্য কেউ চেষ্টা করেছে?'

—'বারে! চেষ্টা করেছে বৈকি।' মিলন একগাল হাসল। 'নইলে

অত দূর দেশের চাকরির খবর কেমন করে পাব মা? এখানে বসে তাই কি সম্ভব?'

বাণীব্রত কৌতূহল প্রকাশ করে বললেন,—যোগাযোগটা তাহলে কে করল?' তোর কোনো বন্ধু? কই তার নাম বললি না তো?

—'নাম বললেও তুমি ওকে চিনবে না বাবা। স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তারপর ও অবশ্য এখান থেকে চলে গিয়েছিল। ক'বছর বিলেতে পড়াশুনো করেছে। এখন বড় কোম্পানীর কলকাতা ব্রাঞ্চের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার।'

—'ওহো! বুঝতে পেরেছি।' মনোরমা মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'ওর নাম তো অপরেশ। তুই একদিন ছেলেটির কথা আমার কাছে গল্প করেছিস। তা, সে তো মস্ত চাকরে। মাস গেলে দেড় হাজার টাকা মাইনে পায়। তাই না রে মিলু?'

—'ঠিক ধরেছ মা।' মিলন তারিফ করার ভঙ্গিতে বলল, তোমার দেখছি সব কথা মনে থাকে। কিচ্ছুটি ভোল না।'

মনোরমার মনের বিরক্তি কখন ধুয়ে মুছে গেছে। সে খুশির সঙ্গে বলল—'ছেলেটি বড় ভালো। নইলে যা দিনকাল। কে কার কথা মনে রাখে? এতদিন পরে স্কুলের বন্ধুর জন্যে কার মাথাব্যাথা করে বল?'

মিলন বলল,—'আসল যোগাযোগটা অবশ্য অপরেশ করেনি, ওর এক মাসতুতো ভাই স্টেটসে থাকে। তার স্ত্রী আমেরিকান মেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, চাকরিটা সেই ভদ্রমহিলার রেকমেণ্ডশনের জন্যই হচ্ছে।

ব্যাপারটা এতক্ষণে বাণীব্রতর কাছে পরিষ্কার হল। অপরেশ তার মাসতুতো ভাইকে মিলুর কথা লিখেছিল। আর সেই সুবাদেই মিলু চাকরিটা পাচ্ছে। নইলে কলকাতায় বসে আর মহাদেশের কোনো শহরে চাকরি পাওয়া কি সম্ভব? এ তো প্রায় লটারি প্রাপ্তির মত অবিশ্বাস্য ঘটনা।

—'অনেকদিন ধরেই কথাটা বলব ভাবছি মিলু।' মনোরমা প্রস্তাব করার আগে যথারীতি ভণিতা করল। 'অপরেশকে একদিন আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আয়। এই ধর, কোনো ছুটির দিনে দুপুরে ওকে খেতে বলবি কিম্বা রাত্তিবেলায়,—তোর যেমন ইচ্ছে।'

—'অপরেশকে একদিন নেমন্তন্ন করতে বলছ ?'

—হ্যাঁ তাই তো করা উচিত। মনোরমা সহাস্যে তাকাল। ছেলেটা তোর জন্যে এত করছে। তাই আমাদেরও তো কিছু করা দরকার। ওকে একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আয় মিলু, কেমন ?'

প্রস্তাবটা মিলনের মনে ধরল। সত্যিই তো, অপরেশের কাছে সে নানাভাবে ঋণী, আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এমনি একটা উপায় ছাড়া অন্য কি পথ আছে ? কিন্তু অপরেশ এমনি কি তার কথায় রাজি হবে ? বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়ার ব্যাপারে ওর একটুও উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না। অপরেশ যেখানে যেতে চায় মিলন তার খবর রাখে। বিকেলের খেলার মাঠের মত হোটেল, বার আর রেঁস্তোরাগুলি বেলা পড়ে এলেই ওকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকে। এই তো আজই সে তাকে ফোনে বলছিল,—'আমেরিকা যাওয়ার আগে আমাকে একদিন মাল খাওয়াবি না মিলন ? উহুঁ জিন, হুইস্কি কিংবা ব্র্যাণ্ডি নয়। শ্যাম্পেন,—ভালো শ্যাম্পেন খাওয়াতে হবে কিন্তু।'

অবশ্যই মাকে এসব কথা বলা যায় না। তাই মুখে সে বলল,—বেশ তো মা। অপরেশকে একদিন কথাটা বলি। যদি আসতে রাজি হয় তখন তোমাকে জানাব।'

—'আহা! রাজি হবে না কেন ? তুই একটু জোর করবি মিলু।' মনোরমা চোখ ঘুরিয়ে একবার কিরণের মুখের দিকে তাকাল। ফের বলল,—'লাজুক ছেলে, এ বাড়িতে কোনোদিন আসেনি। হঠাৎ নেমন্তন্ন করলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা তো করবেই। স্নেহে-মমতায় মনোরমা যেন অকস্মাৎ ছেলের বন্ধুর উপর গদগদ হয়ে উঠল।

* * * *

পরদিন শনিবার। সন্ধ্যের মুখে সিনেমা হল থেকে দুজনে বেরোল। এলিটে কি একটা ইংরেজী বই চলছিল। মিলনের খুব সিনেমার নেশা। শনিবার ম্যাটিনী শোতে সিনেমা দেখবার জন্য চৌরঙ্গীপাড়ায় সে নিয়মিত আগন্তুক। এই বইটা অপরেশকে দেখাবে বলে মিলন আগে থেকেই দুখানা ভালো টিকিট সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু ছবিটা নেহাৎই বাজে। দুজনের কারো ভালো লাগে নি।

রাস্তায় নেমে অপরেশ বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। ঘাড়ের পেশীতে, কানের পাশের রগে, মাথার চুলে আঙুল ঘষে ম্যাসাজ করল। বলল,—'ধুত্তোর! একবারে রটন্ জিনিস। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। চল একটু পার্ক স্ট্রীটে ঘুরে যাই।'

এই ঘনায়মান সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটে যাওয়া মানেই অপরেশ ড্রিঙ্ক করবে। কোনো বার অ্যাণ্ড রেঁস্তোরায়, যেখানে বিলিতি বাজনার সিমফনী ঘরের মধ্যে এক বিচিত্র মায়াজাল রচনা করে। সেখানে ঢুকে এক বোতল বিয়ার কিংবা এক পেগ হুইস্কি নিয়ে সে বসবে। এবং বন্ধুকে সঙ্গ দেবার জন্য মিলনকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু-এক ঢোক গিলতে হবে। কারণ সত্যিই মদ সে খেতে চায় না। তার কেমন বিস্বাদ মনে হয়। একটুও ভালো লাগে না।

মিথ্যা চেষ্টা। তবু বন্ধুকে নিবৃত্ত করার জন্য মিলন বলল,—'কেন, আবার পার্ক স্ট্রীটে যাবি?' খামোকা কতকগুলো টাকা গচ্চা যাবে।'

অপরেশ শুনল না। সে বলল,—'যাক গে। তুই আয় তো আমার সঙ্গে।' তার হাত ধরে অপরেশ প্রায় আকর্ষণ করল।

*　　　*　　　*

সমস্ত ঘরটায় এখন উদ্দাম আসর। সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস ভারী। চোখ দুটো কেমন জ্বালা করে। প্রায় বিশ-পঁচিশ জন ছেলেমেয়ে খানিকটা দূরে একসঙ্গে নাচছে। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি। কোমর দুলিয়ে হাত নেড়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ সঞ্চালন করে ওরা টুইস্ট, গোগো, শেক অথবা রাম্বা নাচে মত্ত। বাদ্যযন্ত্রে হাল্কা বাজনার সুর। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে একজন গাইছে।—

—'লভ্ লভ্ মি ডু,
আই নো, আই লভ্ য়ু—
আই উইল অলওয়েজ বি ট্রু
সো প্লীজ লভ্ মি ডু।'

অপরেশ বলল,—'এটা জ্যাম সেসন। সাধারণতঃ টিন-এজাররা এই সময় আসে। নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় করে। অবশ্য ওরা এখনই চলে যাবে। সাড়ে ছটার পর দেখবি হল খালি হয়ে গেছে।

মিলন কম বয়সী ছেলেমেয়েদের দেখছিল। কত বয়স হবে ওদের? পনের-ষোল থেকে বড়-জোর কুড়ি পর্যন্ত। ফড়িঙের মত চঞ্চল মন। যেন মহানন্দে ঘাসে ঘাসে উড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ একটি মেয়ের দিকে নজর পড়তেই সে প্রায় ভূত দেখার মত চমকে উঠল। আশ্চর্য! বিন্তি না? একটি ছেলের সঙ্গে তালে তাল রেখে সে নাচছে, কিন্তু তাই কি সম্ভব? বিন্তি এখানে কেমন করে আসবে? ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখেও তার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না।

অপরেশ মুচকি হেসে বলল,—'কি দেখছিস অমন করে? মাইরি, ছুঁড়িটার ফিগার ভারী সুন্দর। কেমন সরু কোমর, আর কি নাইস চেহারা। তাই না রে?'

ঠিক বোবা ধরা মানুষের মত মিলনের মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বের হ'ল। মাথার ভিতরটা কেমন জং ধরা লোহার মত ভোঁতা। কানের পাশের রগ দুটি ঈষৎ গরম। তার সামনে বিন্তি তখনও নাচছে। উদ্ভিন্ন যৌবনা কমনীয় তনু। ক্ষীণ কটি সাপিনীর মত পিছনে ফিরছে। আর অপরেশ? এতক্ষণ সে বিন্তির যৌবনপুষ্ট দেহটাকে দু'চোখ দিয়ে গিলছিল নাকি? আবার তাকেও কিনা নিজের দলে টানতে চায়। ছিঃ।

## ॥ দশ ॥

মিলনের মুখের উপর একটা অস্পষ্ট মেঘ ভাসছিল।

তার মনের আয়নায় বিন্তি আর সেই ফর্সা সুন্দর ছেলেটার মুখখানা বার-বার প্রতিফলিত হল। সে অন্যমনস্কের মত অনেক কিছু চিন্তা করছিল। তার দৃষ্টি সামনের ছোট টেবিলটার দিকে,—যেখানে জোড়া শালিখের মত দুটি মেয়ে-পুরুষ মাথা নুইয়ে ফিসফিস করে কি সব কথা বলছিল, কিম্বা আরো দূরে থামের কাছের ঐ বড় টেবিলটার উপর। আসলে মিলন কার দিকে তাকাল, বা কি দেখছিল ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

অপরেশ বন্ধুর মুখের উপর চোখ রেখে শুধোল,—'কি হল বল দিকি তোর ? ছুঁড়িগুলো চলে যেতেই কেমন মিইয়ে গেলি। তারপর থেকেই চুপচাপ,—কি যেন ভাবছিস ?'

—'দূর! কি ভাবব আবার ?' মিলন নড়েচড়ে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। ফের ঘাড় তুলে এদিকে-ওদিক তাকিয়ে বলল,—'কি খাবি, এবার অর্ডার দিয়ে ফেল।'

—'সে কথাই তোকে জিজ্ঞেস করছি।' অপরেশ পাল্টা জবাব দিল। ঈষৎ রহস্য করে শুধোল,—'কি চলবে তোর ? হুইস্কী, না ব্র্যাণ্ডি ?'

—'কিছুই না।' মিলন নিরাসক্ত গলায় উত্তর দিল। বলল,—'এখন ড্রিঙ্ক করতে ইচ্ছে করছে না রে। আমি বরং ঝাল-চিকেন কিম্বা ফ্রায়েড-চিংড়ি খেতে পারি।'

—'খেপেছিস ?' অপরেশ হাল্কা কথায় ওর আপত্তি খণ্ডন করতে চাইল। চোখ ঘুরিয়ে মিষ্টি হেসে বলল,—'বারে ঢুকে মদের গ্লাসে চুমুক দিবি না ? শুধু মুরগীর মাংস আর চিংড়ি মাছভাজা খেয়ে চলে যাবি ? তাই কি কখনও হয় ?'

—'সত্যি বলছি।' মিলন প্রায় অনুনয় কলে বলল—

—ডিঙ্ক করতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না রে।

—'খুব ইচ্ছে করবে।' অপরেশ জোর করল। 'বারে ঢুকে মদ খেতে অরুচি ? এমন সব মজার কথা বলিস না।' ফের পরিহাসের সুরে বলল,—'কোনদিন এর পর বলবি ফুলশয্যের রাত্তিরে তোর নতুন বউয়ের পাশে শুতে ইচ্ছে করছে না।'

ইঙ্গিত করতেই অর্ডার নেবার লোকটি কাছে এসে দাঁড়াল। তার গায়ে শাদা কোট, গলায় বো-টাই, পরনে ফিকে নীল রঙের প্যাণ্ট। হাতের আঙুলে চেপে-ধরা শ্লিপবই। ডান হাতে পেন্সিল। লোকটির ঈষৎ আনত নম্র ভঙ্গি। ঠোঁটের ডগায় নরম ক্রিমের মত মিষ্টি মন ভেজানো হাসি।

অপরেশ দরাজ গলায় অর্ডার দিল,—'হুইস্কি।' ফের মিলনের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুচকি হেসে যোগ করল,—'আউর সাবকে লিয়ে জিন।' তারপর আঙুলের সাহায্যে মাপ দেখিয়ে বলল,—'ছোটা একঠো।'

আধ পেগের অর্ডার শুনে মিলন আশ্বস্ত হল। ইদানাং সে হোটেলে

অপরেশের সঙ্গে আসা-যাওয়া করে। তবু মদ খাওয়াটা ঠিক রপ্ত হয় নি। তার দৌড় ওই আধ পেগ পর্যন্ত। বেশী হলেই গড়বড়। রাস্তায় বেরোলেই পা থরথর করে কাঁপে। মাথার ভিতরটা কেমন শূন্য ফাঁকা মনে হয়। একটু বেশী পেটে গেলেই বিবমিষা চেপে ধরে। খানিকটা বমি না হলে স্বস্তি নেই। অথচ অপরেশ ? এক পেগ নিয়ে শুরু করে বটে। কিন্তু দ্বিতীয় পেগের অর্ডার তো অব্যর্থ। কোনদিন তিন পেগ, চার পেগ পর্যন্ত চলে। তবু অপরেশের হুঁশ থাকে। মাঝে মাঝে নেশার ঝোঁকে দু-একটা বেফাঁস কথা বলে, এই পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে হল-ঘরটা আবার ভরে উঠতে শুধু করেছে। হাল্কা বিলিতী বাজনার সুর সুগন্ধী আতরের মত সমস্ত ঘরময় ছড়ান। টেবিলগুলোতে মেয়ে-পুরুষ,—কোথাও জোড়া শালিখের মত দু'জন। কোন টেবিলে চার-পাঁচজনে মিলে হৈ-চৈ করছে। মিলন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কাছাকাছি একটি টেবিলও আর খালি নেই। সবগুলি পূর্ণ....ব্যস্ত বয়-বেয়ারার দল এদিক-সেদিকে দ্রুত আনাগোনা করছে।

সোডা ঢালতেই মদের পাত্রটি প্রায় ভরে উঠল। অপরেশ এক চুমুক দিয়ে বলল,—'তুই যে দেশে যাচ্ছিস, সেখানে লোকে জলের বদলে বিয়ার খায়। ঠাণ্ডা রাত্তিরে এক-আধ পেগ মাল না খেলে পরদিন সকালে জোর পাবি না, বুঝলি ?

—'মজার দেশ, কি বল্ ?' মিলন মুচকি হাসল, ফের ধীরে ধীরে বলল,—'আচ্ছা, আগে তো সে দেশে যাই।'

—'যাই মানে ?' অপরেশ ভুরু কোঁচকাল। যাওয়ার তো সব ঠিক। 'এভরিথিং সেটল্‌ড্।'

'ঠিক কোথায় ?' মিলন সন্দেহের সুরে বলল, 'এখনও তো পাকা খবর পাস নি।'

—'খবর পাকা জানবি।' অপরেশ গাল ফুলিয়ে ফু দিয়ে ধুলো বালি ওড়ানোর মত সকল সন্দেহ আর অবিশ্বাস দূর করতে চাইল। ফের বলল,—'এলসী বৌদি যখন লিখেছে, তখন চাকরি ঠিক হবে। আমি আশা করছি কাল কিম্বা আজ রাত্তিরেও কেবল্ পেতে পারি।'

মিলন কোন কথা বলল না। এক টুকরো মুরগীর মাংস মুখে দিয়ে বোধহয় তার নতুন চাকরির কথা ভাবতে লাগল।

অপরেশ মদের গ্লাস থেকে মুখ তুলে বলল,—'জানিস, লাস্ট ইয়ারে এলসী বৌদি একবার ইণ্ডিয়াতে এসেছিল। অদ্ভুত মেয়ে—যেমন ফুর্তিবাজ, তেমনি ফাজিল। আমাকে দেখে বলল,—'আরে তুমি এত ফর্সা, এমন সুন্দর দেখতে নাকি? আগে জানলে আমি কখনও তোমার ওই কালো দাদাটির বউ হই?'

মিলন হা-হা করে হেসে উঠল। 'ভদ্রমহিলা খুব রসিকা মনে হচ্ছে।' সে ছোট্ট মন্তব্য করল।

—'ভীষণ! তোর সঙ্গে আলাপ হলে দেখবি এলসী বৌদি কি রকম আমুদে।' মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে অপরেশ কি যেন চিন্তা করল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে প্রায় স্বগতোক্তির মত বলল,—'কলকাতায় তুই আর কটা দিন আছিস। বড় জোর টু অর থ্রি উইকস। তারপর ফ্লাই করবি।'

ফ্লাই! মিলন উৎসাহিত হয়ে জবাব দিল। 'আমার দিক থেকে কোন অসুবিধে নেই। এক হপ্তার মধ্যে আমি রেডী হতে পারি। কিন্তু আর কিছুই তো এখনও হয়নি। মানে পাসপোর্ট, ভিসা—।'

—'তার জন্যে তোর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ও সব ফর্মালিটিজের ভার আমার উপর। তুই শুধু সই-টইগুলো করে দিস। তাহলেই হবে।' অপরেশ বন্ধুকে নিশ্চিন্ত করল।

মিলন চুপ করে তার আসন্ন বিদেশ-যাত্রার কথা চিন্তা করছিল। সমস্ত ব্যাপারটা গাঢ় ঘুমে দেখা একটা স্বপ্নের মত। আর দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই সে তার মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, এই বাংলা, কলকাতার মাটি সব কিছু ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরের একটি দেশে পাখির মত গিয়ে পৌঁছবে। অথচ কয়েক দিন আগেও এমন একটা মধুর সম্ভাবনার কথা সে কি চিন্তা করতে পারত?

মিলন নিজের মনে হাসল। জীবন সত্যি একটা বিচিত্র নদী। তার বাঁকে বাঁকে এমন আরো কত বিস্ময় ছড়ানো। কে বা তা আগে জানতে পারে?

আকাশপথে আমেরিকা! মস্ত সামিয়ানার মত ছড়ানো অন্তহীন নীল গগনের নীচে, হাজার হাজার মাইল মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ভেসে যাওয়া। পায়ের তলায় মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, অজানা জনপদ, কত প্রাচীন গৌরবময় নগরীর জীর্ণ, ধ্বংস কঙ্কাল। হঠাৎ কলেজ জীবনে পড়া একটা বইয়ের কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ল। বইটার কিছু অংশ এখনও মুখস্থ; জেলে বসে বাবা তার আদরিণী ছোট্ট মেয়েকে পত্র লিখে পাঠাতেন। চিঠির পাতায় পাতায় বিশ্বের ইতিহাসের কথা। একটি চিঠির শেষে তিনি মেয়েকে লিখলেন—

........If you fly by aeroplane from India to Europe, you will pass over these ruins of Palmyra and Baalbak, you will see where Babylon was and many other places, famous in history and now no more.........

আচ্ছা সেও নিশ্চয় এই সব মৃত নগরীর উপর দিয়ে উড়ে যাবে। গভীর নিশীথে? অথবা রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবসে? অপরেশকে সেকথা এখনই শুধোবে নাকি?

হাতের উপর মৃদু চাপ পড়তেই তার ভাবনার সুতো ছিন্ন হল। অন্য কেউ নয়, অপরেশ। চোখের ইশারায় সে কি যেন ইঙ্গিত করছে। মিলন মাথা ঘুরিয়ে দেখল পুশ-ডোরের কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে কেমন উগ্র সাজ। কাটা ফলের গায়ে বসা ভনভনে নীল মাছির মত অপরেশের লুব্ধ দৃষ্টি কেবলি সেখানে আটকাচ্ছে।

তাকাতাকি হতেই অপরেশ মুচকি হাসল। 'কেমন দেখলি বল?' সে বাঁ-চোখটা ঈষৎ ছোট করে অর্থপূর্ণ একটি ইঙ্গিত করল।

মিলন ওর কথার মানে বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইল। অপরেশ ভুরু নাচিয়ে রহস্য করে বলল—'দাঁড়া, ছুঁড়িকে ডেকে আনি এখানে।'

—'ডেকে আনবি মানে? তুই ওকে চিনিস নাকি?'

—'কি জানি? অপরেশ আগের মতই রহস্য করল। একটু থেকে সে প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'আই নো শী ইজ এ ট্যাকসি।'

—'ট্যাকসি? কি বলছিস তুই?' ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য না হতে মিলন সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

—'ঠিকই বলছি।' অপরেশ একটুও দেরি না করে উত্তর দিল। 'পথে-ঘাটে ট্যাকসি দেখিসনি তুই? খালি থাকলে হাত বাড়ালেই দাঁড়ায়। আর এনগেজড হলে নাকের ডগা দিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে যায়। হাতছানি দিলে ফিরেও তাকায় না।'

অপরেশের কথা সত্যি, মেয়েটি খালি, অর্থাৎ ওর কোনো এনগেজমেণ্ট ছিল না। বেয়ারা গিয়ে বলতেই সে অবিকল ফাঁকা ট্যাকসির মতো টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

মাথা তুলে মিলন দেখল ওকে। ভালো করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কি উগ্র সাজ মেয়েটার ঠোঁটে! কাঁচা রক্তের মত টকটকে লাল রং। চোখে কাজল, ভুরু সুন্দর করে টানা। গলায় সুদৃশ্য পাথরের মালা। ফর্সা গায়ে কালো রঙের একটা জামা প্রায় চেপে বসেছে। পরনে শ্ল্যাকস। মেয়েটি কি জাত, কে জানে? অ্যাংলো পাঞ্জাবি কিম্বা বাঙালিও হতে পারে। মুখ দেখে বোঝা মুস্কিল।

অপরেশ ওকে নিজের পাশে বসাল। শুধোল,—'কি নাম বল তোমার?'

—আমার নাম অলকা,—'অলকা সোম।' সে পরিষ্কার বাংলায় জবাব দিল।

অপরেশ একদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছিল। যেন জহুরী আসল হীরে কিম্বা নকল হীরে যাচাই করছে।

—'কি দেখছেন অমন করে?' মেয়েটি বিলোল কটাক্ষ করল। ফের আব্দার করে বলল,—'কই আমার জন্য ড্রিংকসের অর্ডার দেবেন না?'

—'নিশ্চয়। অপরেশ সোজা হয়ে বসল।' 'কি খাবে বল? জিন?'

—'উহুঁ!' অলকা মাথা নাড়ল। 'জিন নয়, আমার জন্য হুইস্কি বলুন—'

মিলনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অপরেশ মুচকি হাসল। 'শুনলি তো, মেয়েরাও আজকাল জিন খেতে চায় না।' কয়েক সেকেণ্ড পরে ফের

বলল—'তবে সত্যি কথা হুইস্কির মেজাজই আলাদা। সে বেয়ারাকে ডেকে তক্ষুনি এক পেগ হুইস্কির অর্ডার দিল।

অলকা এসে বসতেই মিলন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য এবং অপরাধী মনোভাব। আর এই কল-গার্ল মেয়েগুলো এমন বিশ্রী, নির্লজ্জ। অলকা কখন আর একটু সরে অপরেশের খুব কাছে ঘন হয়ে বসেছে। ওর একটা হাত অপরেশের কোলের উপর। আবার ডানহাত বাড়িয়ে মেয়েটা ঠিক নতুন-বৌ, কিংবা প্রেমিকার মত ভঙ্গিতে অপরেশের বুকের বোতামগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কেউ কেউ তাদের দিকে তাকাচ্ছে। কি ভাগ্যিস। অলকা তার দিকে নজর দেয়নি। আর অপরেশও তেমনি। দিব্যি নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে রয়েছে। তার পাশে অলকা যেন রক্ত-মাংসের মেয়েমানুষ নয়। একটা লোমওলা পোষা জন্তু, কিংবা পাখি-টাকির মত। অপরেশের কোলে-পিঠে যেখানে খুশি উঠতে পারে।

মদের গ্লাসে অল্পই অবশিষ্ট ছিল, ছিটেফোঁটা তলানি। সুরাপানে মিলন এখনও আনাড়ি। তারিয়ে তারিয়ে খেতে জানে না। গ্লাস হাতে নিয়ে চক করে খানিকটা গিলে ফেলে। তারপর মুখের বিস্বাদ দূর করতে একটুকরো মাংস কিম্বা একটা ভাজা চিংড়ি চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।

বাকি মদটুকু গলায় ঢেলে মিলন বলল, 'এই আমি উঠি এখন, একটা জরুরী কাজ আছে রে।'

—'জরুরী কাজ?' অপরেশ ভুরু কোঁচকাল।

—ভীষণ জরুরী!' মিলন নিপুণ অভিনেতার মত মুখ-চোখের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে তার কাজের গুরুত্বকে দশগুণ বৃদ্ধি করতে চাইল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে ফের বলল—'পরে তোর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব, কেমন?'

'দাঁড়া একটু।' অপরেশ বাধা দিল। তারপর সে নিজেও উঠে দাঁড়াল। বলল—চল, তোকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

খানিকটা গিয়ে অপরেশ ফিসফিসিয়ে শুধোল,—'পালাচ্ছিস কেন, সত্যি করে বল দিকি? মেয়েটাকে দেখে ভয় পেলি?'

'—দূর। ভয় পাব কেন? তবে ওকে ভালো লাগে নি।' মিলন ধীরে ধীরে বলল।

অপরেশ বলল, 'জানিস, মেয়েটার নাম কিন্তু অলকা নয়। নামটা স্রেফ জাল। ওর আসল নাম আমি জানি।'

—'তার মানে?' মিলন অবাক হয়ে শুধোল। 'তুই ওকে চিনিস নাকি?'

—'চিনি বৈকি।' অপরেশ মুচকি হাসল। তবে দূর থেকে ঠিক ধরতে পারিনি। কিন্তু কাছে আসতেই চিনেছি। ওর নাম চপলা,—চপলা নন্দী। সার্কাস রেঞ্জে থাকে মেয়েটা। বাড়িতে ওর বুড়ি মা আর একটা খুবসুরৎ বোন আছে।'

—'সত্যি। তুই এত খবর জানিস ওর? অথচ মেয়েটা তোকে চিনতেই পারল না।'

—'আরো গোপন খবর দিতে পারি। অপরেশ খাটো গলায় বলল। ওর বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে উরুর পিছন দিকে একটা কাটা দাগ আছে। যাকে তোরা মার্ক অফ আইডেনটিফিকেশন বলতে পারিস।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মিলন মুচকি হাসল। বলল—'খুব হয়েছে। এরকম গোপন খবর আর বেশী জানবার দরকার নেই। এখন তাড়াতাড়ি ঐ ট্যাকসি-গার্লটাকে বিদেয় করে বাড়ি চলে যা।'

—'এত সকালে?' অপরেশ ভুরু কোঁচকাল। 'এই তো মোটে সাড়ে সাতটা। সবে সন্ধ্যে। আরো ঘণ্টাখানেক অন্তত থাকি। আচ্ছা, তুই যা এখন। বাই।' অপরেশ ডান হাতটা ক্ষণিকের জন্য উপরে তুলেই পিছন ফিরল।

বাড়িতে ফিরে মিলন সোজা বাথরুমে ঢুকল। তার মুখে মদের গন্ধ,—অন্যদিন রাস্তার মোড়ে একটা দোকান থেকে একটু মশলা-টশলা, সুপুরির কুচি কিনে মুখে দেয় মিলন। প্রথম দিকে মদের দোকান থেকে বেরিয়েই সে একটা পান মুখে দিত। তবকে মোড়া সুগন্ধী মশলা দেওয়া পান। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাম্বুলের রসে ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল। কিন্তু তাই নিয়ে আর এক জ্বালা। এমনিতে পান-টান খাওয়া মিলনের অভ্যেস নেই। হঠাৎ সন্ধ্যের পর পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে বাড়ি ফিরলে মা, বিস্তি এমনকি

ছিরুটা পর্যন্ত মাঝে মাঝে মুখের দিকে তাকায়। মনে হয় ওরা যেন অন্য কিছু ভাবছে। আর তখনই সুড়সুড়ি পিঁপড়ের মত একটা ভিজে ভয়ভাব মনের ভিতর কেবলি ওঠানামা করে। তারপর থেকে পান খাওয়া সে ছেড়েছে। এখন সুরাপান করলেই দোকান থেকে সুগন্ধী মশলা-টশলা কিনে মুখে দেয়। যাতে গন্ধটা কেউ না টের পায়।

আজ তাড়াতাড়িতে বিষম ভুল হয়ে গেছে। অনেক, ছোট ছোট চিন্তা, জলের ঢেউয়ের মত এক একটা ভাবনা, রেঁস্তোরার কল-গার্ল মেয়েটার মুখ, তার ছোট বোন বিস্তির কোমর জড়িয়ে ধরে সেই ফর্সা সুন্দর ছেলেটার রেঁস্তোরা থেকে বেরিয়ে যাওয়া,—এই সব ভাবতে ভাবতে কখন সে বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছেছে তা খেয়াল করেনি। বাথরুমে দাঁড়িয়ে মিলন ভালো করে কুলকুচো করল,....একবার, দুবার,—অনেকবার। তবু সন্দেহ কিছুতেই যায় না। মনের ভিতর দুরুদুরু ভয়ভাব। কথা বলতে গেলেই মদের গন্ধটা যদি মা টের পেয়ে যায়? তাহলে কেলেঙ্কারীর একশেষ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে মিলন ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

উনুনে কি একটা তরকারি চাপিয়ে মনোরমা খুন্তি নাড়ছিল। আগুনের আঁচে ফর্সা মুখখানা ঈষৎ লাল। মুখ তুলে সস্নেহে ছেলের দিকে তাকিয়ে সে বলল—'আয় মিলু। বস এখানে। তোকে খাবার দিই—।'

এখনই ফের খাওয়ার ইচ্ছে মিলনের ছিল না। তবু সে কথা বলতে গেলেই ফ্যাসাদ। খেতে অনিচ্ছে জানলে মা নানারকম প্রশ্ন শুরু করবে। সব শুনে হয়তো দুঃখ করে বলবে,—'আজকাল তোর বাড়ির খাবার মুখে রোচে না। তাই না রে মিলু? বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হোটেল-রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে বেড়াস?'

রান্নাঘরে একটা আসন পেতে মিলন বসল। মায়ের কাছ থেকে একটু দূরে। সুরার পরিচিত গন্ধটা এখনও কি তার মুখে লেগে আছে? কথা বলার আগে সে ঠিক জন্তুর মত শুঁকে সেই নিষিদ্ধ গন্ধটার অস্তিত্ব খুঁজতে চেষ্টা করল।

—'বিস্তি কোথায় মা?' মিলন কথা বলার জন্য তৈরি হয়ে শুধোল।

—'সে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে নাচের রিহার্সাল দিতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, মা ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। একটু আগে দেখলাম মেয়ে খাটের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে।'

—'আর হিরু?'

—'সে বাড়িতেই আছে। এতক্ষণ বই নিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছিল। কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলে ছাদে গিয়েছে।

—'তোমাকে একটা কথা বলব মা?' মিলন মুখ গম্ভীর করে মুখবন্ধ করল।

—'কি কথা?' মনোরমা ভুরু কুঁচকে শুধোল।

—'স্কুল ছুটির পর বিস্তি কোথায় যায়, তুমি খোঁজ নিয়েছ?'

—'বারে! এখুনি তো বললাম তোকে। স্কুল থেকে বেরিয়ে বিস্তি নাচের রিহার্সাল দিতে গিয়েছিল। রোজই যায়। সামনের সপ্তাহে ওদের ফাংশন। মেয়েটা খুব ভালো নাচে। সব্বাই সেকথা বলে।'

—'বিস্তিকে আজ একটি ছেলের সঙ্গে দেখলাম মা।' মিলন বাকিটুকু বলার আগে একবার ইতস্ততঃ করল।

—'কেমন ছেলে বল তো? খুব সুন্দর দেখতে? উনিশ-কুড়ি বছর বয়স? বিস্তি ওর সঙ্গে একটা গাড়ি করে ফিরছিল? তাই না?—'

—'তুমি ওকে চেন নাকি? বিস্তির সঙ্গে কোনোদিন দেখেছ?' মিলন সবিস্ময়ে তাকাল।

মনোরমা হেসে বলল—'ছেলেটিকে আমি একদিন দেখেছি মিলু। ড্রাইভার না থাকলে বিস্তিকে ওই পৌঁছে দিয়ে যায়। দেখতে ছেলেটি.... ভারী সুন্দর। বিস্তির পাশে ওকে চমৎকার মানায়।'

মিলন বাধা দিয়ে বলল,—'জানো মা, বিস্তি আজ ওই ছেলেটার সঙ্গে একটা বারে গিয়েছিল? সেখানে দুজনে মিলে টুইষ্ট নাচছিল।'

—'বারে? সে আবার কি? কি নাচছিল বললি?' মনোরমা অবাক হয়ে শুধোল।

—'বার মানে একটা মদের দোকান। সেখানে খুচরো মদ বিক্রি হয়

মা। তবে ওটা শুধু বার নয়, বার অ্যাণ্ড রেঁস্তোরা। বিস্তি ওই ছেলেটার সঙ্গে কোমর দুলিয়ে টুইস্ট নাচছিল মা।'

—'বিস্তি একটা মদের দোকানে ঢুকে নাচছিল? তুই সত্যি বলছিস মিলু?' মনোরমার গলার স্বরটা হঠাৎ খুব বিষণ্ণ এবং কোমল শোনাল।

—'আমি নিজের চোখে দেখেছি মা। তুমি বিশ্বাস কর।' কথাটা বলেই মিলন খুব ভাবনায় পড়ল। এমন বেফাঁস কথা কেন যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়? মদের দোকানে সে কেন গিয়েছিল, একথা মনোরমা যদি এখুনি প্রশ্ন করে বসে? মিলন তাহলে কি উত্তর দেবে? কি বোঝাবে মাকে?

কিন্তু মনোরমা কথা কইল না। সে স্তব্ধ বিষণ্ণ মুখে বসে রইল। বিস্তি মদের দোকানে ঢুকে একটা ছেলের সঙ্গে হৈ-চৈ করে নাচছিল? এমন কথা যে মনোরমা চিন্তাও করতে পারে না। তার ছেলে-মেয়ে,—বিস্তি, হিরু সকলে যেন বিদেশী বর্ণমালার মত ক্রমেই দুর্বোধ্য হ'য়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে মনোরমা বলল—'মিলু আমার একটা কথা শুনবি?'

—'কি কথা মা?'

—'তোর আমেরিকা যাওয়ার আগে বিস্তির একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারিস?'

—'বিস্তির বিয়ে। মানে এত তাড়াতাড়ি? এখনও তো ও হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেনি।'

—'তোদের সকলের মুখে এক কথা। বিস্তির বিয়ের এত তাড়াহুড়ো কিসের? কিন্তু একটা কথা তোরা কেউ বুঝিস না? ওই নাচুনী মেয়ে কখনও চন্দনপুরের মত গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারে? শেষে বাড়ি থেকে পালিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করবে?'

মায়ের কথার কোনো জবাব না খুঁজে পেয়ে মিলন চুপ করে রইল।

কয়েক সেকেণ্ড পরে মনোরমা ফের বলল,—'আচ্ছা, তোর সেই বন্ধুর সঙ্গে বিস্তির সম্বন্ধ করলে হয় না? মেয়ে দেখতে ভালো, নাচ গান জানে। এক নজর দেখলে বোধহয় অপছন্দ করবে না। আর অমন সোনার চাঁদ

ছেলে। দেড় হাজার টাকা মাইনে পায়। তাছাড়া তোর বন্ধু—ওর নাড়ি-নক্ষত্র সব তুই জানবি—'

অপরেশের নাড়ি-নক্ষত্র মানে ওর চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র? কিন্তু মনোরমাকে কি উত্তর দেবে মিলন? তার বন্ধু অপরেশ মদ্যপ,—বারে-হোটেলে নিত্য আনাগোনা? আজ সন্ধ্যায় বিস্তির শ্রেণীযুগলের দিকে সে কেমন জুলজুল করে তাকিয়েছিল। একটা বাজারে কল-গার্ল মেয়ের বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে উরুর পিছন দিকের কাটা দাগের খবর পর্যন্ত সে রাখে? এরপর?

এরপরও কি নিজের বোনের সঙ্গে সে অপরেশের সম্বন্ধ খুঁজতে পারবে?

॥ এগারো ॥

খাটের উপর বাণীব্রত চুপ করে শুয়েছিলেন। ইদানীং শরীরটা তেমন ভালো নয়, ডাক্তারের বারণ তাই অফিস থেকে ফিরে বাণীব্রত আর বাড়ির বাইরে যান না। তাছাড়া কোথায় বা বেরোবেন? যা সময় যাচ্ছে। দিন-দুপুরে খুন-জখম, রক্তারক্তি কাণ্ড। দত্যি-দানোর চিৎকারের মত বিকট শব্দ করে যখন-তখন বোমা ফাটছে। অফিস থেকে কোনোমতে বাড়ি ফিরে আসাই সমস্যা। একবার ফিরতে পারলে আবার বেরোনো প্রায় দুঃসাহসিক অভিযানের পর্যায়ে পড়ে।

নিজেকে খুব নির্জীব এবং ক্লান্ত লাগছিল বাণীব্রতর। শূন্য কলসীর মত ভিতরটা কেমন ফাঁকা। অবসর নেবার দিন যত এগিয়ে আসছে, বাণীব্রত তত বেশী অবসন্ন বোধ করছেন। প্রথমে ভাবতেন চাকরি থেকে ছুটি নিলেই বুঝি হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন। কিন্তু ক্রমেই ধারণাটা যেন বদলাচ্ছে। আজ-কাল অবসর নেবার কথা মনে হলেই একটা নিঃসঙ্গ বেদনা তিনি টের পান। কেমন অস্পস্ট যন্ত্রণা। ঝোপের ভিতর অদৃশ্য পাখির ডাকের মত সেই ব্যথাটা দেহের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে যেন কুক্ কুক্ শব্দ করে।

শোবার ঘরে ঢুকে মিলন শুধোল,—'তোমার শরীর আজ কেমন আছে বাবা ?

ছেলের কণ্ঠস্বর শুনে বাণীব্রত মুখ তুলে তাকালেন। বললেন,—'শরীর ভালই আছে। কিরণ যে ওষুধটা এনে দিয়েছে, সেটা মন্দ নয়। খেয়ে বেশ জোর পাচ্ছি মিলু।'

ঘরের কোণে একটা ভারী চেয়ার। বছর দুই-তিন আগে মনোরমা রথের মেলায় সেটি কিনেছিল। মিলন চেয়ারটা টেনে নিয়ে বাণীব্রতর কাছে এসে বসল। কোনোরকম ভনিতা না করেই বলল—'আমাকে এবার যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হবে বাবা। সম্ভবত আর দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে ফ্লাই করতে হবে।'

—'তাই নাকি ?' খবরটা শুনেই বাণীব্রত উঠে বসলেন। 'তোর বিদেশের চাকরির তাহলে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল মিলু ? চিঠিপত্র পেয়েছিস বুঝি ?'

—'চিঠিপত্র অবশ্য এখনও পাইনি বাবা। কিন্তু অপরেশ বলছিল চিঠি আসতে দেরি হলেও খবর তুই পাকা জানবি। এই চাকরির ব্যাপারে ওর এলসি বৌদির খুব ইনফ্লুয়েন্স—মানে হাত আছে। সুতরাং চাকরি হবেই। আর ফাইন্যাল খবর অর্থাৎ চিঠিপত্র কিংবা ওর বৌদির কেবল্ যে কোনো সময়ে আসতে পারে। মানে আজ কিংবা কাল,—এনি টাইম।'

—'চিঠিপত্র পেলেই তাকে তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে। বেশীদিন অপেক্ষা করা চলবে না। তাই নারে মিলু ?'

—'অপেক্ষা করার দরকার কি বাবা ? সব ঠিকঠাক হবার পর শুধু শুধু বসে থাকার কোনো মানে হয় ? তাই অপরেশ আমাকে আগে থেকেই রেডি হতে বলছিল। চিঠি পেলেই যাতে চটপট ফ্লাই করতে পারি।'

দেওয়ালের গায়ে একটা ক্যালেণ্ডার টাঙানো। বেশ বড় হরপের বার-তারিখ। একনজর তাকিয়ে বাণীব্রত বললেন,—'দু-তিন সপ্তাহ মানে নভেম্বরের শেষাশেষি। আমি ভেবেছিলাম তোর যেতে দেরি আছে মিলু। আরো দু-এক মাস বাদে, মানে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তুই যাবি।'

'জানুয়ারী মাস? বল কি বাবা? মিলন অবাক হয়ে শুধোল। তার তো অনেক দেরি। অত দিন কি পোস্টটা আমার জন্য খালি রেখে দেবে?'

—'তা ঠিক।' বাণীব্রত চিন্তিতভাবে বললেন, 'যেতে যখন হবেই তখন আর উপায় কি? তবু তুই জানুয়ারী মাসে কটা দিন থাকলে আমার ভাল লাগত মিলু।'

বাণীব্রতর কথাগুলি মিলন মন দিয়ে শুনছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তার ঠিক বোধগম্য হ'ল না। সে আরো কিছুদিন থাকলে তার বাবার খুব ভাল লাগত? কিন্তু কেন? মিলন কিছুটা সংশয়ের সুরে শুধোল—'জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তুমি কি আমাকে থেকে যেতে বলছ বাবা? তাতে কোনো সুবিধে হবে তোমার?'

—'সুবিধে-অসুবিধের কথা নয়। মনে মনে আমার একটা ইচ্ছে ছিল মিলু। খুব সাধারণ ইচ্ছে, তোর মা হয়তো শুনলে আবার হাসবে।' বাণীব্রত কপালে হাত রেখে কি যেন ভাবতে শুরু করলেন। সিন্দুকের একেবারে নীচে, সঙ্গোপনে অতি সযত্নে-রাখা একটি মূল্যবান বস্তুর মত গোপন বাসনার সেই কৌটোটাকে তিনি যেন হাতড়ে খুঁজছিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে বাণীব্রত আবার শুরু করলেন,—'ডিসেম্বরের চব্বিশ তারিখে রিটায়ার করছি মিলু। ভাবছি জানুয়ারীর প্রথমেই চন্দনপুরে গিয়ে উঠব। অবশ্য পুরানো বাড়ি,—বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে। কিন্তু সে তো ভাঙাচোরা একতলা ছিল। সারিয়ে-সুরিয়ে দোতলার ঘর দুখানা তো আমিই তুলেছি। নতুন বাড়ি বলতে চাইনে—তবে রং-টং করিয়ে বাড়িটাকে এখন প্রায় নতুন বলেই মনে হয় মিলু।'

—'নিশ্চয় নতুন বলে মনে হবে বাবা।' মিলন সায় দিয়ে বলল। 'চন্দনপুরের বাড়ির পিছনে তুমি কম টাকা খরচ করনি। ঐ টাকাতে দেশে-গাঁয়ে ছোটখাটো একটা বাড়ি তৈরি করা যায়।'

'তা বলতে পারিনে।' বাণীব্রত ঈষৎ হাসলেন, 'তবে চন্দনপুরের বাড়ির পিছনে কিছু টাকা খরচ করেছি বৈকি। নইলে দোতলার ঘর দুখানা, বাড়ির চুনকাম, পালিশ, বাইরেটা রং করানো হত না।'

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বাণীব্রত ফের বললেন—'ভেবেছিলাম রিটায়ার করে চন্দনপুরে সবাই একসঙ্গে যাব। তোর মা, আমি, তুই, কিরণ আর বিন্তি। ছোটখাটো একটা গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান করলেও মন্দ হয় না। দিন সাত-আট দেশের বাড়িতে সবাই মিলে বেশ হৈ-চৈ করে থাকা যাবে। তারপর আবার ছাড়াছাড়ি। তুই আর কিরণ কলকাতায় ফিরে আসবি। হিরুকে পাঠিয়ে দেব বাঁকড়োর কলেজে। হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করবে। বিন্তির জন্যে চিন্তা নেই। ওকে ভর্তি করব চন্দনপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে। হেড-মাস্টারের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। কো-এডুকেশন স্কুল,—ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়াশুনো করে। আমি গেলেই বিন্তিকে ওরা ভর্তি করে নেবে।'

দরজার কাছে মনোরমা কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল, বাণীব্রত লক্ষ্য করেন নি। নইলে অবশ্যই ছেলের কাছে দেশের বাড়ির গল্প সবিস্তারে ফেঁদে বসতেন না। ইদানীং মনোরমা যেন বাড়ির কথা উঠলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

চোখাচোখি হতেই বাণীব্রত একটু দমে গেলেন। মনোরমার মুখের ভাব কুটিল,—রুষ্ট দৃষ্টি। স্ত্রীর এই রূপ তার অজানা নয়। বাণীব্রত নিজেকে সংযত না করলে এখনি একটা বিশ্রী কলহের সূত্রপাত হতে পারে।

বিদ্রূপ করে মনোরমা বলল,—'ছেলের কাছে বুঝি চন্দনপুরের প্রাসাদের গল্প হচ্ছিল?'

চন্দনপুরের বাড়ী নয়,—প্রাসাদ। মনোরমার কথার শেষে বোলতার হুল। বাণীব্রত কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

বাপের বিমর্ষ অসহায় ভাব লক্ষ্য করে মিলন বলল.'—জানো মা, চন্দন-পুরে তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব না বলে বাবার খুব দুঃখ হচ্ছে।'

—'তাই নাকি?' মনোরমা বাঁকা হাসল। 'তাহলে এখন আমেরিকা গিয়ে কাজ কি? চন্দনপুরে তোর বাবা অট্টালিকা তৈরি করেছেন সেখানে দুদিন থেকে আসবি চল।'

চন্দনপুরের বাড়ি নয়,—প্রাসাদ, গৃহ নয়,—অট্টালিকা। মনোরমার রসনায় যেন সাপিনীর বিষ। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তবু বাণীব্রত হেসে

বললেন,—'আহা! আমি কি তাই বলছি? তুমি এমন সব উল্টো-পাল্টা বোঝ না!'

—'হ্যাঁ। আমি বোকাসোকা, মুখ্যু মানুষ। উল্টোপাল্টা বুঝি।' মনোরমা ব্যঙ্গ করে বলল। ফের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে শুধোল—'তোর বাবাকে সব কথা বলেছিস মিলু?'

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিলন ঢোক গিলল। এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতি—এসব কথা কি বাবার সামনে উচ্চারণ করা যায়? বাণীব্রতকে কি বলবে মিলন? আজ সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটের কোনো বার অ্যাণ্ড রেঁস্তোরায় তার ছোটবোনকে একটা ছেলের সঙ্গে সে টুইস্ট নাচতে দেখেছে। যাবার সময় তার চোখের সামনে ছোঁড়াটা বিস্তির অনাবৃত শুভ্র কোমর কেমন অনায়াসে পেঁচিয়ে ধরল।

একটু চিন্তা করে মিলন বলল,—'চন্দনপুরে যাওয়ার আগে বিস্তির বিয়ে দেওয়া যায় না বাবা?'

ছেলের প্রশ্ন শুনে বাণীব্রত একটুও চঞ্চল হলেন না। কথাটা তাঁর কাছে নতুন নয়। তাড়াতাড়ি বিস্তির বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা মনোরমার। স্ত্রীর এই অভিলাষের কথা তিনি জানেন। এতে অবাক হবার কিছু নেই। মিলনের মুখে তার মায়ের কথার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

বাণীব্রত কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে অনুত্তেজিত শান্ত গলায় বললেন,—'বিস্তির বিয়ের বয়েস কি পার হয়ে যাচ্ছে মিলু? চন্দনপুরে যাওয়ার আর কটা দিন বাকি। এর মধ্যে তাড়াহুড়ো করে ওর বিয়েটা কি না দিলেই নয়?'

—'ব্যাপারটা ঠিক তা নয় বাবা। আমি তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি। মা বলতে চায় যে চন্দনপুরে গিয়ে সব চেয়ে বড় সমস্যা হবে বিস্তিকে নিয়ে। আমি চলে যাচ্ছি আমেরিকায়। কিরণ থাকবে কলকাতায়। আর হিরু পড়তে যাবে বাঁকড়োর কলেজে। শুধু বিস্তিকেই চন্দনপুরে থাকতে হবে। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ গ্রামে গিয়ে বিস্তি কি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে বাবা? ও নাচের স্কুলে যায়,—ফাংশনে নাচবার জন্যে কত লোক ওকে

ডাকাডাকি করে। এখানে যে পরিবেশে ও মানুষ হয়েছে, চন্দনপুরে যে তার ছিটেফোঁটাও পাবে না।'

বাণীব্রত দুঃখ করে জবাব দিলেন,—'তুই শুধু তোর ছোটবোনের দিকটাই দেখলি মিলু। আমার সমস্যাগুলোর কথা একবার ভাবলি না।'

—'তোমার সমস্যা বাবা?'

—'হ্যাঁ, আমার সমস্যা।' বাণীব্রত নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। —'তুই তো আমেরিকা চললি। কিরণ হাসপাতাল থেকে শ-দেড়েক টাকার মত অ্যালাউন্স পায়। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর কলকাতায় কেমন করে থাকব বলতে পারিস? চন্দনপুরে না গিয়ে আমার উপায় আছে?

—'হ্যাঁ কলকাতায় যত খরচ, চন্দনপুরে গেলে সব নি-খরচায় হবে।' মনোরমা টিপ্পনী কেটে বলল।

—'নি-খরচায় হবে না। তবে খরচপত্র অনেক কম। তাছাড়া চন্দনপুরে গেলে বাড়িভাড়া লাগবে না। দশ-বারো বিঘে ধানী জমি আছে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখাশুনো করলে মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না জানবে।'

মিলন বলল,—'বিস্তির বিয়েটা হয়ে গেলে তোমার সমস্যা অনেক কমত বাবা। আর কোনো ভাবনা-চিন্তা থাকত না।'

বাণীব্রত চিন্তিতভাবে বললেন, 'বিস্তির বিয়ের কথা বলছিস? কিন্তু চট করে বিয়ে দেওয়া কি সহজ কাজ মিলু? আর শুধু হাতে তো মেয়ের বিয়ে হয় না। ভাল ঘরে, ভাল বরে মেয়ে দিতে হলে অন্তত বারো-চোদ্দ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। রিটায়ার করেই অতগুলো টাকা বের করে দিলে আমার আর কি থাকবে বলতে পারিস?

মনোরমা মুখ বেঁকিয়ে বলল,—'ও, তাহলে সেই কারণেই তুমি এখন বিস্তির বিয়ে দিতে চাও না?'

বাণীব্রত হেসে বললেন,—'শুধু এই কারণেই নয়। আমি বিস্তির বয়সের কথাও ভেবে দেখেছি। তোমার বড় মেয়ে অবন্তীর বিয়ে দিয়েছ উনিশ বছরে। সে আজ আট-দশ বৎসর আগের কথা। সুতরাং

বিন্তির বিয়ে আরো বছর তিনেক বাদে দিলেও চলবে,—কোনো ক্ষতি হবে না।'

—'বিন্তির বিয়ে দেবার জন্যে তোবার হাতে টাকা থাকবে?'—

—'আমার হাতে অত টাকা না থাকাই সম্ভব। কিন্তু ততদিনে বিন্তির দাদা তৈরি হয়ে যাবে। বোনের বিয়েতে তারা নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করবে। কি বলিস মিলু?'

মিলন তাড়াতাড়ি বলল,—'নিশ্চয় বাবা। তিন বছর বাদে আমি হয়ত একবার ইণ্ডিয়ায় ঘুরে আসব। বিন্তির বিয়ে তুমি সেই সময় দিও।'

বাণীব্রত উৎসাহের সঙ্গে বললেন,—'সে কথা আবার বলতে। ছোট-বোনের বিয়েতে তুই না এলে চলবে কেন বাবা? আমি ততদিনে আরো বুড়ো, অথর্ব হয়ে যাব। শক্তি সামর্থ্য বলতে কিছুই থাকবে না। তোরা দুজনেই আমার বল ভরসা। দুইভাই দাঁড়িয়ে থেকে ছোটবোনের বিয়ে দিবি। আমি শুধু চেয়ে দেখব মিলু।

মুখটা বিকৃত করে মনোরমা বলল,—তিন বছর পরে আর বিন্তির পাত্র জুটেছে। চন্দনপুরে তিন মাস থাকলেই আর দেখতে হবে না। রোদে-জলে চেহারার যা একখানা হাল হবে। আর ঐ ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে কে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে? কোন সুপাত্রের পায়ের ধুলো পড়বে শুনি?

কথা শেষ করে মনোরমা আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। রাগে গর গর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্ত্রী চলে গেলে বাণীব্রত হেসে বললেন,—'তোর মা অমনি। সারাজীবন তো দেখে এলাম। একটুতেই রাগ-অভিমান। আগুনের মত দপ করে জ্বলে ওঠে। আবার তেমনি রাগ পড়তেও দেরি হয় না। আসলে মানুষটা তোদের ভীষণ ভালবাসে। সর্বদা বুক দিয়ে আগলে রাখতে চায়। এতটুকু দুঃখ-কষ্টের আঁচ লাগবে জানলে ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে।'

মিলন উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাণীব্রত ইঙ্গিতে তাকে নিবৃত্ত করলেন। বললেন,—'ব'স না মিলু, তোর সঙ্গে আমার আরো দু-একটা কথা আছে।'

—'কি কথা বাবা?'

—'কথা মানে, তোর এই আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারটা।' বাণীব্রত একটু ইতস্ততঃ করলেন। ঠোঁটের উপর জিভটা একবার বুলিয়ে নিয়ে ছেলেকে সুধালেন—'আচ্ছা মিলু তোর যাবার সময় কি রকম টাকাকড়ি মানে খরচপত্র লাগবে হিসেব করেছিস?'

মানসাঙ্কের উত্তরটা মনে মনে তৈরি করে নেবার মত ভঙ্গিতে মিলন একটু ভাবল। বলল,—'তা প্রায় হাজার সাতেক টাকার মত লাগবে।'

—'সাত হাজার। অত টাকা? বলিস কি মিলু?'

বাণীব্রত যেন একটু দমে গেলেন।

মিলন বলল,—'শুনতেই সাত হাজার টাকা বাবা। কিন্তু তুমি যদি হিসেবটা দেখ, তাহলে মনে হবে টাকাটা কিছুই নয়।'

—'বেশ, হিসেবটা বল শুনি—'

—'সোজা হিসেব বাবা।' মিলন একটু ভনিতা করে শুরু করল, প্রথমে ধর টিকিটের দাম। ওতেই প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মত চলে যাবে, তারপর জানো ত ওখানে কি প্রচণ্ড শীত। আমি নভেম্বরের শেষ দিকে যাচ্ছি। অন্তত ছুটো গরম কাপড়ের স্যুট নইলে চলতে পারে না। তারপর টুকি টাকি আরো কত খরচ আছে। সাত হাজার টাকাতে কুলোবে কিনা কে জানে?'

—আমি ভাবছি অতগুলো টাকার কি উপায় হবে মিলু? রিটায়ার করার আগে তো আমি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাগুলো হাতে পাচ্ছিনে। তাছাড়া তুই বড় হয়েছিস, তোর কাছে বলতে লজ্জা নেই। অবশ্য তোর আমেরিকা যাওয়ার খরচ নিশ্চয় আমাদের দেওয়া উচিত, কিন্তু কি করব বলতে পারিস? আমার এখন ব্যাঙ্কের আধুলি পুঁজি। টাকা নেই বলে চন্দনপুরে চলে যাচ্ছি। টাকার অভাবে বিস্তির এখন বিয়ে দিলাম না। কিন্তু তোর আমেরিকা যাওয়ার কি উপায় হবে? সাত হাজার টাকা কেমন করে জোগাড় করব ভেবে আমি অস্থির হচ্ছি।'

মিলন হেসে বলল,—'তুমি মিথ্যে ভাবছ বাবা, ও টাকা আমার জোগাড় হয়ে গেছে।'

—'জোগাড় হয়ে গেছে ? বাণীব্রতর দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। 'তুই বলছিস, কি মিলু ? কোথা থেকে এতগুলো টাকা পেলি ?'

'—টাকা পাইনি বাবা, তবে অপরেশ একটা উপায় করে দিয়েছে। যেমন ধ'র টিকিটের দাম। প্লেনের টিকিট ক্রেডিটে মানে ধারে পাওয়া যায়। আমি ওখানে চাকরি করে ইনস্টলমেণ্টে টাকাটা শোধ করব।'

—'বাঃ চমৎকার ব্যবস্থা—'বাণীব্রত সপ্রশংস দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন।

—'হ্যাঁ বাবা, আর বাকি টাকাটার জন্যেও তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমার নিজের কিছু জমানো টাকা আছে। অপরেশের কাছ থেকেও হাজার খানেক টাকা লোন পেতে পারি। এক রকম করে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

—'আমার খুব খারাপ লাগছে মিলু। তোকে আমেরিকা যাওয়ার খরচটাও দিতে পারলাম না।' বাণীব্রত দুঃখিত ব্যথিত চিত্তে জানালেন। ফের বললেন—'তবে আমার কাছ থেকেও তুই কিছু নিস। এই ধর,—শ পাঁচেক টাকা।'

—'নিশ্চয় নেব বাবা। দরকার হলেই আমি টাকাটা তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেব।' মিলন ঘাড় নেড়ে জবাব দিল।

* * * *

বাণীব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে স্ত্রীর খোঁজ করলেন। রান্নাঘরে, বারান্দায়, ও ঘরে, এমন কি বাথ্রুমের দরজাটা বন্ধ আছে কিনা তাও পরখ করে নিলেন। মিলন তাকে নিশ্চিন্ত করেছে। এই মুহূর্তে তার কোনো চিন্তা নেই। সত্যি বাহাদুর ছেলে। বাপকে একটুও ভাবনায় ফেলেনি। কেমন নিজে বিদেশ যাওয়ার সব ব্যবস্থা গুছিয়ে রেখেছে। মনোরমাকে দেখতে না পেয়ে বাণীব্রত চঞ্চল হ'লেন। ছেলের এই কৃতিত্বের সংবাদ স্ত্রীকে না দেওয়া পর্যন্ত তার মন কিছুতেই শান্ত হবে না।

মনোরমা ছাদে ছিল। একা নয়,—মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। ব্যাপারটা বিন্তি বুঝতে পারে নি। সে ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসেই দেখল মা সামনে দাঁড়িয়ে। চোখের ইশারায় মনোরমা তাকে সঙ্গে যেতে বলছে।

তারপর ঠিক নিশি-পাওয়া মানুষের মত সে মনোরমার পিছু পিছু ছাদে গিয়ে উঠেছে।

মাথার উপর আকাশের রঙ বোঝা যায় না। ধোঁয়ার একটা আবরণ চাঁদোয়ার মত ঝুলছে বলে নক্ষত্রের আলো বহুদূর থেকে দেখা মিটমিটে প্রদীপের মত অস্পষ্ট মনে হয়। দূরে আট-দশতলা উঁচু একটা বাড়ির মাথায় বিমান সতর্কীকরণ লাল বাতিটাকে পৌরাণিক যুগের কোনো অমিতবিক্রম বলশালী দৈত্যের রক্তচক্ষু বলে কল্পনা করা যেতে পারে।

বিন্তি ভেবেছিল মা তাকে গোপন কিছু দেখাবে বলে চুপিচুপি ছাদে ডেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু মুখোমুখি হতেই তার বুকের ভিতরটা ভয়ে, দুরু দুরু কেঁপে উঠল। মার চোখে রহস্যের লেশমাত্র নেই। বরং কেমন কটমটে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। মা এখন তাকে কি কথা বলতে চায়? তার জন্যে চুপি চুপি ছাদের এক কোণে আসবার কি প্রয়োজন ছিল?

মনোরমা কোনো ভনিতা না করেই শুধোল,—আজ স্কুলের ছুটির পর তুই কোথায় গিয়েছিলি?

আশ্চর্য! ফাংশনের কথা কি মার মনে নেই? রোজ স্কুলের ছুটির পর সে কোথায় যায়, সে কথা কি মা জানে না? বিন্তি এক মুহূর্ত ভাবল। তাহলে হঠাৎ এই প্রশ্নের কি অর্থ হয়? আসলে মা কি জানতে চায়? বিকেলে সে কোথায় গিয়েছিল? শুধু বিন্তি ঠোঁট কামড়ে নিজের মনেই প্রশ্নটা করল।

—'চুপ করে রইলি কেন? জবাব দে।' মনোরমা ধমক দিল।

—'স্কুলের ছুটির পর রোজ যেখানে যাই,—মানে রিহার্স্যাল দিতে।' ঢোক গিলে বলল, জানো তো সামনের সপ্তাহেই আমাদের ফাংশন।'

—'জানি।' মনোরমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। ফের শুধোল,—রিহার্স্যালের পর কোথায় গিয়েছিলি তাই বল?'

—'রিহার্স্যাল শেষ হবার পর তো বাড়ি চলে এলাম।' বিন্তি আমতা আমতা করে জবাব দিল।

—'মিথ্যুক কোথাকার।'' মনোরমা রাগে মেয়ের গালে একটা চড় কসিয়ে দিল। বলল,—'রিহার্স্যালের পর তুই একটা ছেলের সঙ্গে বিলিতী

মদের দোকানে ঢুকেছিলি। সেখানে নির্লজ্জ বেহায়ার মত দুজনে ধেই ধেই করে নেচেছিস। মিলু স্বচক্ষে দেখেছে।'

বিন্তির চোখ ফেটে জল এল। মায়ের হাতের চড় খেয়ে নয়। তার বড়দা,—মিলনের মুখখানা মনে করে। ছি! ছি! কি লজ্জা আর অপমানের কথা। এরপর রতীশের সঙ্গে যদি সে কোথাও গিয়েছে? কাল সকালে বড়দার হাতে বিন্তি চায়ের কাপ তুলে দিতে পারবে? মুখ তুলে কথা কইতে লজ্জা করবে না?

মেয়ের চোখে জল দেখে মনোরমা আর কথা বাড়াল না। মিছিমিছি কেলেঙ্কারী। দশটা ফ্ল্যাটের বাড়ি। বারোয়ারী ছাদ,—এখনি কেউ উঠে বিন্তিকে কাঁদতে দেখলে হাজারটা প্রশ্ন করবে।

একটু নরম গলায় মনোরমা বলল,—'হ্যাঁরে ছেলেটি কে? কি নাম ওর?'

বিন্তি কান্না-ভেজা গলায় জবাব দিল,—'ওর নাম রতীশ। ওদের বাড়িতেই তো ফাংশন।'

মনোরমা শুধোল,—'তোর নাচের ওরা সবাই খুব প্রশংসা করে, তাই না রে?'—

—'সবাই করে মা।' বিন্তির মুখটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আর রতীশ কি বলে জানো? ও বলে ভালো করে নাচ শিখলে একদিন আমার খুব নাম-ডাক হবে। তখন দাদার মতো আমিও বিদেশে যেতে পারি মা।'

স্বপ্ন! স্বপ্ন! এই দুনিয়ায় স্বপ্ন কতটুকু? মনোরমা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। মাথার উপর নক্ষত্রশোভিত রহস্যময় আকাশ। ভুরু কুঁচকে সে একবার কলকাতার বুকে পেয়ালার মত উপুড়-হওয়া ধোঁয়ার রঙের আকাশটাকে নিরীক্ষণ করল। মেয়ের দিকে না তাকিয়ে মনোরমা বলল—শোন্ বিন্তি। আর কিছুদিন পরেই আমরা চন্দনপুরে চলে যাচ্ছি। এই নাচ-গান, ফাংশন, হৈ-চৈ, তুই এবার ছেড়ে দে। চন্দনপুরে গিয়ে গ্রামের মেয়ের মত থাকবি চল।'

আবছা অন্ধকারে বিন্তি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। শুকনো দৃষ্টি ছলছলে চোখ। ঠিকা বিচারে সাজা-পাওয়া আসামীর মত। মনোরমার

খুব কষ্ট হচ্ছিল। প্রস্ফুটিত কুসুমের মত এমন সুন্দর মেয়ে। চন্দনপুরের রোদে-জলে এই ফুলটা আর ভালো করে ফুটবে না। ভাঙা স্বপ্নের মত শুকিয়ে যাবে।

*  *  *  *

নীচে ঘরের ভিতরে চেঁচামেচি—হৈ-চৈ। ওরা জোর গলায় কথাবার্তা বলছে।

মনোরমা ঘরে ঢুকতেই বাণীব্রত বললেন,—'জানো, হিরু এইমাত্র তিন-চারজন ছেলের সঙ্গে বড় রাস্তার দিকে কোথায় গেল।'

'এত রাত্তিরে?' মনোরমার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। 'কে ওকে যেতে দেখেছে?'

—'কিরণ দেখেছে মা।' মিলন এগিয়ে এসে বলল, ও গলি দিয়ে ফিরছিল। দেখল তিন-চারজন ছেলের সঙ্গে হিরু বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছে।'

বাণীব্রত এমনিতে শান্ত, কিন্তু এই সব ব্যাপারে ভীষণ খাপ্পা। বেজায় চটে যান। রাগ করে বললেন,—ছেলেটা কি করে কোথায় যায় তোমরা কেউ খোঁজ রাখতে পার না, অথচ একটা বাড়ীতে একই ছাদের নীচেয় দিনরাত্তির বাস করছ।'

মনোরমার মন ভাল নেই। তবু কথাটা তাকেই খোঁচা দিয়ে বলা। সইতে না পেরে সে চেঁচিয়ে উঠল,—'একই বাড়িতে বাস করলেই কি সব খবর জানা যায়? তোমার ছেলেমেয়ের মনের ভিতরে যে একটা করে নতুন বাড়ি হচ্ছে, তার খোঁজ রাখো?

বাথরুমে কিরণ মুখ-হাত ধুচ্ছিল। মার কথাটা তার কানে গেল। তা সত্যি। মা ঠিকই বলেছে। তাদের মনের বাড়ির খবর বাবা-মা জানবে কেমন করে?'

কাল রবিবার। রীতাবরীর আসবার কথা। দুপুরে শেয়ালদা স্টেশনে বইয়ের দোকানটার কাছে সে অপেক্ষা করবে। মার কাছে রীতাবরার গল্প করবে কিরণ? কতদিন পরে?

## ॥ বারো ॥

দশটা বাজবার একটু পরে হিরু বাড়ি ফিরল। দরজায় শব্দ শুনেই মনোরমা বুঝতে পারল। কলকাতার এই বাসায় নেহাৎ কম দিন হল না। কত বছর কেটে গেল। এই আড়াইখানা ঘর, দেওয়াল আর ছাদ এখানে সেখানে পেন্সিলের দাগ, চটা-ওঠা মেজে, জানলা দিয়ে ভেসে আসা সকালের রোদ্দুর, রাত্তিরে এক চিলতে জোৎস্নার আলো। নিজের হাতের গড়া এই ছোট জগৎটুকু বারবার দেখা করতলের একটি রেখার মত তার খুব চেনা আর পরিচিত।

দরজায় কড়া বেজে উঠতেই মনোরমা দাঁড়াল। নিশ্চয় হিরু এসেছে। ছেলে-মেয়ে, বাণীব্রত, বাড়ির ঠিকে-ঝি এমন কি বাসনওয়ালী মেয়েটা পর্যন্ত কেমন করে কড়া নাড়ে, মনোরমা নিভু'ল বলে দিতে পারে। প্রত্যেকটি ধ্বনিই আলাদা,—পৃথক সুর। দুটি মানুষের মুখের আদলের মত ভিন্ন।

এতক্ষণ রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ির সামনে বসেছিল মনোরমা। বাণীব্রতর শরীর ভালো নয়,—তার বেশী রাত্তির করা চলে না। ডাক্তারের বারণ। সন্ধ্যের পরই খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে বলেছে। মনোরমারও বয়স বাড়ছে। ইদানীং তার দেহটাও ভালো যাচ্ছে না। ক'দিন ধরে ঘাড়ের কাছে কেমন একটা যন্ত্রণা। সন্ধ্যের পর মাথাটা ভারী লাগে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে মনোরমা একটু বিশ্রাম পায়। হিরু ঘরে থাকলে সে এতক্ষণ হেঁসেল তুলে বিছানায় গড়িয়ে পড়ত।

দরজা খুলতেই হিরু নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকল। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনোরমা একটু চিন্তিত হল। হিরু অমন হাঁপাচ্ছে কেন? উস্কো-খুস্কো মাথায় যেন চিন্তার ঝড় বইছে, তাইতেই মুখখানা এত গম্ভীর নাকি? আর আশ্চর্য! নভেম্বরের এই অল্পস্বল্প শীতে হিরুর কপালে চিবুকের উপর ছোট ছোট স্বেদবিন্দু কেন দেখা দিয়েছে?

মাকে দেখে হিরু ম্লান হাসল। একটু লজ্জিতভাবে বলল,—'আমার জন্য খুব ভাবছিলে, তাই না মা?'

ছেলের ক্লান্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে মনোরমার মায়া হল। সে নরম গলায় বলল,—'ভাবনা হয় বৈকি বাবা। কি রকম দিনকাল পড়েছে দেখছিস তো। এই রাত্তির বেলায় তুই কাউকে কিছু না বলে হুট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলি। আর আমরা ঘরে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারি? তোর বাবাকে নিশ্চয় জানিস? কি রকম ব্যস্ত মানুষ। আর একটু দেরি করলেই মিলু আর কিরণকে তোর খোঁজে বেরোতে হত।'

হিরু কোনো জবাব দিল না। তার বুকটা ঘন ঘন ওঠানামা করছিল। সে একপাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

মনোরমা ফের শুধোল,—'কিন্তু তুই অমন হাঁপাচ্ছিস কেন হিরু? এত রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলি?'

মায়ের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে হিরু দম বন্ধ করে একটা লাঠির মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর ব্যাপারটা একটু সহজ করবার চেষ্টা করে বলল,—'ও কিছু নয় মা। অনেক রাত্তির হয়ে গেল কিনা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিলাম। বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই অমন মনে হচ্ছে।'

কিন্তু ছেলের কথায় মনোরমা ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারল না। তার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছিল। হিরু কি তাকে সত্যি বলছে? তাড়াতাড়ি হেঁটে এলে মানুষ অমন করে হাঁপায় নাকি? তাও হিরুর মত একটা অল্পবয়সী ছেলে।

হঠাৎ বছর দুই আগের আর এক রাত্তিরের কথা মনে পড়ল তার। স্কুলের দু-তিনজন বন্ধুর সঙ্গে হিরু যেন কোন মাঠের খেলা দেখতে গিয়েছিল। সন্ধ্যে হতে চলল, তবু ছেলে বাড়ি ফিরল না দেখে মনোরমা ভেবে অস্থির। এত রাত্তির সে কোনোদিন করে না। তাহলে ছেলেটা গেল কোথায়? পথে কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো? একটা অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় মনোরমার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু কেঁপে উঠল।

ঠিক সাতটা নাগাদ হিরু বাড়ি ফিরল। তখনও সে বেশ হাঁপাচ্ছে। তার ছোট্ট বুকটা দ্রুততালে কেবলি ওঠানামা করছিল।

মনোরমা ব্যগ্র হয়ে শুধোল,—কিরে, অমন হাঁপাচ্ছিস কেন ?

—'পুলিশে তাড়া করেছিল মা—'

—'পুলিশ ?' হিরুর কথা শুনে ভয়ে মনোরমার মুখ শুকিয়ে এল।

'হ্যাঁ মা।' হিরু আঁচলে মুখটা মুছে বলল, 'খেলা শেষ হবার আগেই দু'দল ছেলেতে প্রচণ্ড মারামারি। শেষে পুলিশের গাড়ি এসে হাজির। ওরা লাঠি নিয়ে তাড়া করতেই সব ভোঁ—ভোঁ। কে কোন দিকে পালাল তার ঠিক নেই। আমরা দু-তিনজন বন্ধু মিলে একসঙ্গে দৌড় দিয়েছি। তিন-চারটে রাস্তা ঘুরে তবে তো বাড়িতে এলাম। নইলে কি আর এত দেরি হত?'

মনোরমার মনের কোণে গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা কালো গুবরে পোকার মত সেই সন্দেহটা কেবলি উঁকি দিচ্ছিল। তবে কি হিরু আজও পুলিশের তাড়া খেয়ে বাড়ি ফিরেছে ? কিন্তু যা ছেলে তার। কখনও মার কাছে সে কথা স্বীকার করবে ?

তবু মনোরমা আর একবার চেষ্টা করল,—'হ্যাঁরে, তুই কোথায় গিয়েছিলি সে কথা বললি না তো !'

—'একটু কাজ ছিল মা।' হিরু ঈষৎ হাসল। মাকে বলল,—'আচ্ছা তুমি আমার জন্য এত ব্যস্ত হও কেন বল দিকি ?'

'ওমা ! কথা শোনো ছেলের। বাইরে মারামারি, গণ্ডগোল। দুমদাম বোমা ফাটছে। আর তুই এত রাত অব্দি বাইরে থাকলে আমি ব্যস্ত হব না ?'

পিছন থেকে বাণীব্রত গম্ভীর গলায় শুধোলেন,—'কিন্তু রাত্তির ন'টার পর গা ঢাকা দিয়ে তুমি কোথায় বেরিয়েছিলে, সে কথা বললে না তো ?'

মনোরমা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বাণীব্রত কখন নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছেন। যা গম্ভীর গলা। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রীতিমত ভয় পেল মনোরমা। বড় কঠিন রাগ মানুষটার। এমনিতে ভালো, দিব্যি শান্ত। সাতে-পাঁচে থাকে না। কদাচিৎ রাগে। কিন্তু একবার ক্ষেপে উঠলে আর রক্ষা নেই। তাকে সামলানো কঠিন। শুকনো খড়ে আগুন লাগলে যা অবস্থা হয়, তেমনি চেহারা। তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়।

—'কই আমার কথার তুমি উত্তর দিলে না ?

বাণীব্রতের কণ্ঠস্বর আরো তীব্র হয়ে উঠল।

—'বললাম তো আমার একটু কাজ ছিল।' হিরু মুখ না তুলেই জবাব দিল।

—'কি এমন কাজ ছিল, তাই তোমার কাছে জানতে চাইছি।' বাণীব্রত রীতিমত চড়া গলায় কথা কইলেন।

তবু হিরু কোনো উত্তর দিল না। সে জেদী ঘোড়ার মত ঈষৎ ঘাড় হেলিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

বাণীব্রত কয়েক সেকেণ্ড ছেলের মুখের উপর চোখ রাখলেন। তারপর বেশ রাগের সঙ্গে বললেন,—'তোমার ব্যাপারটা কি আমি জানতে চাই হিরু। কিছুদিন ধরেই আমি লক্ষ্য করছি, তুমি কেমন অন্যমনস্ক। পড়াশুনোয় আগের মত মন নেই। মাঝে মাঝেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে হঠাৎ কোথায় চলে যাও। কারা যেন তোমাকে ডাকতে আসে, তাদের নাম-ধাম ঠিকানা কিছুই জানাতে চাও না। আজ আমি স্পষ্ট জবাব চাই। তুমি কোথায় যাও, কেন যাও, কাদের সঙ্গে মেলামেশা কর—সব পরিষ্কার বলতে হবে।'

কিন্তু হিরু অটল, দৃঢ়, অনমনীয়। সে ঘাড় শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ তুলে একটি কথাও বলল না।

বাণীব্রত নিজেকে আর সংযত করতে পারলেন না। তার মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা বেয়ে কি একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত বস্তু দ্রুত সমস্ত দেহটাকে নাড়া দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাণীব্রত চীৎকার করে উঠলেন,—'কি আমার কথার তুমি জবাব দেবে না ?'

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনোরমার মুখটা ভয়ে শুকিয়ে এল। কি রকম কটমটে দৃষ্টি....রাগে বাণীব্রত থর-থর করে কাঁপছেন। রোগা মানুষ... এখনও তেমন ভালো করে সারে নি। এই তো ক'দিন আগে কিরণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তারকে দেখিয়ে এল। সেখানে রক্ত-টক্ত আরো কি সব পরীক্ষা হবার পর এক কাঁড়ি ওষুধ আর নানা রকম পথ্যের ফিরিস্তি দিয়েছে। রাগারাগি করে ফের যদি সেই বুকের ব্যাথাটা শুরু হয়। তারপর রাতদুপুরে বাড়াবাড়ি হলে কি উপায় হবে? কিরণ হালে

ডাক্তার—সেদিন মোটে পাশ করেছে। তার সাধ্য কি এই সব বিদঘুটে ব্যামো ধরতে পারে—।

ছেলেকে মৃদু ভর্ৎসনা করে মনোরমা বলল, তুই দিন দিন ভীষণ জেদী হচ্ছিস হিরু। উনি বার বার জিজ্ঞেস করছেন, আর তুই একটা জবাব দিলি নে?' ছি-ছি! এ কি রকম শিক্ষা পেয়েছিস তুই—'

চেঁচামেচি গণ্ডগোল শুনে মিলন, কিরণ দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বিন্তি অনেকক্ষণ আগে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। তার চোখে রাতদুপুরের গাঢ় ঘুম। এত কলরব চিৎকারেও সে নিদ্রা ভাঙে নি।

বাণীব্রত রাগে, অসন্তোষে থরথর করে কাঁপছিলেন, তাকে এই অবস্থায় দেখে কিরণ ছুটে এসে বলল,—'বাবা, তুমি শান্ত হও দিকি। এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? তোমার না হাই প্রেসার? ডাক্তার সিন্‌হা খুব চুপচাপ আর বিশ্রামে থাকতে বলেছেন। আর তুমি এই রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর চেঁচামেচি শুরু করেছ?'

ছেলের অনুরোধ কিংবা নিজের শরীরের কথা চিন্তা করে বাণীব্রত একটু শান্ত হলেন। মিলন এগিয়ে এসে তাঁকে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

তবু হিরু একটা পাথরের মূর্তির মত দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সে নড়ল না। একটি কথাও বলল না।

মনোরমা আক্ষেপ করে বলল,—'সব আমার কপাল। নইলে হিরুর মত বুদ্ধিমান ছেলে এমনি আকাট গোঁয়ার হয়? এখন ভালোয় ভালোয় পরীক্ষাটা চুকলে বাঁচি। তারপর যা হয় একটা কিছু বিহিত করতে হবে'

কিরণ কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে ঈষৎ হেসে বলল,—'হিরুকে জিজ্ঞেস করেছ মা? টেস্ট পরীক্ষার জন্যে ও কেমন তৈরী টৈরী হচ্ছে? সেদিন বাবাকে বলছিল যে পরীক্ষা-টরীক্ষা হবে না।—

—'তুই থাম দিকি।' মনোরমা মেজছেলেকে মৃদু ধমক দিল। 'তোর যত অলক্ষুণে কথা। পরীক্ষা হবে না অমনি বললেই হল? তাহলে স্কুল-কলেজগুলো কি সব উঠে যাবে? ছেলেরা পাশ-টাশ করবে কেমন করে?'

—'সে প্রশ্ন ওকেই করতে পার। কিরণ এক মুহূর্ত কি ভাবল, ফের আড় চোখে ছোটভাইয়ের মুখের উপর এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে শুরু করল,—

'অবশ্য হিরু অন্য কথা বলবে না। স্কুল-কলেজ, সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রসাতলে গেলেও ওর কোনো আপত্তি নেই। হিরুর মতে এদেশে যা চলছে, তা একটি পচা অসুস্থ শিক্ষা-ব্যবস্থা। সুতরাং প্রয়োজনে জীর্ণ অট্টালিকাকে যেমন শাবল-গাঁইতির সাহায্যে ভেঙে ফেলতে হয়, তেমনি এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে দোষ কি?'

—'তুই চুপ কর বাবা।' মনোরমা কিরণকে প্রায় মিনতি করল। মনে মনে বলল,—একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। এসব কথা কি এখন না আলোচনা করলেই নয়? তারপর রাত-দুপুরে দুই ভাই মিলে চেঁচামেচি, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে আর দশটা ফ্ল্যাটের যত লোক এসে ছি-ছি করে যাক।

ঘরের মধ্যে থেকে মিলন বলল,—'ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি সব বক্তৃতা করছিস কিরণ? রাত তো অনেক হল। নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড় না। মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ কি?'

কিরণ ঘরের মধ্যে ঢুকতেই মনোরমা এসে ছেলের হাত ধরল। বলল, 'রাগ-রোষ ছাড় দিকি। এখন হাত-মুখ ধুয়ে খাবি চল। আমাকে আর কত রাত্তির পর্যন্ত রান্নাঘরে আটকে রাখবি বল?'

আশ্চর্য! মনোরমার কণ্ঠস্বরে কি যেন মেশান ছিল। এতক্ষণ বাণীব্রতর চড়া গলা আর ধমক শুনে হিরু একটি কথাও বলেনি। কিন্তু মা এসে ছেলের হাত ধরতেই জিদের অটল পাহাড় নিমেষে বরফের মত গলতে শুরু করল। হিরু ম্লান হেসে শুধোল,—'বড়দা মেজদা সকলের খাওয়া হয়ে গেছে? তুমি শুধু আমার জন্যে বসে আছ, তাই না মা?'

—'তা হোকগে।' ছেলের মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে মনোরমা আদর করল। বলল,—'এখন বাড়ী ফিরেছিস। আর দেরী করিস নে বাবা। রাত অনেক হয়েছে। চল, তাড়াতাড়ি মা-বেটা দুজনে খেয়ে নিই গে।'

হিরু বাথরুমের দিকে যেতেই মনোরমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ওই একরোখা ছেলেকে তার বিশ্বাস নেই। যেমন ভীষণ জেদ....তেমনি গোঁ। এখনই মুখের উপর যদি না বলে বসে, তবে তার সাধ্য কি ছেলেকে ভাতের থালার সামনে ফের বসাতে পারে?

রান্নাঘরে ঢুকে মনোরমা খাবার আয়োজন করছিল। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁটের মত শীতল বাতাসের কণা এসে গায়ে বিঁধছে। দু-একদিন হল রাত একটু গভীর হলেই বেশ ঠাণ্ডা লাগে। আচমকা এক ঝলক হাওয়ার স্পর্শে শরীরটা কেমন শিরশির করে ওঠে। নভেম্বরের শুরুতে এই অবস্থা। কলকাতায় এবার পৌষ-মাঘ মাসে কনকনে ঠাণ্ডা পড়বে মনে হয়। কিন্তু এই শহরের শীত-গ্রীষ্মের কথা ভেবে লাভ নেই তার। কলকাতায় সে আর কদিন থাকছে? বড় জোর দুটো মাস। জানুয়ারীর প্রথমেই বাণীব্রত চন্দনপুরে যাবেন বলেছেন। সেখানে ভীষণ ঠাণ্ডা। পৌষ-মাঘ মাসে হি-হি কাঁপুনি। রাত্তির বেলায় পুরু লেপের তলায় শুয়েও শীত বাগ মানে না। বুকের ভিতরটা গুরু-গুরু করে কাঁপে।

উনুনে আঙরাগুলো এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে। ডাল-তরকারি একটু আগেই মনোরমা ফের গরম করে নিয়েছে। ভাতের হাঁড়িটা উনুনের পাশে বসান ছিল। শীতকালে বরাবরই তাই থাকে। তবু খাওয়ার সময় একটু গরম গরম মনে হয়। নইলে ঠাণ্ডার দিনে আর মুখে দেবার উপায় নেই। রাত দশটার সময় হাঁড়ির ভাত দলা পাকিয়ে ঠিক আসেদ্ধ চালের মত শক্ত হয়ে ওঠে।

ছেলের সামনে আহারের আয়োজন রেখে মনোরমা নিজেও খেতে বসল। সকালে বাণীব্রত বাজার থেকে ইলিশ মাছ এনেছিলেন। গোটা ইলিশ নয়,—আর একজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে অর্ধেকটা মাছ নিয়েছিলেন। তার ছেলেমেয়েরা সকলেই ইলিশ মাছ ভালবাসে। বিশেষ করে হিরু আর বিন্তি। মাছের দাম অনেক দিনই আক্রা। তবু মনোরমার মনে হয় বছর সাত-আট আগে বাজার এত চড়া ছিল না। মরশুমের দিনে কিম্বা আমদানী ভালো হলে ইলিশের দর আরো একটু নামত। অফিস থেকে ফেরার সময় বাণীব্রত মাঝে-মাঝেই একটা ইলিশ মাছ হাতে ঝুলিয়ে বাড়ী ফিরতেন। সন্ধ্যেবেলায় রান্নঘরে মাছ দেখে হিরু আর বিন্তির কি উল্লাস। ইলিশ-ইলিশ বলে দুই ভাইবোনে এমন চেঁচামেচি শুরু করত যে মনোরমা ধমক দিয়েও তাদের থামাতে পারত না। সেই ইলিশ রূপোলী ইলিশ। মনোরমার মনে হল গ্রামে গেলে শুধু কলকাতার

সঙ্গে নয়, ইলিশের সঙ্গেও রসনার সম্পর্কের ছেদ পড়বে। চন্দনপুরে ইলিশ কোথায়? মরশুমের সময় বাঁকুড়ায় চালানী মাছ আসে। কিন্তু অত দূর থেকে চন্দনপুরে কে মাছ আনছে?

খেতে বসে মনোরমা তাই ছেলেকে বলল,—'ভালো ইলিশ পেলে তোর বাবাকে এখন রোজ আনতে বলেছি।'

—'রোজ কেন?'

—'বারে! এই কটা দিন খেয়ে নে।' মনোরমা ভাতের ডেলা পাকিয়ে নিয়ে বলল, 'চন্দনপুরে গেলে তো আর ইলিশ পাবি নে। অবশ্য তুই বাঁকড়োর কলেজে পড়বি। সেখানে মরশুমের সময় চালানী মাছ পাওয়া যায় বলে শুনেছি। কিন্তু বিন্তিটার কপাল মন্দ। ওকে এখন গ্রামের স্কুলেই পড়াশুনা করতে হবে।

—'চন্দনপুরে গিয়ে তোমার খুব কষ্ট হবে তাই না মা? হিরু জিজ্ঞাসা করল।'

—'কষ্ট তো হবেই। কিন্তু উপায় নেই। তোর বাবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। একবার যখন বলেছেন চন্দনপুরে গিয়ে থাকবেন তার আর নড়চড় নেই।' এক মুহূর্ত থেমে মনোরমা ফের ছেলের মুখের দিকে তাকাল। বলল,—'তা গ্রামে গিয়ে তোরও নিশ্চয় ভাল লাগবে না হিরু? ক'লকাতার মত এমনি ইলেকট্রিক আলো, ট্রাম-বাস, এত বন্ধুবান্ধব, ফাংশন-থিয়েটার, খেলাধুলো, হাসি-আনন্দ,—গ্রামে গিয়ে এসব কোথায় পাবি?'

—'তা ঠিক মা। গ্রামে এসব কিছুই নেই। সেখানে শুধু দুঃখ-কষ্ট, অন্ধকার আর দারিদ্র্য। লোকে দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায় না।'

হিরু চুপ করে কি ভাবল। ফের মুখ না তুলে প্রায় স্বগতোক্তির মত বলল,—'তাই আমাদের সেখানেই যেতে হবে। গ্রাম থেকেই আমরা কাজ শুরু করব।'

—'গ্রাম থেকে তোরা কাজ শুরু করবি? তার মানে কি হিরু?' মনোরমা সোজা হয়ে বসল। 'কি সব বলছিস তুই? গ্রামে আবার তোদের কি কাজ আছে রে?'

মার চোখে একটা ঘন সন্দেহ। মা যেন তাকে কেমন করে দেখছে।

ব্যাপারটা সহজ করার জন্য হিরু তাড়াতাড়ি বলল,—'কাজ মানে…এমনি কাজ। ও কিছু নয় মা।' সে হাত মুখ নেড়ে মাকে অন্যভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু মনোরমার মন থেকে সন্দেহের ছায়া দূর হল না। একটা অদ্ভুত ভয়ের অনুভূতি তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করছিল। তার কেবলি মনে হতে লাগল হিরু যেন একটা গুরুতর বিষয় গোপন রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। গ্রামে গিয়ে হিরু কি কাজ শুরু করবে? তাও সে একা নয়। কথাটা জিজ্ঞেস করতেই হিরু অমন চমকে উঠল কেন? সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে খুব গোপনীয়? কিন্তু মনোরমা কেমন করে ওর মনের কথা জানবে? ছেলের কতটুকু খবর সে রাখতে পেরেছে? হিরু কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে বাড়ীর লোকে তার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

মনোরমা দুঃখ করে বলল,—'আমি মুখ্যু-সুখ্যু মেয়েমানুষ। তোর মত বুদ্ধিমান নই হিরু। কিন্তু তুই যে আমার কাছে অনেক কথা লুকোচ্ছিস, তা আমি বুঝতে পারি বাবা।'

হিরু চুপ করে রইল। একটি কথাও কইল না। সে নিঃশব্দে মুখ নীচু করে থালার ভাত-তরকারী নাড়াচাড়া করতে লাগল।

মনোরমা ফের বলল,—'এখন তুই বড় হয়েছিস হিরু। মা-বাবার দুঃখ-কষ্ট তোর মনকে স্পর্শ করে না। নইলে ঠিক বুঝতে পারতিস তোর ব্যবহারে উনি আজ কত দুঃখ পেয়েছেন। দিন দিন তুই অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছিস। কেমন অন্যমনস্ক….নিজের ঘরে চেয়ার-টেবিলে বসে একমনে কি চিন্তা করিস। তোর কাছে কারা যেন আসে। সময়-অসময় নেই, তুই হঠাৎ তাদের সঙ্গে কোথায় চলে যাস বাড়ীর কেউ তা বলতে পারে না। আমি তোর মা। আমি বলছি হিরু সব কথা এমন করে মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখিস নে। তোর বাবা-দাদাদের কাছে বলতে ইচ্ছে না করলে দরকার নেই। এখন এই রাত্তির বেলায়•ওরা সবাই ঘুমোচ্ছে। তুই আমার কাছে লুকোস নে বাবা। সব খুলে বল।—

শেষের দিকে মনোরমার গলার স্বর কেমন ভিজে ভিজে শোনাচ্ছিল। তবু এত অনুনয় বিনয়েও হিরুর মুখ থেকে একটি মৃদু শব্দও বের

হল না। তার ঠোঁট দুটো বুঝি কেউ শক্ত সুতো দিয়ে সেলাই করে রেখেছে।

ছেলের দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার বাপের বাড়ীর দিনগুলির কথা মনে পড়ছিল মনোরমার। খিড়কির পিছনে নোনা-ধরা পাঁচিলের উপর একটা বহুরূপী গিরগিটিকে সে কতদিন বসে থাকতে দেখেছে। ক্ষণে ক্ষণে সেটা রঙ বদলাত, হিরুর মুখের ভঙ্গী, চেহারা ঠিক তেমনি ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। একটু আগেই সে হাসিমুখে মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। আর এই মুহূর্তে ওর ঠোঁটে, চিবুকের গায়ে সেই জেদের ভঙ্গীটা কত স্পষ্ট। তার চোখের সামনে হিরুর মুখভাব কেমন শক্ত, দৃঢ় হয়ে উঠছে।...

হঠাৎ ঝোলমাখা ভাত তরকারি ফেলে রেখে হিরু উঠে দাঁড়াল, কিন্তু আশ্চর্য! মনোরমা একটি কথাও বলল না। সে নিশ্চেষ্ট দর্শকের মত চুপ করে রইল। যেন সে জানত, বুঝতে পেরেছিল। এমনি একটা কিছু ঘটবে। অথচ তার এতে কিছু করবার নেই।

কিন্তু মনোরমার এমন স্বভাবই নয়। দু দিন আগে হিরু এমনি ভাত ফেলে উঠে যেতে চাইলে সে ঝপ করে ওর হাতটা ধরে ফেলত। জোর করে ওকে ফের থালার সামনে বসিয়ে বলত,—'খবর্দার, হিরু। আমার একটি ভাতও যেন নষ্ট না হয়। এ তোমাদের রেশনের চাল নয় জানবে। অনেক কষ্ট করে ভালো জিনিস আমাকে জোগাড় করতে হয়েছে। বাজারে চালের দর কত, সে খেয়াল কারো আছে ?—'

কিন্তু মনোরমার হাতে পায়ে আর সে বল নেই। কেউ যেন গোপনে তার সর্বস্ব চুরি করে তাকে নিঃস্ব, ফতুর করে ফেলেছে। ছেলেকে ধমক দিয়ে কিছু বলবে তেমন জোর কই মনোরমার ? হিরু কি তার নাগালের মধ্যে ?

রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে মনোরমা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। চোখ ফেটে জল আসছিল তার। আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিল কে জানে? ছেলে-মেয়ে দুজনকে নিয়ে এখন দু রকমের সমস্যা। মনোরমা কেমন করে এর মোকবিলা করবে ?....

জানালার ফাঁকে কার্তিকের শিশির ভেজা আকাশ চোখে পড়ে। রাত বাড়লেই আরো হিম ঝরবে। পাল্লা দুটো বন্ধ করতে সে এগিয়ে

গেল। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়,—একটু অনিয়ম হলেই জ্বরজারি। যা পলকা শরীর সব,—সামান্য ঠাণ্ডা লাগলে বাণীব্রত আর বিন্তি দুজনেই ভুগবে।

শান্ত ঘুমন্ত কলকাতা এখন চাঁদের আলোয় হাসছে। কার্তিকের জ্যোৎস্না ভারী সুন্দর,—বড় উজ্জ্বল। এত হানাহানি, মারামারি····হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। তবু চাঁদ তেমনি,—এই কলকাতার রাজপথে, প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, কিম্বা চন্দনপুরের ধুলো-ওড়া মেঠো পথে, গাছ-গাছালী আর খড়ো ঘরের আঙ্গিনায়—সর্বত্রই তার অকৃপণ উদার হাসি।

অনেক রাত্তিরে স্ত্রীর কান্না শুনে ঘুম ভেঙে গেল বাণীব্রতর। পাশে শুয়ে মনোরমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাণীব্রত বিছানার উপর উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন,—'ওগো কাঁদছো কেন ?'

—'কবে চন্দনপুরে নিয়ে যাবে আমাদের ?' মনোরমা কান্না-ভেজা গলায় শুধোল।

—'চন্দনপুরে ?' বাণীব্রত মুহূর্তের জন্য ভুরু কোঁচকালেন। মনোরমা চন্দনপুরে যেতে চাইছে ? ঘুমের ঘোরে তিনি ভুল শোনেন নি তো ?

শেষ রাতে মনোরমার দুই চোখের পাতা ভারী হয়ে বুজে এল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল সে। যেন চন্দনপুরে যাবার ট্রেন ছাড়তে আর দেরী নেই। প্ল্যাটফর্মে কত লোকজন····সিগ্রেট-পান চাই বলে একটা ছোকরা কেমন স্বচ্ছন্দে হাঁটতে হাঁটতে ট্রেনটার অন্য প্রান্তে চলে গেল। গার্ড হুইসিল বাজিয়ে সবুজ পতাকা ওড়াচ্ছে। বাণীব্রত বলছেন,—'ওগো তাড়াতাড়ি উঠে পড়। এবার ট্রেন ছেড়ে দেবে। কিন্তু হিরু আর বিন্তি ? চন্দনপুরে কি ওরা যাবে না ?

····নির্বাক পাষাণ-মুর্তির মত বাণীব্রত তার সামনে দাঁড়িয়ে। কোনো জবাব দিতে পারছেন না।

॥ তেরো ॥

প্লাটফর্মে বুক স্টলের পাশে রীতাবরী ঠায় দাঁড়িয়ে। পা দুটো স্থির… কিন্তু চঞ্চল চাউনি। এদিকে-সেদিকে কখনও বা পথের পানে সাগ্রহে তাকাচ্ছে।

দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে কিরণ একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। কবে রীতাবরী বলেছিল, ঠোঁটের কোণে সিগারেট চেপে ধরে কিরণ যখন কথা বলে, কিম্বা পথ হাঁটে তখন ওকে বেশ স্মার্ট, আরো সুন্দর দেখায়। সেই থেকে কিরণ দারুণ সচেতন। রীতাবরীর সামনে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন সিগারেট খায়….বেশ নিপুণভাবে ছোট-বড় ধোঁয়ার রিং ছাড়ে। রীতাবরী ফের তারিফ করবে এই আশায় ওর মুখের দিকে বার বার তাকায়।

জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে নিয়ে কিরণ ধীরে ধীরে পা ফেলতে লাগল। মাঝে মাঝে সেটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে মৃদু টান দিচ্ছিল। আসলে তার মন-মর্জি ভালো নয়। মেজাজটা কেমন খিঁচড়ে আছে। গতকাল রাত থেকেই তাদের বাড়ির আবহাওয়াটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। হাসি-তামাশা নেই। সকলেই কেমন গম্ভীর। তার ছোট বোন বিন্তি দিন রাত বক বক করে। সব ব্যাপারেই কথা বলে। কারণে-অকারণে হি-হি করে হাসে। সকাল থেকে সে-ও ঠিক পেঁচার মত চুপ। মুখ শুকনো করে বাড়ির এককোণে বসে আছে।

রবিবার সকালে তাদের বাড়িতে চায়ের জমাটি আড্ডা বসে। বারান্দায় মেজের উপর মা চায়ের সরঞ্জাম পাতে। কেৎলিতে জল গরম হ'লে বিন্তি সকলকে ডাকে। টেবিলের চারপাশে তার বাবা, দাদা, এমন কি হিরুও এসে বসে। টি-পটে চায়ের পাতা ভিজতে দিয়ে মনোরমা পাউরুটি সেঁকতে শুরু করে। পাতলা করে রুটিতে মাখনের প্রলেপ লাগায়। তারপর ধীরে

ধীরে কাপে চা ঢালে। বিন্তি চায়ের পেয়ালাগুলো তার বাবা, দাদাদের কাছে এগিয়ে দেয়।

কিরণ অবশ্য লেট-রাইজারদের দলে। সাড়ে সাতটার আগে কদাচিৎ শয্যা ত্যাগ করে। ছুটির দিনে আরো দেরী,—আটটা-নটা অব্দি বিছানায় শুয়ে থাকে। তবু মনোরমা তাকে শুধরে নিতে চেষ্টা করে। চায়ের জল হ'লে নিজে গিয়ে ছেলেকে ডাকে। বলে,—'ও কিরণ, ওঠ্ বাবা। আর কত ঘুমোবি? অনেক বেলা হয়েছে, এক-বার তাকিয়ে দেখেছিস?'

তার বাবা ঠাট্টা করে বললেন,—'মিছিমিছি ওকে ডাকছ। তোমার মেজছেলের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। আরো এক ঘণ্টার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবে বলে মনে হয় না।'

সবটা ঘুম নয়....কিছুটা আলসেমী। আসলে বেলা একটু না হলে কিরণের বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। মা বেশী ডাকাডাকি করলে সে মিট-মিট করে তাকায়। ফের চোখ বুজে বলে,—'আমাকে এক কাপ চা এখানেই পাঠিয়ে দাও না।'

মনোরমা বিরক্ত হয়, অপ্রসন্ন মুখে গজ-গজ করে,—'কি ছাই ডাক্তার হয়েছিস, তুই জানিস। বাসি মুখে আবার চা খেতে আছে নাকি?'

মুখে আপত্তি জানালেও মনোরমা চা পাঠাতে দেরী করে না। মিনিট দুই-তিন পরেই বিন্তি এসে ঘরে ঢোকে। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে। বাবাকে শুনিয়ে বলে,—'ও মেজদা, তোমার বেড-টি রেখে গেলাম। তাড়াতাড়ি খেও। নইলে কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

অমন সুন্দর চায়ের আসরটাই মাটি। বিছানায় শুয়ে চোখ খুলতেই কিরণ তার বাবাকে সামনে দেখল। হ্যাঁ বাণীব্রত স্বয়ং। তবু ব্যাপারটা ঠিক তার বিশ্বাস হয় নি। বাবা তো কোনদিন তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন না। তাহলে কি সে ভুল দেখছে? কিংবা কাল রাত্তিরে বুকের ব্যথাটা ফের-বেড়েছিল। তাই সকাল হতেই অসুস্থ শরীরের সংবাদ বাণীব্রত ছেলেকে জানাতে এসেছেন।

কোনো রকম ভণিতা না করে বাণীব্রত বললেন,—'একটু তাড়াতাড়ি ওঠ

কিরণ। তোর মার বোধহয় শরীরটা ভালো নয়। এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। মনে হয় জ্বর-টর এসেছে।'

মার শরীর ভালো নয়? কি হয়েছে মায়ের? কিরণ মুহূর্তে বিছানার উপর উঠে বসল। তার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। মায়ের জ্বর এল কখন? কাল রাত্তিরে? সে ভুরু কুঁচকে শুধোল,—'তুমি টেম্পারেচার দেখেছো বাবা?'

—'টেম্পারেচার দেখি নি কিরণ।' বাণীব্রত মাথা নেড়ে বললেন। 'কিন্তু আমার যেন গা-টা গরম মনে হচ্ছে। তুই চল না একবার তোর মাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবি।'

ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে। এত বেলা পর্যন্ত তার মা কোনোদিন শুয়ে থাকে না। শরীর খারাপ তো নিশ্চয়। এবং কিঞ্চিৎ বেশী রকমের গণ্ডগোল, নইলে মনোরমা বিছানায় পড়ে থাকবার পাত্রী নয়।

চোখ দুটি ফোলা। শুকনো ঠোঁট। মনোরমা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কিরণ মায়ের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। ফের মনোরমার গায়ে হাত রেখে দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করবার চেষ্টা করল।

জ্বর একশ'র নীচে মনে হয়। নিশ্চয় ঠাণ্ডা লেগেছে। শরীরের উপর মার এতটুকু যত্ন নেই। অনিয়ম, অত্যাচার। কারো নিষেধ কানে নেয় না। সকাল-সন্ধ্যে বাথরুমে ঢুকে হুড়হুড় করে গায়ে জল ঢালে। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আসবে বিচিত্র কি?

কিন্তু মনোরমা ততক্ষণে চোখ মেলেছে। চারদিকে এত আলো, আর রোদ্দুর দেখে সে লজ্জিত মুখে বলল,—'ছি, ছি! কত বেলা হয়েছে। তোরা আমাকে কেউ ডাকিস নি কেন?'

মা উঠে বসবার চেষ্টা করতেই কিরণ তাড়াতাড়ি বলল,—'এখন উঠো না মা। আগে তোমার টেম্পারেচারটা নিই। মনে হয় এক'শর কাছাকাছি জ্বর আছে।'

ছেলের চিন্তা ভাবনা দেখে মনোরমার ভালো লাগল। কাল শেষ রাত্তিরে তার কেমন শীত-শীত করছিল। গলাটা শুকনো মনে হল। ইচ্ছে করছিল এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খায়। জ্বরটা বোধহয় তখনই এসেছে।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মনোরমা, কি সব বিদঘুটে অর্থহীন, দুঃস্বপ্ন দেখল। আর এখন বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে-হাতে প্রচণ্ড ব্যথা মনে হচ্ছে।

কিরণ থার্মোমিটার বের করে পারদের অবস্থান লক্ষ্য করছিল। কিন্তু মনোরমা আর অপেক্ষা না করে বিছানার উপর উঠে বসল। অবাধ্য মেয়ের মত বলল,—'কি হবে জ্বর দেখে আমার ? তার চেয়ে একটা বড়ি-টড়ি এনে দে। খেয়ে মাথার যন্ত্রণাটা কমলে বরং রান্নাঘরে ঢুকি!'

'রান্নাঘরে ঢুকবে মানে ?' কিরণ ভুরু কোঁচকাল। 'উনুনের আঁচে এখন কাজ করলে আর দেখতে হবে না। তোমার মাথার যন্ত্রণা আর টেম্পারেচার দুই-ই বেড়ে যাবে।'

—'তুই থাম দিকি কিরণ।' মনোরমা ছেলের আশঙ্কা প্রায় অস্বীকার করতে চাইল। 'আমি রান্নাঘরে না ঢুকলে তোরা দুপুরবেলায় খাবি কি ? ফের মৃদু হেসে ছেলেকে শুধোল,—হ্যাঁরে, আজ সকালে তুই, মিলু, হিরু বিস্তি, তোর বাবা সবাই চা-টা খেয়েছিস তো ?'

মায়ের কথার উত্তর দিতে গিয়ে কিরণ বার-দুই ঢোক গিলল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনোরমা আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করল না। বিছানা থেকে নেমে সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

বারান্দার চেয়ারে বসে মিলন খবরের কাগজের পাতা উল্টোচ্ছিল। কিরণ ঘর থেকে বেরোতেই সে প্রশ্ন করল,—'কি রে, মাকে কেমন দেখলি ?'

—'কি দেখব বল ? কিরণকে একটু দুঃখিত মনে হল। সে অভিযোগ করে বলল,—'মা কি কারো কথা শুনবে দাদা ? গায়ে একশ'র মত জ্বর। একটু বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রোগ-অসুখকে মা গ্রাহ্যই করে না। এখন রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে আঁচ দেবে বলছে।'

মিলনকে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল। সে জিজ্ঞাসা করল,—'মায়ের হঠাৎ জ্বর হল কেন ? ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি ?'

—'ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হতে পারে। কিছু অসম্ভব নয়।' কিরণ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত রায় দিল। পরে সে মন্তব্য করল,—কিন্তু মনের উত্তেজনা বেশী হলেও অনেক সময় শরীর খারাপ হতে পারে।'

—মনের উত্তেজনা ?

—'উত্তেজনা বৈকি।' কিরণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাছাকাছি কেউ আছে কিনা চট করে দেখে নিল। ফের গলা খাটো করে বলল,—'কাল রাত্তিরে হিরুর ব্যবহারে মা আর বাবা দুজনেই খুব আঘাত পেয়েছে দাদা। আমার তো মনে হল বিছানায় শুয়ে মা অনেকক্ষণ কেঁদেছে। চোখ দুটো একবার দেখ' না। কেঁদে কেঁদে কেমন ফুলে উঠেছে বুঝতে পারবে।'

মিলন চুপ করে শুনছিল। তাদের বাড়ীতে এত সমস্যা আগে ছিল না। বর্ষার শুরুতে কাঁটা গাছের মত সেগুলি এখন গজাচ্ছে। চলতে-ফিরতে গেলে সেই কাঁটা হাতে-পায়ে বিঁধছে। মিলন ভাবলে বিস্তি আর সেই সুন্দর মতন ছেলেটার টুইস্ট নাচের ব্যাপারটা কিরণকে বলবে কিনা। বাবা আর মা কি শুধু হিরুর ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছে ? বিস্তিও নিশ্চয় গভীর মনঃকষ্টের কারণ। তার বিশ্রী বেহায়াপনার কথা শুনে মা বোধহয় কাল সারা রাত ঘুমোতে পারে নি। বিছানায় শুয়ে মাথার বালিশে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে।

তবু কি ভেবে মিলন চুপ করে রইল। ছোট বোনের কেচ্ছাকাহিনী আর ভাইয়ের কাছে ভাঙল না। আজ সকাল থেকে বিস্তির সাড়াশব্দ নেই। অথচ অন্য দিন মেয়েটা কত আব্দার করে। এঘরে ওঘরে যেন নেচে বেড়ায়। পাখির মত কলরব করে ফিরে। নিশ্চয় কাল রাত্তিরে মা ওকে আচ্ছা মত শাসন করেছে। তাই লজ্জা পেয়ে বিস্তি এমনি চুপচাপ। কারো সামনে আসতে চাইছে না।

কিন্তু কিরণের কেবলি মায়ের রোগক্লিষ্ট মুখখানি মনে পড়ছিল। তার মা....খুব ফর্সা ছোটখাট মানুষটি। স্নেহে আর মমতায় ভরা মন। কি সুন্দর মুখের হাসি আর শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি। এই অসুস্থ দেহে কর্তব্যে এতটুকু অবহেলা নেই। শরীরে অত জ্বর নিয়ে সে আজও উনুনের আঁচে বসে রান্না করল। কারো নিষেধ শোনে না। খাইয়ে-দাইয়ে তাদের সকলকে তৃপ্ত করে, তবে মার তৃপ্তি। খেটেখুটে অবসন্ন কান্ত দেহে ফের বিছানায় গিয়ে শুয়েছে।

বাড়ী থেকে বেরোবার কিছুক্ষণ আগে কিরণ থার্মোমিটার হাতে নিয়ে

মনোরমার জ্বর দেখছিল। প্রায় একশ' এক ডিগ্রী। সন্ধ্যের পর নিশ্চয় আরো বাড়বে। জ্বরের আর দোষ কি? অসুস্থ শরীরে এত পরিশ্রম. অত্যাচার করলে কখনও রোগ সারে?

ছেলের উদ্বেগ লক্ষ্য করে মনোরমা ম্লান হাসল। বলল,—'মিছিমিছি ভাবছিস তুই। রান্নাঘরে কাজ করলে এমনিই গা গরম হয়। জলে থাকলে টেম্পারেচার বাড়বেই। তুই সন্ধ্যের সময় ফিরে এসে দেখবি আমি ভালো হয়ে তোদের জন্য খাবার-দাবার তৈরি করছি।

—'খবর্দার মা।' কিরণ প্রায় শাসনের ভঙ্গিতে ডান হাতের তর্জনী তুলে নিষেধ করল। 'ফের যদি তুমি রান্নাঘরে গিয়েছ, তাহলে কিন্তু আমি কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড করব।'

—'পাগল ছেলে! আমার জন্যে তোর খুব ভাবনা, তাই না রে?' মনোরমা হাত বাড়িয়ে কিরণের মাথাটা একবার স্পর্শ করল। ফের গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল,—হিরুর উপর একটু নজর রাখিস বাবা। দেখলি তো, অমন বুদ্ধিমান ছেলে দিন দিন কেমন গোঁয়ার-গোবিন্দ জেদী হয়ে যাচ্ছে। দিনকাল সুবিধের নয় কিরণ। কিসে কি হয়, কিছুই বলা যায় না।'

* * * *

রীতাবরীর মুখ ভার। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে বেচারী। ভিড়ের মধ্যে দশ-জনের চোখের সামনে এমনি গাজনের সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতে কোনো মেয়ের বুঝি ভালো লাগে?

দেখা হতে রীতাবরী ক্ষোভের সঙ্গে বলল,—'উঃ! আচ্ছা মানুষ যা হোক। কতক্ষণ ধরে এমনি দাঁড়িয়ে আছি জানো?

—'একটু দেরি হয়ে গেল আমার।' কিরণ কৈফিয়ৎ দেবার ঢঙে জবাব দিল। মুচকি হেসে বলল,—'কতক্ষণ এসেছ? আধঘণ্টা?'

—'ইস্! আধঘণ্টা অমনি বললেই হল? আমি যখন ট্রেন থেকে নামলাম, তখন একটা বাজতে মিনিট-দশ বাকি। আর এখন ক'টা বাজছে মশায়? স্টেশনের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখ না।'

ঘড়িটা সামনে। কাঁটায় কাঁটায় দুটো বাজছে। ইচ্ছে করলে সেদিকে

তাকান যায়। কিন্তু কিরণের কোনো আগ্রহ নেই। সে দেখছিল রীতাবরীকে সাজ-পোশাকে কি অপূর্ব লাগছে ওকে। ঠিক সত্ত-ফোটা সুন্দর ফুলের মত। একটা গোলাপী রঙের বুটিদার শাড়ি আর ম্যাচ-করা ব্লাউজ গায়ে। গলায় ছোট ছোট মটরদানার মত পাথরের মালা। গোলাপী পাথরগুলো দেখতে ভারী সুন্দর। হাতে তেমনি প্লাসটিকের চুড়ি। কানে পাথর-বসানো সুদৃশ্য দুল। হাল-ফ্যাশানের জামা বলে ঘাড় এবং পিঠের খানিকটা ঢাকা পড়েনি। কিন্তু নরম অনাবৃত অংশটুকু ওর সুন্দর দেহশ্রীর ইঙ্গিত দিচ্ছে। পরিতোষ সেদিন মিথ্যে বলেনি, শুধু নাম কেন, তোর গার্ল-ফ্রেণ্ডের চেহারাও চমৎকার।

বুক-স্টলটা পিছনে রেখে ওরা স্টেশনের চত্বরে পা দিল। রবিবার হলে কি হয়? ভিড়ের কামাই নেই। প্ল্যাটফর্ম থেকে একদল লোক বেরিয়ে এল, ফের কিছু লোক সেখানে ঢুকল। ছুটির দিনে অফিস বন্ধ। তাই বলে মানুষজন তো আর ঘরে বন্দী নেই। তারা বেরোচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী, সঙ্গে ছেলে-মেয়ে। কেউ বা একা,—নির্বান্ধব। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুর বাড়ি, কিম্বা সিনেমা-থিয়েটার অথবা ফাংশন। যাবার ঠাঁই একটা আছে। নইলে শুধু দুজনে নিরিবিলি কোথাও বসে দুটো মনের কথা কইবে।

রোদের তেজ এবার হ্রাস পাচ্ছে। এখনই বেশ নরম মনে হয়। ক'দিন পরে উত্তুরে হাওয়া বইবে। তখন রোদ আরো নিস্তেজ···একটা ঢোঁড়া সাপের মত নির্বিষ হয়ে উঠবে।

বৌবাজারের মোড়ে এসে কিরণ ট্যাক্সি নিল। রীতাবরী ভুরু কুঁচকে একবার তাকাল। ভাবটা, কি দরকার ছিল বাপু? মিছিমিছি খরচ। গাড়িতে উঠে সে ফিস ফিস করে বলল,—'হঠাৎ ট্যাক্সি নিলে যে? আজ তো ছুটির দিন। হাইকোর্টের ট্রাম নিশ্চয় ফাঁকা ছিল?'

—'এমনিতে দেরি হয়ে গেছে।' কিরণ মৃদু হেসে বলল। 'ছুটির দিনে এ লাইনের ট্রাম কম। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হত কে জানে?'

আসলে রীতাবরীর আপত্তির কারণ ভিন্ন। কিরণ তা জানে। ট্যাক্সিতে ওঠা মানেই ফালতু খরচ। মিছিমিছি অপব্যয়। আর বড়মানুষী করার দিনগুলি তো ফস্‌কে পালিয়ে যাচ্ছে না। তাছাড়া কিরণ এখন হাউস-

সার্জন। শুধু অ্যালাউন্স পাচ্ছে। তারপর সে নিশ্চয় একটা ভালো চাকরি কিম্বা প্র্যাকটিশ জমিয়ে ফেলবে। তখন ট্যাক্সি কেন, হয়তো নিজেদের গাড়িতে করেই তারা বেরোবে। কিরণ ড্রাইভ করবে আর রীতাবরী বসবে তার পাশে। দুজনে এই গংগার ধারে গাড়ি রেখে হেঁটে বেড়াবে।

ছুটির দিনে আপিসপাড়া জনহীন। দুপুর বেলায় ডালহৌসী স্কোয়ার ঠিক অতীতের কোনো পরিত্যক্ত নগরীর মত। মাঝে মাঝে দু-একজন পথচারী কৌতূহলী ট্যুরিস্টের মত ভঙ্গিতে আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। মাথার উপর কার্তিকের আকাশ নীল....শুধু নীল। কোন মহাশিল্পী আকাশটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে গাঢ় নীল রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়েছে। সর্বত্র উজ্জ্বল রোদ্দুর....বড় একটা বাড়ির কার্নিশের উপর বসে এক জোড়া কবুতরকবুতরী রিরংসু প্রেমে মশগুল।

কেল্লার কাছে একটা জায়গায় ওরা ট্যাক্সি থেকে নামল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে সামান্য দেরি। তাই ভিড় নেই। অবশ্য এদিকটায় লোকজন কম আসে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিম্বা ময়দানের মত ভ্রমণেচ্ছুর সংখ্যা অধিক হয় না।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কিরণ খুশি মনে বলল,—দশ মিনিটও লাগেনি পৌঁছতে। ট্রামে এলে ঠিক বিকেল হয়ে যেত।

'বাজে কথা রাখ।' রীতাবরী সুন্দর ভ্রুভঙ্গি করল। বিকেল হত না ছাই। আসলে খালি ট্যাক্সি দেখলে তুমি আর স্থির থাকতে পার না। ডাকবার জন্যে হাতের আঙুলগুলি নিশপিশ করে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে বেশ চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল,—'তাছাড়া আমাকে নিয়ে তুমি বোধহয় ট্রামে-বাসে উঠতে চাও না, তাই না মশায়?'

—'কি জানি।' কিরণ মুচকি হাসল। বলল,—'ট্যাকসির উপর তোমার এত রাগ কেন রীতাবরী? আমাদের প্রথম আলাপ কেমন করে হয়েছিল মনে কর তো—'

সে কথা ভেবে রীতাবরী ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। কিরণ সত্যি কথা বলেছে। ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে তার জীবনে প্রথম অনুরাগের সূত্রপাত। সুতরাং সেই ট্যাক্সির উপর কি বিরাগ হলে চলে? সেদিন বৃষ্টি-বাদলায়

ফাঁকা ট্যাক্সি দেখে দুজনে যদি দুদিক থেকে ছুটে না আসত, তাহলে কি কিরণের সঙ্গে আর কোনোদিন তার দেখা হত ?

গঙ্গার ধারে মখমলের মত নরম সবুজ ঘাসের উপর ওরা বসল। কিরণের মনটা ক্রমেই অবসন্নতা কাটিয়ে বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠছিল। নদীর বুক থেকে ঝিরঝিরে বাতাস গায়ে এসে লাগছে। আবার রোদটাও বেশ নরম। জলের উপর কয়েকটা গাংচিল বিচিত্র ভঙ্গিতে কেবলি পাক খেয়ে ফিরছে। একটা ছোট মোটর লঞ্চ কেমন রাজহাঁসের মত দিব্যি তরতর করে জল কেটে চলেছে।

সকাল থেকেই মনটা কেমন বিক্ষিপ্ত, ভার ভার লাগছিল। থার্মোমিটারে মায়ের জ্বর দেখে বেরোবার সময় সে কেবলি ইতস্ততঃ করেছে। অতখানি জ্বরে মাকে ফেলে যাওয়া কি ঠিক ? সে শুধু ডাক্তার নয়। বাড়ির ছেলে। মা হয়তো আশা করে যে জ্বর বাড়লে কিরণ নিশ্চয় ঘরে থাকবে। তার বিছানার পাশ ছেড়ে কোথাও নড়বে না।

কিরণের হঠাৎ হিরুর কথা মনে হল। মার চিন্তা এখন ছোট ছেলেকে নিয়ে। মনোরমা তাকে হিরুর উপর নজর রাখতে বলেছে। সত্যি দিন দিন হিরু যেন অসম্ভব গোঁয়ার এবং জেদী হয়ে উঠছে। আবার তেমনি চাপা। কিছুতেই মুখ খুলবে না। কিরণের সন্দেহ হয়, তলে তলে হিরু এমন একটা গুরুতর কাণ্ড করছে যা কোনোমতেই প্রকাশ করা যায় না।

তার অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করে রীতাবরী বলে উঠল,—এই, কি হয়েছে বল তো ? অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি তুমি কিছু ভাবছ।'

—'ও কিছু নয়।' কিরণ হাসবার চেষ্টা করল।

—'কিছু নয় অমনি বললেই হল ? আমি তখন থেকে দেখছি তুমি ভীষণ অন্যমনস্ক। নিজের মনে কি যেন চিন্তা করছ।' একটু থেমে সে অভিমান করে শোনাল,—'তবে ভাবনার কারণ যদি আমার কাছে বলতে না চাও, তাহলে আলাদা কথা।

—'বারে! কেন বলব না ?' কিরণ ওর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে বোধ করি একজন সমব্যথীকে খুঁজে পেতে চাইল। গলার স্বর ঈষৎ গাঢ় করে ধীরে ধীরে বলল,—'তোমার কাছে গোপন করব না রীতাবরী।

আমাদের বাড়িতে এখন অনেক সমস্যা। প্রায় একসঙ্গে সবকটা গজিয়ে উঠেছে।'

—'সমস্যা?'

—'হ্যাঁ, সমস্যা আমাদের বাড়ি নিয়ে। সমস্যা আমার ভাইবোনকে নিয়ে। সমস্যা আমার মা-বাবাকে নিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে আমার ছোটভাই হিরু—'

—'তোমার ছোটভাই হিরু?' রীতাবরী অস্ফুটে শুধোল।

—'হ্যাঁ, তার কথা ভেবে আমার মার চোখে ঘুম নেই। বাবার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। তাকে আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। দিন দিন ছেলেটা যেন আরো অচেনা, রহস্যময় হয়ে উঠছে।—'

—'তোমার ছোটভাই তো স্কুলে পড়ে? বয়স কত তার?—'

—'বয়স কম। আমার চেয়ে অনেক ছোট। ষোল-সতেরোর বেশী নয়। এ-বছর সে হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে।'

—'তাকে নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা কেন?' রীতাবরী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল। সে বোধহয় পড়াশুনো করে না। পাড়ার বাজে-বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?—'

—'উহুঁ,' কিরণ মাথা নাড়ল, 'বরং তার উল্টোটাই ধরতে পার। আমার ছোটভাই ভালো ছেলে। বাজে-বখাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে কখনও মেশে না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করে। ক্লাসের সে ফার্স্ট-বয়। এমন কি হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে ওর নাম দেখলে আমি একটুও আশ্চর্য হ'ব না।'

—'তাহলে এত ভাবনা কিসের?' রীতাবরী প্রশংসার সুরে বলে উঠল, তোমার ভাই তো রীতিমত ভালো ছেলে।'

—'হ্যাঁ, ভালো ছেলে বলেই তো এত বেশী ভাবনা। জানো রীতাবরী, হিরু যদি পড়াশুনোয় খারাপ হত, বাজে-বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে ক্লাস পালিয়ে সিনেমায় লাইন দিত, বাড়িতে এসে হৈ-চৈ চেঁচামেচি করত তাহলে আমি ওকে বকে-ধমকে শাসন করে শোধরানোর চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে হিরু ভীষণ চুপচাপ। বাড়িতে সে একটি কথাও

বলে না। হিরু কি করে, কোথায় যায়। কাদের সঙ্গে মেশে জানবার কোনো উপায় নেই।'

রীতাবরী মৃদু গলায় বলল,—'তুমি ওকে বুঝিয়ে দিলেই পার—'

'মিথ্যে চেষ্টা।' কিরণ ম্লান হাসল। 'তোমাকে বলেছি না? আমার ছোটভাই ভালো ছেলে। সমস্যা তো সেখানেই। ভালো ছেলেরা সব ব্যাপারেই সিরিয়াস। হাল্কাভাবে কিছু নেয় না। শুধু পড়াশুনো নয়, অন্য যে পথেই যাক না কেন, তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা বড় কঠিন। প্রায় অসাধ্য ব্যাপার।'

বিকেল প্রায় গড়িয়ে এল। সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে। মনোরম অপরাহ্ণ। আকাশ উজ্জ্বল নীল....পৃথিবী এত স্নিগ্ধ, শান্ত মনে হয়।

সেদিকে তাকিয়ে কিরণ আবার বলল,—আমার ভয় হয় রীতাবরী, হিরু কি করছে আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। তবে সে কথা মা-বাবা কাউকে বলা যায় না। কিন্তু আগ্নেয়গিরি তো লুকিয়ে থাকে না। একদিন জেগে উঠবেই। তখন সেই হঠাৎ বিস্ফোরণের ধাক্কা কি আমার বাড়ির লোকে সামলাতে পারবে?'

## ॥ চৌদ্দ ॥

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে কিরণ একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। তাকে বেশ গম্ভীর এবং ঈষৎ দুঃখিত মনে হল। কপালে কুঞ্চিত রেখা, চোখ দুটি চিন্তার ভারে ছোট। কিরণ স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কিছু ভাবছিল।

রীতাবরী বলল,—'সত্যি, তোমার ছোট ভাইকে নিয়ে খুব দুর্ভাবনায় পড়েছ দেখছি। অবশ্য এরকম চিন্তা তোমার একার নয়, আরো অনেকের। কলকাতায় এখন অল্প বয়সী ছেলেদের নিয়ে নানা সমস্যা। আর দিন দিন দেশের যা হাল হচ্ছে। স্কুল-কলেজ পড়াশুনোর বালাই নেই, নামে পরীক্ষা

হয়,—কিন্তু আকছার টোকাটুকি। যারা পাশ করে বেরোয়, তারা বেকার। যেমন হোক একটা চাকরির জন্যে সর্বত্র মাথা ঠুকে বেড়াচ্ছে। তারপর পাড়ায় পাড়ায় বোমবাজি, দুই দলে মারামারি, খুনোখুনি। এরকম একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছেলেমেয়েরা মানুষ হবে কেমন করে? তাদের সামনে কি কোনো আদর্শ আছে?'

কিরণ মনোযোগী ছাত্রের মত ওর কথাগুলি শুনছিল। কোনো বিষয়েই চুপ করে থাকা তার স্বভাব নয়। তবু আজ সে কোনো কথা বলল না।

কয়েক মুহূর্ত দুজনে চুপ করে রইল। রীতাবরী ফের বলল,—'অবশ্য একটা কাজ করলে পার। হিরুকে যদি কলকাতার বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দাও, এবং সেখানেই রাখার ব্যবস্থা করতে পার তাহলে হয়তো সমস্যার একটা সমাধান হবে। এখানকার পরিবেশ, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা আর সঙ্গ থেকে ওকে এখনই সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। দূরে গেলেই হিরুর স্বভাব পাল্টাবে। ফের, স্বাভাবিক হতে দেরি হবে না।'

কিরণ মাথা নেড়ে বলল,—'আমার তা মনে হয় না রীতাবরী। হিরুকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি। একধরনের ছেলে আছে যাদের ফার্ম কনভিকশন বা দৃঢ় প্রত্যয় একবার মনে জন্মালে তার মূলোচ্ছেদ করা কঠিন। হিরু সেই দলের। সে যা বলে, তা শুধু মুখে উচ্চারণ করে না। মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। সমস্যা তো সেখানেই। তাছাড়া হিরুর সঙ্গে এসব ব্যাপারে কোনো কথা বলাও বিপজ্জনক। সে ভীষণ চুপচাপ এবং বাড়িতে একা থাকতে পছন্দ করে। কথা কইতে গেলেও হিরু পারতপক্ষে মুখ খোলে না। সাধ্যমতো এড়িয়ে যেতে চায়। যদি বা কখনো দু-একটা উত্তর দেয়, তাহলেও মুস্কিল। আলোচনাটা ক্রমেই অপ্রীতিকর এবং চরমে উঠতে বাধ্য। আসলে হিরু যা বিশ্বাস করে তা মনের মধ্যে কঠিন ইস্পাতের রূপ নিয়েছে। সেখানে আঘাত পড়লে স্বভাবতই হিরু চঞ্চল হয়। প্রতিবাদ করে, কখনো বা ক্ষেপে ওঠে।'

কথা শেষ করে কিরণ ফের ভুরু কোঁচকাল। বার দুই-তিন সিগারেট টানল। ঠিক ইঞ্জিনের মত নাক মুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে সে আবার বলল,—অবশ্য তুমি যা বলছ, সে ব্যবস্থা এমনিতেই হচ্ছে। জানুয়ারী

মাসের প্রথমেই বাবা চন্দনপুরে চলে যাবেন। এবার সেখানেই থাকবেন। কলকাতায় আর ফিরবেন না। অমিয় বারিক লেনের বাড়িটা তাই আমরা ছেড়ে দিচ্ছি।'

—'হঠাৎ বাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছ যে?' রীতাবরী অবাক হয়ে শুধোল, 'বাবা চন্দনপুরে যাবেন কেন? সে জায়গাটা কোথায়?'

—'বাংলাদেশের মানচিত্রে চন্দনপুর নিশ্চয় একটা ছোট্ট বিন্দুও নয়। বড় জোর একটা পাখি-ডাকা গ্রাম বলতে পার।' ফের গলার স্বর কিঞ্চিৎ গাঢ় করে সে বলল,—'কিন্তু আমার বাবার কাছে সেই গ্রাম একটা স্বপ্নের মত। জানো রীতাবরী, বাবা সেদিনও বলছিলেন আমাদের চন্দনপুরের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা গন্ধরাজ গাছ আছে। ডালপালায় এখন প্রকাণ্ড হয়েছে সেটা। রোজ ভোরে গন্ধরাজ গাছটার ডালে বসে একটা পাখি নাকি সুন্দর শীস্ দেয়।'

—'ও, বুঝতে পেরেছি। রীতাবরী মিষ্টি হাসল। 'চন্দনপুরে তোমাদের দেশ তাই না?'

—'হ্যাঁ, চন্দনপুরে পৈতৃক আমলের ঘরদোর সারিয়ে বাবা প্রায় নতুন বাড়ি করে ফেলেছেন। দোতালায় দু'খানা ঘর উঠেছে। এই তো সেদিন ভিতরে চুনকাম, বাইরেটা রঙ হল। বাবার ইচ্ছে রিটায়ার করে তিনি এবার চন্দনপুরেই বাস করবেন।'

—'তাই নাকি? সব ঠিকঠাক?'

—'হ্যাঁ, প্রায় ঠিক।' কিরণ একটু ধরা গলায় বলল, ডিসেম্বর মাসে বাবা রিটায়ার করছেন। আর জানুয়ারী মাসের প্রথমেই উনি চন্দনপুরে চলে যাবেন। কলকাতার বাসাটা আমরা তাই ছেড়ে দেব। ততদিনে বিন্তির পরীক্ষা, হিরুর টেস্ট সব চুকে যাবে। চন্দনপুরে গিয়ে বিন্তি ওখানকার স্কুলে ভর্তি হবে। আর পাশ টাশ করে হিরু পড়বে বাঁকুড়ার কলেজে।'

'—ভালো ব্যবস্থা।' রীতাবরী চোখ তুলে তাকাল। 'কিন্তু তোমার মা, ভাই-বোন এরা সবাই কলকাতা ছেড়ে চন্দনপুরে গিয়ে থাকতে রাজি তো?'

—'কেউ রাজি নয়। অবশ্য হিরু ছাড়া। তার মত বা অমত কিছুই বলে না। তবে চন্দনপুরে যেতে মায়ের ভীষণ আপত্তি। আর বিন্তি? ওর জন্যেই আমার কষ্ট হয়। বেচারী! কলকাতা ছেড়ে কখনও তে-রাত্তির কাটায় নি।'

—'তাহলে?' রীতাবরী রাজহংসীর মত গ্রীবা বাড়িয়ে কথা কইল। 'বিন্তি কেমন করে গ্রামে গিয়ে থাকবে?'

—'কি জানি।' সিগারেটের মুখের ছাইটুকু ঝেড়ে নিয়ে কিরণ স্বগতোক্তির মত বলল, 'আমার বোনকে তুমি দেখনি। বিন্তির চেহারা ভারী সুন্দর। চমৎকার নাচতে পারে। ইতিমধ্যে ওর এক-আধটু নামও হয়েছে। ফাংশনে, ছোটখাটো থিয়েটারে, নাচের জন্য ওকে সাধাসাধি করে নিয়ে যায়। মা তাই বলে চন্দনপুরে যাওয়ার আগে বিন্তির একটা কিছু ব্যবস্থা করিস। ওই নাচুনী মেয়ে চন্দনপুরের মত গ্রামে গিয়ে কিছুতেই থাকতে পারবে না।'

—'মা ঠিকই বলেন।' রীতাবরী চোখ ঘুরিয়ে বিচিত্র হাসল। পরে মন্তব্য করল,—কলকাতায় একবার বাস করে কোনো মেয়ে কখনও গ্রামে গিয়ে থাকতে পারে?'

কিরণ ম্লান মুখ করে বলল,—'সেকথা আমি ভেবেছি রীতাবরী। চন্দনপুরে গিয়ে আমার মায়ের খুব কষ্ট হবে। আর বিন্তির অবস্থা ভাবতেও পারি না। বনের পাখিকে খাঁচায় পুরে দিলে যেমন মন-মরা হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে, ওর ঠিক তেমনি দৃশ্য হবে। তবু উপায় নেই। প্রথম দিকে আমি আর দাদা দুজনে মিলে বাবাকে অনেক বুঝিয়েছি। চন্দনপুরের বাড়ির পিছনে এত টাকা অপব্যয় হচ্ছে। মা কত ঝগড়াঝাটি করেছে। এমন মহানগরী ছেড়ে কেউ কখনও গ্রামে বাস করতে যায়? কি আছে সেখানে? সন্ধ্যের পর ঘন অন্ধকার, রাত বাড়লেই ভুতুড়ে বাতাস। অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যি নেই। বিনা চিকিৎসায় ভুগে মর। তবু বাবা অটল। আমাদের কথা শুনে মৃদু হেসেছেন। মাঝে মাঝে দু-একটা উত্তর দিয়েছেন, এই পর্যন্ত। কিন্তু চন্দনপুরে দোতালার ঘর উঠেছে। ভিতরে চুনকাম, বাইরেটা রঙ। কিছুই বাদ যায় নি।'

—'কিন্তু সকলের এত অসুবিধে হবে জেনেও উনি চন্দনপুরে যাবেন?'

—'হ্যাঁ, যাবেন। কারণ কি জানো রীতাবরী? চন্দনপুরের বাড়িটা তো শুধু বাড়ি নয়। ওটা আমার বাবার মনের স্বপ্ন।'

—'স্বপ্ন?'

—'হ্যাঁ স্বপ্ন ছাড়া আর কি বলব? আমাদের প্রত্যেকের মনের ভিতরেই এমনি স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। তিল তিল করে আমরা সেই স্বপ্নের বাড়িটাকে গড়তে চাইছি। এতদিন বাবা তাই করেছেন। মা ব্যাপারটা বোঝে না। রাগ করে বলে—'চন্দনপুরের বাড়ি নয়—,ও তোমার নেশা। এক হিসেবে মা হয়তো ঠিক কথাই বলে। স্বপ্ন মানে কিছুটা নেশা বৈকি।' একটু থেমে সে ধীরে ধীরে বলল,—মাঝে 'মাঝে আমার মনে হয়, হিরুর উপর বোধহয় আমরা মিছিমিছি রাগ করছি। ওর মনের ভিতরেও নিশ্চয় একটা স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। একা একা হিরু বোধহয় সেই স্বপ্নের বাড়িটার কথাই ভাবে।'

রীতাবরী একটু চিন্তা করে বলল,—'কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়িটা ছেড়ে দিলে তোমরা থাকবে কোথায়? তুমি? তোমার দাদা?'

—'দাদার জন্যে চিন্তা নেই। সে বোধহয় আর এ দেশেই থাকছে না। ইউনাইটেড স্টেটস্ মানে আমেরিকায় একটা চাকরি পাচ্ছে।'

—'ওমা! তাই নাকি?' রীতাবরী খুশির সঙ্গে বলল, 'কি সুখবর! একটা প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজও বলতে পার।'

—'সত্যি। সারপ্রাইজ নিশ্চয়। অন্তত দাদার জীবনে। জানো রীতাবরী, আমি পাশ করে ডাক্তার হয়েছি। হাসপাতালে ফিজিশিয়ানের কাজ করি। কিন্তু দাদা আমার চেয়ে অনেক ব্রিলিয়্যাণ্ট ছাত্র ছিল। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট মানে স্কলারসিপ পেয়েছে। তবু ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দাদা দু-বছর বেকার হয়ে রইল। অনেক চেষ্টা করেও কিছু জুটল না। শেষে একটা চাকরি পেল বটে কিন্তু সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং নয়—অতি সাধারণ কেরানীগিরি।'

'তা হোক গে। ওসব কথা এখন আর কেউ মনে রাখবে না। সবাই বলবে, উনি ফরেনে আছেন। বড় ইঞ্জিনিয়ারের পোস্টে। রীতাবরী চোখ

নাচিয়ে মনোরম একটি ভঙ্গি করল। ফের মৃদু হেসে জানতে চাইল,—'কিন্তু তুমি থাকবে কোথায় বললে না?'

—'তার জন্যে ভাবনা নেই। আমাদের ডিপার্টমেণ্টের তিন-চারজন হাউস-স্টাফ একটা কোয়ার্টার নিয়ে মেস করে আছে। আপাততঃ কিছুদিন ওদের সঙ্গেই থেকে যাব। তারপর চাকরি-বাকরি পেলে কিংবা প্রাকটিশে নামলে আমি নিজে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করব।'

—'ফ্ল্যাট?'

'—হ্যাঁ, খুব সুন্দর সাজানো গোছানো ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট। জানো রীতাবরী, অমিয় বারিক লেনের বাড়িটা আমার একটুও পছন্দ নয়। সেই নবাবী আমলে তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়। কেমন বুক-চাপা ঘর। লোহার শিক লাগানো ছোট ছোট জানালা, সিঁড়িটা কি রকম স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার। তাই বাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হবে শুনে আমি খুব একটা আপত্তি করিনি।'

—'সত্যি।' রীতাবরী কেমন আবদেরে গলায় কথা কইল। 'ছোট হোক, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু নিজের পছন্দমত ফ্ল্যাট না হলে কেমন মন ভরে না।' মুখ টিপে হেসে সে ফের শুধোল,—'তোমার কোথায় ফ্ল্যাট নেবার ইচ্ছে আমাকে বলবে না?'

এই অপরাহ্নের পড়ন্ত আলোয় রীতাবরীর মুখখানি ভারী উজ্জ্বল, অপূর্ব মনে হয়। যেন কোনো দক্ষ শিল্পীর তুলিতে আঁকা একখানি ছবি। ওর দুই চোখের তারায় কুয়াশার মত নরম স্বপ্নের ইশারা। রীতাবরীর শাড়ির আঁচলে, মৌচাকের মত মস্ত খোঁপায় গায়ে-পায়ে সর্বত্র মিষ্টি নিস্তেজ রোদ্দুর।

কিরণ ওর মুখের উপর চোখ রেখে বলল,—'আমি চেষ্টা করব সাউথের দিকে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করতে।'

—'সত্যি?' রীতাবরী প্রায় ফিসফিস করে বলল। 'জানো, আমারও মনে মনে তাই ইচ্ছে। তুমি ফ্ল্যাট নাও আগে, তারপর একদিন নিয়ে যেও। আমি নিজের হাতে তোমার ঘর-দোর সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে আসব।—'

—'বারে! এ কি রকম কথা?' কিরণ ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'সেই ফ্ল্যাটটা আমার একার বাড়ি হবে নাকি? যে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে তুমি ফের চলে আসবে।'

কিরণের কথায় রীতাবরী ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। মুখ না তুলে সে ধীরে ধীরে বলল,—'কি জানি, আজকাল আমার কেমন ভয় ভয় লাগে। রাত্তির বেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কিছুতেই আর দু-চোখের পাতা এক হয় না। তখন চুপচাপ শুয়ে নানা কথা চিন্তা করি। তোমার কথা, এমনি একটা ফ্ল্যাটের কথা, মাথা-মুণ্ড কত কি ভাবি। মাঝে মাঝে মনে হয় হিরুর মত আমিও বোধহয় বাড়িতে একটা সমস্যার প্রাচীর সৃষ্টি করছি।'

—'সমস্যা?'

—'হ্যাঁ, কথাটা তোমাকে বলব ভাবছিলাম। কিন্তু তোমার নিজের যা দুর্ভাবনা।' রীতাবরী এক মুহূর্ত থামল। ফের মুখ নীচু করে সলজ্জভাবে বলল—'জানো, বাবা আমার জন্য পাত্র খুঁজছেন।'

'তাই নাকি?' কিরণ সোৎসাহে সোজা হয়ে বসল। 'এর জন্যে আবার চিন্তা কিসের? দিস ইজ এ গুড নিউজ।' সে গলা বাড়িয়ে পরামর্শ দেবার ভঙ্গিতে বলল.—'তুমি এবার বাবাকে কথাটা জানিয়ে দাও।'

—'কি জানাব?' রীতাবরী ভুরু কুঁচকে মুচকি হাসল।

—'আহা! ন্যাকা মেয়ে।' কিরণের ইচ্ছে করছিল আদর করে ওর নরম গাল দুটো টিপে দেয়। কিন্তু কোনোদিন তা করেনি। হঠাৎ রীতাবরী যদি ফুঁসে ওঠে। তাছাড়া কাছাকাছি এখানে লোকজন। এমন একটা দৃশ্য দেখলে তারা কি মনে করবে? কিরণ তাই গলা খাটো করে বলল, যা সত্যি, তাই জানাবে। বাবার কাছে কিছু গোপন রেখ না। বলবে, ছেলে ডাক্তার, নাম কিরণ রায়। থাকে সাতাস নম্বর অমিয় বারিক লেনে। তুমি ওর সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর বাবা।'

—'পাগল।' রীতাবরী একটা কটাক্ষ করে তাকাল। 'এই সব কথা আমি কখনও বলতে পারি? আমার বুঝি লজ্জা করে না?'

—'তাহলে আমাকে গিয়ে কথাটা নিবেদন করতে হয়। কিরণ থিয়েটারী ঢঙে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'আর, তো দেরি করা যায় না।'

—'ছি, ছি! তুমি যাবে কেন? সে আরো বিশ্রী কেলেঙ্কারী ব্যাপার হবে।' রীতাবরী আপত্তির ঝড় তুলল। 'তুমি অমন বেহায়ার মত আমাদের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালে আমি লজ্জায় মরে যাব।'

—'তাহলে উপায় কি?' কিরণ অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। 'তোমার বাবা-মা আমাদের দুজনের কথা জানবেন কেমন করে?'

ঘাসের একটা লম্বা শীষ ছিঁড়ে রীতাবরী দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল,—'দিনরাত্তির তাই ভাবি কিরণ। তোমার কথা মা-বাবাকে কেমন করে জানাব? ভয়ে-ভাবনায় আমার বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করে। অথচ না বলে আর উপায় নেই। আর ব্যাপারটা গোপন রাখার কোনো অর্থ হয় না।'

—'তাহলে আর দেরি ক'র না। সুযোগ পেলেই কথাটা বাড়িতে জানিও।'

—'হ্যাঁ, জানাব বৈকি। নিশ্চয় জানাব।' রীতাবরী প্রায় বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে সে গাঢ়স্বরে বলল,—একটু আগে তুমি স্বপ্নের বাড়ির কথা বলছিলে না? আমাদের প্রত্যেকের মনের ভিতরে একটা স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। তিল তিল করে আমরা সেই স্বপ্নের বাড়িটাকে গড়ছি। জানো কিরণ, আমার চিন্তা-ভাবনা শুধু সেই বাড়িটাকে নিয়ে। তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই। মনে মনে আমিও একটা স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করে রেখেছি। ভয় হয়, বাবার কাছে তোমার কথা বলবার পর সেই স্বপ্ন না আবার মেঘের প্রাসাদের মত অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়।'

—'অন্ধকারে ঢাকা পড়বে কেন? এত ভয় কিসের তোমার?' কিরণ চিন্তিতভাবে শুধোল।

—'ঠিক ভয় নয় কিরণ। বরং দুর্ভাবনা বলতে পার।' রীতাবরী ম্লান হাসল। 'আমার বাবাকে তুমি দেখনি। ভীষণ গম্ভীর আর তেমনি জেদী মানুষ। তার স্বভাব ঠিক পাহাড়-পর্বতের মত। পাহাড়ের মতই তাকে নড়ানো যায় না। কোনো ব্যাপারে একবার না বললে বাবাকে ফের রাজি করানো প্রায় অসম্ভব।'

—'আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে উনি আপত্তি করবেন? মানে রাজি হবেন না বলে মনে হয়?'

—'কি জানি।' রীতাবরী ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'রাজি হবেন তাই বা কোন ভরসায় বলি? বংশগৌরবের কথা বলতে বাবা এখনও অজ্ঞান। তাঁর কাছেই শুনেছি যে আমরা নিমতার বিখ্যাত গোস্বামী বংশ। ঠাকুর্দা ভারতচন্দ্র গোস্বামী স্মৃতিজ্যোতির্বিশারদ তখনকার দিনে পণ্ডিত ব্যক্তি বলে সম্মান পেয়েছেন। বাবা নিজে কলেজের অধ্যাপক,—সংস্কৃতে এম, এ,। তাছাড়া কাব্য-ন্যায়-স্মৃতিতীর্থ। নিজের মেয়ের অসবর্ণ বিয়ে দিতে উনি রাজি হবেন, এমন কথা কি জোর করে বলতে পারি?'

বংশ-গৌরবের কথা শুনতে কিরণের ভালো লাগছিল না। এই যুগে আবার কেউ ওসব কথা বলে? না তাই নিয়ে বড়াই করে? অথচ রীতাবরীর কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন গর্বের সুর। তার বাবার মত সে নিজেও বংশগৌরবে বিশ্বাস করে নাকি?

কিরণের ইচ্ছে করছিল রীতাবরীকে তার স্বপ্নের বাড়িটার কথা জিজ্ঞাসা করে। তার বাবা যদি অসবর্ণ বিয়েতে রাজি না হন? শেষ পর্যন্ত বংশগৌরব দুজনের মধ্যে প্রাচীর প্রমাণ বাধা সৃষ্টি করে? তাহলে রীতাবরী কি করবে? স্বপ্নের বাড়িটা কি অন্ধকারের আড়ালে ঢাকা পড়বে? আর রীতাবরী সেই অবস্থা মেনে নিতে রাজি? জলে নেমে সে কি ভয় পেয়ে ডাঙায় উঠতে চাইবে?

গঙ্গার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জলে রক্তমেঘস্তূপের ঘন ছায়া। একটা সমুদ্রগামী বিদেশী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে চার-পাঁচজন লোক বোধহয় নদী-তীরের শোভা লক্ষ্য করছে। তাদের মত আর একজোড়া যুবক-যুবতী হাসি-হাসি মুখে খানিকটা দূরে ঘাসের উপর পাশাপাশি বসল।

রীতাবরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—'চল, আর দেরি করব না, বাড়ি পৌঁছতে নিশ্চয় সন্ধ্যে পেরিয়ে যাবে।'

দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছিল। প্রায় নিঃশব্দে। অন্যদিন রীতাবরী কত কথা বলে। সমস্ত পথ অনর্গল বকবক করে। ওর কথা শুনতে কিরণের এত ভালো লাগে। হাল্কা পালকের মত শব্দগুলি ওর মুখ থেকে নিঃসৃত

হয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। অথচ আজ কোথায় যেন একটা ছন্দপতন। গান গাইতে বারবার তাল কেটে যাচ্ছে। আর এই মুহূর্তে রীতাবরী কি অসম্ভব গম্ভীর। পাকা ফোড়ার মত আড়ষ্ট মুখ। ওর মনের চেহারাটা একনজর তাকিয়ে কিরণ আন্দাজ করতে পারে।

বাস স্টপে এসে কিরণ বলল,—'আমার একটু ধর্মতলায় কাজ আছে। তোমাকে শেয়ালদার বাসে তুলে দিয়ে যাই, কেমন ?'

—'ধর্মতলায় এখন কি দরকার ?'

—'কয়েকটা ওষুধ নেব। সকাল থেকে মায়ের জ্বর। বেরোবার সময় একশ' এক ডিগ্রির মত দেখেছি। তাছাড়া বাবার জন্যেও একটা সিডেটিভ্ দরকার।'

—'কি হয়েছে মায়ের ?' রীতাবরী চিন্তিতভাবে শুধোল। 'তুমি তো এতক্ষণ বল নি।'

—'তেমন কিছু নয়।' কিরণ ঈষৎ হাসল। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে বলে মনে হয়। অনিয়ম, অত্যাচারে একটু বেড়েছে। 'দু-একদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে।'

রীতাবরীকে বাসে তুলে দেওয়ার আগে কিরণ জানতে চাইল,—'তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হচ্ছে ?'

—'কবে দেখা হলে তুমি খুশি হও বল।'

—'বারে, আমি কি বলব ? তোমার যেমন সুবিধে।'

রীতাবরী একটু ভেবে বলল,—'সামনের শনিবার এস না।'

—'সামনের শনিবার ? সে তো অনেক দেরি।' কিরণ ম্লান হাসল। ফের বলল,—'বেশ কোথায় দেখা হবে বল।'

—'ওয়াই এম সি এ-র সামনে থেক। বেলা আড়াইটের সময়।' রীতাবরী চোখ নাচিয়ে বাকিটুকু ইঙ্গিতে বোঝাল।

বাসটা চলতে শুরু করলে কিরণ শূন্য দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আজ সমস্ত দিনটা কেমন বেসুরো কাটছে তার। এক একটা দিন এমনি হয়,...সব কাজেই ব্যর্থতা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সে এক কাপ চা পায় নি। তখন বোঝা উচিত ছিল তার, ঝুটঝামেলা আরো

আছে। রাতের সারবন্দী গরুরগাড়ির মত ওরা এগিয়ে আসবে। মায়ের জ্বর, হিরুর গোঁয়াতুর্মি, বিন্তির প্যাঁচার মত মুখ, রীতাবরীর বংশগৌরব,— আজ বাড়ি ফিরে আবার কি শুনবে কে জানে!

কিরণ হাঁটছিল। মাঠে-ময়দানে পাতলা ছায়ার মতো অন্ধকার ঘন হচ্ছে। শীতের বেলা কখন নিঃশেষ। আলোকমালায় চৌরঙ্গীর এখন মোহিনী বেশ। উঁচু বাড়ির মাথায় বৈদ্যুতিক আলোর কৌশলে ঝলমলে বিজ্ঞাপন। সেলাই-মেসিন, একটা সিগারেট কোম্পানীর প্রতীক ছবি, অথবা গরম কেৎলি থেকে নিপুণভাবে কাপে চা ঢালা হচ্ছে। ফুটপাতে রাজপথে, নানা রকম সামগ্রীর বেচাকেনা। একধরণের রঙীন কার্ডের উপর প্রায় নগ্ন যুবতীর ছবি। তুমি যে কোনো দিক থেকেই দেখ না কেন, সেটা চোখ মিটমিট করে নির্লজ্জভাবে তোমার দিকে তাকিয়ে হাসবে। তিন চারজন অল্পবয়সী ছোকরা একটা ছবি ঘুরিয়ে নানা ভঙ্গিমায় লক্ষ্য করছে।

ধর্মতলায় ঢুকতেই কে একজন তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল— কলেজ গার্ল স্যার। ভেরি বিউটিফুল। ওনলি সিক্সটিন। খুব কাছেই। যদি চান তো ফটো দেখাতে পারি।'

কিরণ মুখ তুলে তাকাল। লোকটার পরনে ফুলপ্যান্ট গায়ে বুশসার্ট, মুখে বসন্তের কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন। একটা চোখ ঈষৎ ছোট করে সে তার দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে হাসছে।

কিরণের ইচ্ছে করছিল ওই দালালটার গালে সশব্দে একটি চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু এদেশে তার অর্থই ফ্যাসাদ। বরং ওর সঙ্গে একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে এখুনি একটা হৈ-চৈ কাণ্ড। রাস্তার উপর ভিড় জমবে। এমন কি কেউ সস্তা রসিকতা করতে পারে। তাই নিয়ে কিছু বলতে গেলেও বিপত্তি।

চাঁদনীর কাছে একটা ওষুধের দোকান। পরিতোষ সেখানে সন্ধ্যের দিকে আসে। দোকানের সঙ্গে একটা ছোট চেম্বার আছে। সকাল-সন্ধ্যে তিন-চারজন ছোকরা ডাক্তার পালা করে বসে। রোগ পরীক্ষা করে ওষুধের প্রেসক্রিপশন লেখা হয়। ডাক্তারের ফিজ্ নামমাত্র। কিন্তু ওষুধের কাটতি বাড়ছে। সুতরাং দোকানের আয় বৃদ্ধির দিকে।

চেম্বারে লোক ছিল না। তাকে দেখে পরিতোষ মহাখুশি। ড্রয়ার থেকে দামী বিলিতী সিগারেটের প্যাকেট বের করে বন্ধুকে আপ্যায়িত করল। 'তারপর, তোর সেই গার্ল-ফ্রেণ্ডের খবর কি বল? কবে বিয়ে করছিস ওকে?'

—'বাজে কথা রাখ।' কিরণ আঙুল বাড়িয়ে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে বলল। 'গোটা দুই ঘুমের বড়ি দিতে পারিস?'

—'ঘুমের বড়ি?' পরিতোষ মুচকি হাসল। 'তোর অবস্থা কাহিল দেখছি। প্রেমে এমন হাবুডুবু খাচ্ছিস যে রাত্তিরে ঘুম হয় না?'

—'ঘুমের বড়ি আমার লাগবে না। ওটা বাবার জন্য।' কিরণ সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে বলল। "কাল রাত্তিরে বাবার ভালো ঘুম হয় নি। নিশ্চয় প্রেসার বেড়েছে। ডকটর সিন্‌হা বলেছেন অসুবিধে মনে হলে ট্র্যাঙ্কুলাইজার ব্যবহার করতে। তাছাড়া উপায় নেই।—

ব্যাগ হাতড়ে পরিতোষ একটা শিশি খুঁজে বের করল। আনকোরা নতুন। এখনও সীল খোলা হয় নি। বলল,—'এটা নিয়ে যা। বাড়িতে রেখে দিবি।' ফের মুচকি হেসে মন্তব্য করল—'প্রেমে যা মজেছিস, এর পর তোর নিজেরই প্রয়োজনে লাগবে।'

শুধু ঘুমের বড়ি নয়। কিরণ তার মায়ের জন্যও কয়েকটা ট্যাবলেট নিল। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে বলে মনে হয়। এখনই কিছু দেবার প্রয়োজন নেই। তবু এক-আধটু ওষুধ খেলে রোগ আর বাড়বে না। গায়ের ব্যথা, মাথা-ধরা এবং অন্যান্য উপসর্গগুলি কমবে।

দরজার কাছে কে একজন উঁকি দিতেই পরিতোষ ব্যস্ত হয়ে বলল,—'আরে, আসুন আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি।'

কিরণ মাথা তুলে দেখল। তাদের মত অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক। পরনে পাতলুন, পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। মাথার চুল অবিন্যস্ত। চিন্তিত মুখ।

কিরণের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে বলল,—'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছুতেই আসতে চায় না, বুঝলেন?'

—'না, না। ওকে নিয়ে আসুন। দু-একটা প্রশ্ন করা নিতান্ত দরকার। এত লজ্জা করলে চলবে কেন?' পরিতোষ স্পষ্ট জানালো।...

সে এসে চেম্বারে ঢুকতেই কিরণ উঠে দাঁড়াল। তার খুব কৌতূহল হচ্ছিল। মেয়েটির বয়স বেশী নয়। আঠার-উনিশ কিম্বা আরো কম। দিব্যি সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এখনও বিয়ে হয় নি। কি ব্যাধি ওর? কি এমন অসুখ যার জন্য পরিতোষের কাছে আসতে হয়েছে?

মিনিট পাঁচ-সাত পরেই ওরা চেম্বার থেকে বেরোল। কিরণ বাইরে কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিল। পরিতোষ ফের তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। পুনরায় সিগারেট অফার করে বলল,—'দাঁড়া, দু-কাপ চা আনতে বলি।'

—'ওই মেয়েটির কি হয়েছে পরিতোষ? কি অসুখ?' কিরণ কৌতূহলের সঙ্গে কথা কইল।

—'কি অসুখ বুঝতে পারলিনে?' পরিতোষ ভুরু কুঁচকে রহস্যের সৃষ্টি করল। ফের মুচকি হেসে বলল,—'মেয়েটির একটা অপারেশন করতে হবে।'

—'অপারেশন?'

—'হ্যাঁ, আমরা যাকে বলি ডি, এন, সি অর্থাৎ ডাইলেটেশন অ্যাণ্ড কিউরেটিং।' পরিতোষ অনায়াসে জবাব দিল। 'পেটের কাঁটা পরিষ্কার করতে হলে এ ছাড়া আর উপায় কি বল?'

## ॥ পনের ॥

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পরিতোষ বলল—'ব্যাপারটা কিন্তু টপ সিক্রেট। তোর কাছে আবার ফাঁস করে ফেললাম।'

—'সিক্রেট বুঝি?' কিরণ মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু অপারেশন কোথায় হবে? মৃণালিনী নার্সিং হোমে?'

—'যেখানে হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে।' পরিতোষ ভুরু কোঁচকাল। মৃণালিনী নার্সিং হোমেও করা যায়। তবে ওখানে চার্জ একটু বেশী। কিন্তু পার্টি যদি রাজী থাকে, তাহলে অসুবিধে নেই। মৃণালিনী নার্সিং হোমেও অপারেশন হতে পারে।'

কিরণ একটু চিন্তা করে বলল,—কিন্তু নার্সিং হোমে কত লোকজন। নানা ধরনের কেস। এই সব ঝামেলার কাজ গেলে জানাজানির ভয় নেই? মানে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সিক্রেট থাকবে তো?'

ঝামেলা কিসের?' পরিতোষ হাসল। 'মোটে দু-একদিনের ব্যাপার। কোথায় কি হয়ে গেল কাকপক্ষীতে টের পাবে না।' একটু থেমে সে আবার বলল,—'অবশ্য তোর দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারছি। একটা অবিবাহিতা মেয়েকে হুট করে নার্সিং হোমে ভর্তি করলে পাঁচজনে নানা রকম ভাবে। তেমন মনে হলে দুদিনের জন্য মাথায় একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে আসতে বলি। ব্যস্, আর সন্দেহ টন্দেহের বালাই থাকে না।'

কিরণ চুপ করে বন্ধুর কথা শুনছিল। পরিতোষ ফের বলল,—'তাছাড়া শহরে কার জন্যে কার মাথাব্যথা? এত মানুষ, এত মুখ। শহর তো নয়, যেন একটা মহাসাগর। কার গোপন কথা কে মনে রাখছে বল?'

সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিয়ে কিরণ মন্তব্য করল—'এসব কেসে তুই বেশ রপ্ত হয়ে গেছিস বলে মনে হচ্ছে।'

—কিছুটা হয়েছি।' পরিতোষ ঈষৎ গর্বের সুরে কথা কইল। বন্ধুকে বলল,—'দেশের হালচাল তো দেখছিস, মেয়েদের কোমরের নীচে শাড়ি, আধ-গজ কাপড়ের ছোট্ট জামা। ছেলেদের মুখে হিন্দি সিনেমার চটুল গান। তাছাড়া নানা ধরনের থিয়েটার ফাংশন। আজকাল মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে এরকম কেস প্রায়ই আসে। অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় এড়াতে সত্যিকার স্বামী-স্ত্রীও এসে হাজির হচ্ছে।'

—'বলিস কি? তারাও আসে নাকি?'—কিরণ একটু অবাক হল।

—'আসবে না কেন ?' পরিতোষ মুচকি হাসল। 'ডাক্তার হয়েছিস। ব্যাপারটা নিশ্চয় তোর অজানা নয়। সবই অ্যাকসিডেণ্ট মানে জাস্ট একটা দুর্ঘটনার ফল। অথচ ছেলে আর মেয়ে যাই বল কেউ বেশী চায় না। আসলে বাড়তি ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট কার ভালো লাগে ? তাছাড়া এই আক্রার দিনে একটি সন্তানকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করে তোলা চাট্টিখানি কথা নয় ? কিন্তু একবার ফেঁসে গেলে তো আর উপায় নেই। তখন আমাদের মত ডাক্তারের দারস্থ হতে হবে।

পরিতোষের গায়ে বেশ দামী একটা টেরিকটের শার্ট। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে গলার কাছে এবং ঘাড়ের কাছে এবং ঘাড়ের নীচে বুলিয়ে নিয়ে বলল,—'তুই নিশ্চয় ভাবছিস কাজটা খুব নোংরা,—একটা মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট হয়ে পরিতোষ শেষপর্যন্ত এই সব করে পয়সা কামাচ্ছে। তোর কাছে স্বীকার করছি, এক-একটা কেসে টাকা কড়ি মন্দ আসে না। তবু বিশ্বাস কর প্রথম প্রথম আমারও খুব খারাপ লাগত। এই ফিসফাস আলোচনা, গোপনে অপারেশন, চুপিচুপি টাকা নেওয়া। তাছাড়া এসব কাজে একটা রিস্কও আছে। তবু আজকাল আমার মনে হয় কাজটার মধ্যে সবটাই বোধহয় অন্যায় নয়। কিছুটা ভালো মানে অন্যকে সাহায্য করবার একটা সৎ উদ্দেশ্যও রয়েছে।'

—'সাহায্য ?' কিরণ ভুরু কুঁচকে তাকাল।

—'সাহায্য নয় ? একটু আগে ওই মেয়েটিকে তো দেখলি। দিব্যি স্বাস্থ্যবতী নীরোগ দেহ। রূপসী না হলেও ওকে মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। বেচারী ভুল করে একবার অ-ঘাটায় পা দিয়েছে বলেই কি ও চিরকাল পতিত হয়ে থাকবে ? অথচ মেয়েটি কলেজে পড়ে। সামনের বছর বি-এ পরীক্ষা দেবে। বুঝতে না পেরে একটা ঝামেলায় ফেঁসে গিয়েছে। এই রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পেলেই ওর সামনে নতুন জীবন। আবার ওর বিয়ে-থা, ঘর-সংসার, ছেলেপুলে মানে একটা মেয়েমানুষ যা চায়, কল্পনা করে সব হতে পারে।'

কিরণ হেসে বলল,—'তুই কথা দিয়ে বেশ সুন্দর ছবি আঁকতে পারিস তো !'—

—'ছবি মানে কল্পনা নয়। আমি এমন কয়েকটা কেস জানি। এখন বিয়ে-থা করে তারা দিব্যি সুখে-শান্তিতে ছেলেপুলে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। আর এতে দোষের কি আছে? ইউরোপ-আমেরিকায় একটি মেয়ের সাতবার বিয়ে হয়। একগণ্ডা ছেলেমেয়ে নিয়ে এক স্বামীর ঘর ছেড়ে ফের অন্য স্বামীর ঘরে ঢোকে। তাদের লজ্জা-সরম, চোখের চামড়ার বালাই নেই। আর এ তো মুহূর্তের ভুল। মেয়েটির মুখের দিকে তুই তাকিয়েছিলি? ওর তুই চোখে কি করুণ মিনতি। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে এমন ভুল আর কোনোদিন করবে না।'

সিগারেটের মুখের ছাইটুকু ঝেড়ে নিয়ে পরিতোষ আবার বলল,—'আমাদের দেশের মেয়েরা পানকৌড়ি নয়। ওরা হাঁসের মত ডাঙায় উঠলেই পালক থেকে জল ঝরে পড়ে। তখন আর অন্যায়ের ছিটে-ফোঁটাটি গায়ে লেগে থাকে না।'

হাতঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে কিরণ ঈষৎ দুশ্চিন্তার সুরে বলল,—অনেক দেরি হয়ে গেল, আজ উঠি। দুপুরবেলায় মায়ের একশ' এক ডিগ্রী জ্বর দেখে বেরিয়েছিলাম। সন্ধ্যের পর বোধহয় বেড়েছে। এখন বাড়ি ফিরে কেমন দেখব কে জানে।'

—'এতক্ষণ কোথায় ছিলি? পরিতোষ জিজ্ঞাসা করল। 'নিশ্চয় তোর গার্ল ফ্রেণ্ডের সঙ্গে? সারাটা দুপুর জমাট আইসক্রিমের মত দুজনে বেশ মৌজে কাটালি, কি বল?'

কিরণ ঠোঁট ফাঁক করে অল্প একটু হাসল। 'তুই কি থটরিডিং জানিস, যে মুখ দেখেই মনের কথা টের পাবি?'

—'কারো কারো পাই।' পরিতোষ চোখ ঘুরিয়ে বেশ মজা করে বলল। 'তারপর তোর গার্ল-ফ্রেণ্ড মানে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করছিস কবে?'

—'বিয়ে হবে একথা তোকে কে বলল?' কিরণ যেন পাল্টা প্রশ্ন করল। ফের সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল,—'বাজে কথা রাখ। বরং তুই বল কবে বিলেত যাচ্ছিস।'

পরিতোষ মনে মনে একটা হিসেব খাড়া করে নিয়ে উত্তর দিল—

'নেকস্‌ট এপ্রিলের আগে হবে না। তার মানে আরো চার-পাঁচ মাস দেরি আছে।' কি ভেবে সে আবার বন্ধুকে শুধোল,…'কিন্তু তুই এরপর কি করতে চাস,—প্র্যাকটিস, না চাকরি?' বরং তার আগে একবার এম-আর-সি-পিটা করে আসবি চল। মনে রাখিস বিলিতী ডিগ্রী না থাকলে এদেশে ডাক্তারের কদর হয় না। এই একটি ব্যাপারে অন্তত তোর দেশের মানুষ বিলেতের দারুণ ভক্ত।'

ওষুধপত্রগুলো হাতে নিয়ে কিরণ উঠে দাঁড়াল। বলল,—'আচ্ছা তোর সঙ্গে আর একদিন এই নিয়ে কথা বলা যাবে। এখন চলি, কেমন?' সে আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানার উদ্দেশ্যে চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় লোকজন। আলোর মালা। ক্রেতাবিক্রেতার ভিড়। সন্ধ্যে হলেই ধর্মতলা-চৌরঙ্গী অঞ্চলের শিকারী নায়িকার বেশ। বিচিত্র সাজ-পোষাকের কত মেয়ে-পুরুষ। আঁটো-সাঁটো স্কার্ট-ফ্রকপরা ছুটো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছুঁড়ি চটুল হাসিতে সমস্ত পথটা ভরিয়ে গ্র্যাণ্ট স্ট্রীট ধরে জান-বাজারের দিকে গেল।

কিরণ দ্রুত হাঁটছিল। চৌরঙ্গীর মুখে সে বাসে উঠবে। রবিবার বলে রক্ষে। নইলে ছুটির পর সন্ধ্যের সময় বাসে যা ভিড়। একটা মাছি গলবে না,—তার মত একজন মানুষ কোথায় ঢুকবে?

সামনে দিয়ে একটা খালি ট্যাক্‌সি ধীরগতিতে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভারটা তার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল। কিরণের একবার ইচ্ছে হল ট্যাক্‌সিটা নেয়। কখন সেই দেড়টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে আর, এখন ঘড়িতে প্রায় সাতটার মত হবে। অনেক আগেই তার বাড়ি ফেরা উচিত ছিল। অন্তত মায়ের কথা ভেবে। এতক্ষণ মা কেমন আছে কে জানে? তার দাদা অর্থাৎ মিলন কি বাড়িতে থাকবে? হিরু নিশ্চয় কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে উধাও? আর বিস্তির আশা না করাই ভালো। মা মন্দ বলে না। ধিঙ্গি নাচুনী মেয়ে। থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে সে যথারীতি বিকেল বেলাতেই বেরিয়ে পড়েছে।

অমিয় বারিক লেনে ঢুকতেই কিরণের খুব খারাপ লাগল। মনের মধ্যে

অপরাধী বিবেক তস্করের মত ভয়ে জড়সড়। এতক্ষণ পরে বাড়িতে ঢুকে সে কেমন করে মুখ দেখাবে? তার বাবা এমনিতে ভালোমানুষ। সামনে কিছু বলে না। কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় ভাবে। সে ঘরে পা দিতেই তার মা শীর্ণ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলবে,—'কিরণ, এতক্ষণে আমার কথা মনে পড়ল বাবা?'

কিন্তু বাড়িতে ঢুকে সে প্রায় হতভম্ব। সকালবেলার সেই অস্বাভাবিক গুমোট আবহাওয়া গেল কোথায়? একটানা বৃষ্টিবাদলার পর হঠাৎ যেন আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঘ সরে গিয়ে ঝলমলে রোদ্দুর উঠেছে। বারান্দায় তার মা, বাবা, বিন্তি এমনকি হিরু পর্যন্ত বসে। কি একটা মজার কথা হচ্ছিল বলে মা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি আড়াল করবার চেষ্টা করছে। টেবিলের উপর অনেকগুলি প্লেট, চায়ের কাপ। দেখে মনে হয়, কিছুক্ষণ আগে কারা এই বাড়িতে এসেছিলেন, অতিথি-সৎকারের নিদর্শন-গুলি এখনও টেবিলে পড়ে।

ছেলেকে দেখে মনোরমা একগাল হেসে বলল—'তুই যদি আর একটু আগে আসতিস বাবা, তাহলেই ওদের সঙ্গে দেখা হত।'

কিরণ সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'তোমার শরীর কেমন আছে মা? জ্বর আর বাড়েনি?'

—'জ্বর বোধহয় নেই এখন।' মনোরমা কপালে করতল চেপে দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করল। ফের বলল,—'এতক্ষণ তো ওদের সঙ্গেই আলাপ করছিলাম। বেশ ভালো লোক সব। দুটো কথা বলেও মনের সুখ।'

কিরণ ব্যাপারটা বুঝতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল,—কাদের কথা বলছিলে মা? কারা বেড়াতে এসেছিল?'

—'ওই যে বিন্তি যাদের বাড়িতে থিয়েটার করবে, সেই তারা।' মনোরমা চোখ ঘুরিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল। ফের মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তুই বল না বিন্তি। কারা সব এসেছিল। সামনের শনিবার তোর সেই থিয়েটার দেখতে যাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করে গেল।'

—'আহা! কারা এসেছিল, তাও তোমাকে এখন বলে দিতে হবে?'

বিস্তি ছদ্ম বিরক্তির সঙ্গে সুন্দর একটি ভ্রূভঙ্গি করল। তারপর ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'ওরা তিনজন এসেছিল মেজদা। মিলি মানে আমার সেই বন্ধু। তার সঙ্গে রতীশবাবু আর ওঁর দিদি।'

—'রতীশবাবু? সে ভদ্রলোক কে আবার?' কিরণ জানতে চাইল।

—'বারে! ওদের বাড়িতেই তো থিয়েটার হবে। তাই রতীশবাবু আর তার দিদি দুজনেই এসেছিলেন বাবাকে আর মাকে নেমন্তন্ন করতে। তোমাদের তিনজনকেও অবশ্য করে যেতে বলেছেন মেজদা।'

—'হ্যাঁরে, মেয়েটি খুব ভালো।' মনোরমা হাসল। 'যাবার সময় কতবার করে বলে গেল। মেসোমশাইকে নিয়ে আপনি নিশ্চয় যাবেন মাসীমা। না গেলে আমরা সবাই ভীষণ দুঃখ পাবো। আর বিস্তির নাচের কি প্রশংসা। ভালো করে শিখলে আপনার মেয়ে একদিন মস্ত বড় শিল্পী হবে দেখবেন। আরো কত কি বলছিল—' খুশিতে মনোরমার চোখ দুটি উজ্জ্বল দেখাল।

হিরু টিপ্পনী কেটে বলল—'হ্যাঁ ভালো করে নাচ শিখে আমেরিকায় বড়দার কাছে চলে যাবি। সেখানে আমেরিকানরা আবার তোকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করবে।'

বিস্তি মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করে ভেংচি কেটে বলল—বেশ করবে। তাতে তোর কি?'

বাণীব্রত দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'তোরা চুপ কর দিকি। অকারণে এখুনি একটা খিটিমিটি বাধিয়ে বসবি। ওরা বড়লোক মানুষ, নিজেদের মত আর পাঁচজনকে ভাবে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার বললেন—'কলকাতায় আমরা আর কটা দিন আছি? মাস দেড় কি বড় জোর দুটো মাস হবে। তারপর চন্দনপুরের বাড়িতে গিয়ে বাস করব। বিস্তিকে বরং সেই ভেবে মনে মনে তৈরি হতে হবে।'

কথাটা সত্যি। তবু নিদারুণ। বিস্তির বুকে গিয়ে বাজল। সে আর বসল না। মুখ ভার করে সেখান থেকে উঠে গেল।

কিরণ বলল—'তুমি জ্বর নেই ভাবছ। কিন্তু তোমার চোখ দুটো ছলছল করছে মা। থার্মোমিটার এনে দেখব একবার?

'জ্বর কোথায় ?' মনোরমা ছেলের মুখের দিকে সস্নেহে তাকাল। 'ও তোর মনের ভুল। চোখ আবার ছলছল করবে কেন ? আমি দিব্যি আছি।'

কিন্তু কিরণ নাছোড়বান্দা। সে তার ব্যাগ থেকে থার্মোমিটার বের করে এনে মায়ের জ্বর দেখতে বসল। জিভের নীচে থার্মোমিটার দিতে মনোরমার দারুণ অস্বস্তি। কেমন সুড়সুড়ি লাগে। তবু কিরণ কোনো কথা শুনবে না। এমন জেদী একরোখা সব ছেলে হয়েছে তার।—

বাথরুমে ঢুকে বিস্তি তার জামার ভিতর থেকে চিঠিখানা বের করল। সত্যি, রতীশের দারুণ সাহস। চিঠিটা কখন বাড়ি থেকে লিখে এনেছে। মা অসুস্থ বলে অতিথিদের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারেনি। তাই বিস্তি সিঁড়ি বেয়ে ওদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল। কতটুকু বা সময় ? ওরই মধ্যে রতীশ কৌশল করে কখন একটু পিছিয়ে পড়ল। তারপর এক ফাঁকে প্রায় চোরের মত নিঃশব্দে বিস্তির মুঠোর মধ্যে চিঠিখানা গুঁজে দিয়েছে। রতীশের দিদি এমন কি মিলি পর্যন্ত তা টের পায়নি।

সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে বিস্তি চিঠিখানা পড়তে শুরু করল। বাথরুমে কম পাওয়ারের লাইট। পড়তে একটু কষ্ট হয়—চোখে লাগে। কিন্তু তাতে কি ? ছোট্ট চিঠি। মোটে সাত-আটটা লাইন। কতটুকু সময় যাবে ?

প্রিয়তমাসু

কাল মিলি স্কুলে যাবে না। আমি এগারোটার সময় গাড়ি নিয়ে আসছি। মোড়ের মাথায় তুমি নিশ্চয় এস। বেলা তিনটেয় রিহার্সাল মনে আছে তো ? তার আগে কিছুক্ষণের জন্য বেড়িয়ে এলে কেমন হয় ? চিন্তার কারণ নেই। আমাদের ড্রাইভার ছুটি নিয়েছে। স্কুল থেকে তোমাকে আনতে আমাকেই যেতে হত। সুতরাং ব্যাপারটা অন্য কেউ মানে মিলিও সন্দেহের চোখে দেখবে না, বুঝলে—ইতি

তোমার
রতীশ

চিঠি পড়তে শুরু করেই বিস্তির সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। কেমন একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ। চিঠিটা একবার নয়, দুবার নয়। অনেকবার পড়ল বিস্তি। প্রতিটি শব্দ, লাইন প্রায় মুখস্থের মত হয়ে গেল তার। রতীশের এই প্রথম চিঠি বলেই কি বিস্তির এত ভাল লাগছে? শুরুতেই কি সুন্দর একটা কথা লিখেছে রতীশ। প্রিয়তমাসু শব্দটা ঠোঁটের ডগায় উচ্চারিত হতেই বিস্তির কেমন গলা বুঁজে আসছে। আচ্ছা, কবে থেকে রতীশ তাকে প্রিয়তমা বলে ভাবল? কবে থেকে সে তাকে ভালবেসেছে? একথা রতীশকে বিস্তি জিজ্ঞাসা করবে নাকি?

মোড়ের কাছে চকোলেট রঙের ফিয়াট গাড়িটা অপেক্ষা করছিল। রতীশ খানিকটা দূরে একটা পানের দোকানের সামনে সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে। তার পরনে একটা সাদা রঙের প্যান্ট, গায়ে কচি কলাপাতা রঙের বুশশার্ট। চোখে কালো সান-গ্লাস। বিস্তিকে দেখে সে তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে ফিরে এল।

ঘড়ির দিকে এক নজরে তাকিয়ে রতীশ বলল,—'তুমি কিন্তু ঠিক সময়ে এসেছ মানে জাস্ট ইন টাইম।'

—'না এসে উপায় আছে?' বিস্তি চোখ ঘুরিয়ে হাসল। 'যা চিঠি তোমার। ঠিক এগারোটার সময়েই আসতে হবে।' ঠোঁট কামড়ে এক মুহূর্ত ভাবল বিস্তি। ফের বলল—'তোমার কিন্তু আজকাল ভীষণ সাহস বেড়ে যাচ্ছে। অমনি করে হাতের মুঠোয় চিঠি গুঁজে দিতে আছে? যদি মিলি কিংবা তোমার দিদি দেখতে পেত?'—

—'কেমন করে দেখতে পাবে?' রতীশ সহাস্যে জবাব দিল। 'ওরা তো সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল।'

—'বারে! হঠাৎ পিছন ফিরে মিলি তাকাতেও পারত। তাহলে?' বিস্তি ভুরু তুলে রতীশের মুখের উপর দৃষ্টির সূতো বুলোল। ফের মুচকি হেসে বলল—'আর চিঠিতে যা সব কথা লিখেছ তুমি।'

'কি লিখেছি?' রতীশ কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় করল।

—'যাও সে আমি বলতে পারব না—'

—'বেশ আমি বলি। চিঠিতে লিখেছি,—প্রিয়তমাসু। এতে তোমার আপত্তি আছে নাকি?'

বিস্তি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল। রতীশ এমন অকপটে সব ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু সে মেয়ে—তার বুঝি সংকোচ হয় না? বিস্তির কর্ণমূল আরক্ত। সে মুখ নীচু করে অনেকক্ষণ পরে বলল—'আপত্তি কেন থাকবে? কিন্তু আমার কেমন ভয় করে রতীশ। আমি ভাবি ওরা সব কথা যদি টের পেয়ে যায়।'

রতীশ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ওর পিঠের উপর রাখল। কি নরম শরীর বিস্তির। তুলো কিংবা মাখনের মত। একটু চাপ দিলেই হাত বসে যায়। সে আদর করে বলল,—'আজ না হোক একদিন তো আমাদের সম্পর্কের কথা সবাই জানতে পারবে। তার জন্য এত ভয় পেলে চলবে কেন?'

মাঝেরহাট ব্রীজ পেরিয়ে গাড়ি বেহালার দিকে ছুটছিল। চারপাশে উজ্জ্বল রোদ্দুর—একটা দামাল শিশুর মত হুটোপাটি খেলছে। নীল আকাশ বিচিত্র, স্বপ্নময়। ডানা মেলে পাখি উড়ছে কোথাও। পথে ঘাটে এখনও কিছু অফিসযাত্রীর ভিড়। পাশেই একটা ছোট মাঠ। একদল ছেলে সেখানে ব্যাটে-বলে সোরগোল তুলেছে।'

বিস্তি বলল—'এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

—'খুব সুন্দর একটা জায়গায়। অবশ্য কলকাতার বাইরে। কিন্তু আমি জানি সেখানে তোমার খুব ভালো লাগবে।

—'কলকাতার বাইরেই ভালো। চেনা-জানা লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই।' একটু থেমে আবার বলল—তোমার ওই হোটেল, রেস্তোরাঁয় আমি আর কোনোদিন যাচ্ছিনে।'

—'কেন, সেদিন ওখানে বুঝি ভালো লাগেনি?'

—'দূর! ভালো লাগবে না কেন? অমন সুন্দর জায়গা। কত হৈ-হুল্লোড় নাচ-গান। কিন্তু আমি কেমন করে জানব সেদিন ওখানে বড়দা গিয়েছিল।'

—'তাই নাকি?' রতীশ ঘাড় কাত করে তাকাল।

বিস্তি মুখ শুকনো করে বলল—'হ্যাঁ, তাই নিয়ে বাড়িতে একটা বিশ্রী ব্যাপার। আর বড়দাও তেমনি ছেলে। পেটে একটুও কথা রাখতে পারে না। বাড়ি ফিরে মার কাছে আদ্যোপান্ত গল্প করেছে। রিহার্সাল শেষ

হবার পর আমি একটা বিলিতী মদের দোকানে গিয়েছিলাম। সেখানে তোমার সঙ্গে ধেই ধেই করে নেচেছি। এক বর্ণও বলতে বাকি রাখেনি।'

রতীশ হেসে বলল—'কিন্তু তোমার মা আমাকে দেখে একটুও রাগ করেননি। বরং কত গল্প করলেন।'

—'তা সত্যি। আসলে মার তোমাকে পছন্দ হয়েছে।' বিস্তি ঠোঁট ফাঁক করে একটু হাসল। বলল—'জানো, রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে তোমার কথা দু-তিনবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল।'

একটা ছোটোখাটো বাগানবাড়ির সামনে গাড়ি থামল। জায়গাটা সত্যি সুন্দর। চারপাশে অনেকখানি সমতল জমি। নরম সবুজ ঘাসের উপর রোদ্দুর পিছলে যাচ্ছে। বাড়ির খুব কাছেই গঙ্গা। সামনে একটুখানি ফুলের বাগান। দরজার কাছে একটা শিউলি ফুলের গাছে এখনও অনেক কুঁড়ি। ঝাঁকিয়ে শীত পড়তে আর বড় বেশি দেরি নেই। ফুলগুলো বোধহয় আরো কটা দিন ফুটবে।

মোটরগাড়ি দেখে একটা লোক এগিয়ে এল। বিস্তি জানতো না গাড়িতে করে রতীশ আরো জিনিস এনেছে। মাঝারি সাইজের একটা থার্মোফ্লাস্ক, টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার, একটা প্লাসটিক ব্যাগের মধ্যে রঙীন পানীয় ভরা ছোট বোতল। কয়েকটা আপেল, কমলালেবু আর একগুচ্ছ আঙুর। বাক্সের মত আরো একটা কি বস্তু। অনেকক্ষণ তাকিয়ে বিস্তির সেটাকে রেকর্ড প্লেয়ার বলে মনে হল।

—'ব্যাপার কি?' বিস্তি অবাক হয়ে শুধোল। 'এখানে কি পিকনিক টিকনিক করবে নাকি?'

রতীশ চারপাশে একবার চোখ ঘুরিয়ে বলল,—'পিকনিক করবার জায়গা। কিন্তু হাতে সময় কই? আড়াইটে বাজলেই গাড়িতে স্টার্ট দিতে হবে। তবু কিছুক্ষণ তো আছি। খিদে পেলে কি করব? তাই এগুলো সঙ্গে আনলাম। পরে একদিন সবাই মিলে পিকনিক করতে আসা যাবে।'

পাশাপাশি দু'খানা ঘর। একটি শোবার অন্যটি বসবার। ঘরের ভিতরটা আরো সুন্দর। দেওয়ালে হাল্কা গোলাপী রঙ। ডবল বেডের

হাল-ফ্যাশানের পালঙ্কের উপর নরম বিছানা। পাশেই একটা ড্রেসিং টেবিল। আয়নার সামনে বিন্তি নিজেকে দেখছিল। মাথার খোঁপাটা একটু সরে এসেছে। কপালের কাছে চিবুকের নীচে অল্প অল্প ঘাম। বিন্তি কোমরে গোঁজা রুমালটা বের করে খুব আলতোভাবে মুখ মুছল। ঘাড়ের উপর করতল রেখে ঠেলেঠুলে খোঁপাটাকে ফের স্বস্থানে আনল।

হঠাৎ দর্পণে রতীশকে দেখে বিন্তি অবাক হল। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে সে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ছি, ছি! অমন আদেখলের মত কি দেখছে রতীশ? তাও সঙ্গোপনে লুকিয়ে চুরিয়ে। আশ্চর্য! তার নাচের উপযোগী ফিগারটা এতদিন খুব কাছাকাছি দেখেও রতীশের আশ মেটেনি?

দর্পণে রতীশের ছায়াটা বিন্তি আবার দেখল। এখনও সে তেমনি তাকিয়ে। মধু পিয়াসী লুব্ধ ভ্রমরের মত রতীশের দৃষ্টিটা তার দেহের প্রতিটি রেখায় ফিরে ফিরে বসছে।

## ষোল

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার খুব অস্বস্তি লাগছিল। তাছাড়া এই চার দেওয়ালের মধ্যে সে বন্দী থাকবে নাকি? কোনো কথা না বলে বিন্তি হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এল।

পিছন থেকে রতীশ বলল,—'আরে, আরে। যাচ্ছ কোথায়?'

বাইরে মাঠময় রোদ্দুরের হাসি। পায়ের নীচে নরম মখমলের মত বিস্তীর্ণ তৃণদল। কলকাতার এত কাছে এমন একটা সবুজের রাজ্য আছে, তা যেন কল্পনাও করা যায় না।

ততক্ষণে বাগান পেরিয়ে বিন্তি মাঠে পা দিয়েছে। রতীশ বারান্দায়। পিছন ফিরে সে প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—'ওখানে হাবার মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস না গঙ্গার ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।'

জায়গাটা অদ্ভুত নির্জন, কাছাকাছি লোকালয় নেই। এদিকে ওদিকে তাকিয়েও বিস্তি একজন মানুষের মুখ দেখতে পেল না। সেই চৌকিদার গোছের লোকটা গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে কোথায় গেছে কে জানে। তার মর্জিমত ফিরবে মনে হয়। যাবার সময় রতীশকে কিছু বলেও যায় নি।

গাছগাছালির আড়ালে বসে একটা পাখি শিস দিচ্ছে। কি সুন্দর মিষ্টি সুর। বিস্তি চেষ্টা করল পাখিটাকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু পারল না। কাছাকাছি চার-পাঁচটা বড় গাছ। প্রত্যেকটিরই ঘন পত্রসজ্জা। ওরই মধ্যে কোথায় সেটা মুখ লুকিয়ে বসে। অতটুকু পাখি, খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য।

রতীশ কাছে এলে দুজনে ফের হাঁটতে শুরু করল। বিস্তির ইচ্ছে করছিল মাঠের উপর খানিকটা বেশ ছুটে বেড়ায়। এই রোদ্দুরে গা ভাসিয়ে পাখিরা যেমন ডানা মেলে ওড়ে, কিম্বা হরিণী যেমন ত্রস্ত পা ফেলে দৌড়ায়, সে তেমনি ঘাসের উপর ছুটবে, বেড়াবে। অথবা ওই বড় গাছগুলোর মোটা গুঁড়ির আড়ালে সে রতীশের সঙ্গে অনায়াসে লুকোচুরি খেলতে পারে। এখানে তার মা নেই যে শাসন করবে। মিলি নেই যে তাকে দেখে মুখ টিপে হাসবে। এমন একটা বাধাবন্ধহীন আনন্দের স্বাদ বিস্তি বহুদিন পায়নি।

রতীশ জিজ্ঞাসা করল,—'জায়গাটা তোমার খুব ভাল লেগেছে, তাই না?'

—'খুউব।' বিস্তি ঠোঁট টিপে হাসল। 'সে কথা আবার বলতে হয়। কত বড় মাঠ আর কি সুন্দর পাখির ডাক। বাগানে নানা রঙের ফুল। তাছাড়া জায়গাটা এমন নির্জন যে এলেই ভালো লাগে।'

রতীশ বলল,—'এই বাগানবাড়ীটা আমার এক বন্ধুর। বছরে এক আধবার ওরা বেড়াতে আসে। খেয়াল-খুশি মত দু-চারদিন বাস করে, এই পর্যন্ত। বাকি সময়টা এমনি পড়ে থাকে। ওই মালিটাই দেখাশুনো করে।' পকেট থেকে ওর সেই সুদৃশ্য কেসটা বের করে রতীশ একটা সিগারেট ধরাল। কালো চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে বলল,—'এরপর একদিন দল বেঁধে এলেই হবে। তুমি, আমি, মিলি, আমার দিদি আরো যারা আসতে চায়—সবাই। বেশ মজা করে চড়ুইভাতি করা যাবে।'

রতীশ এবার ইচ্ছে করেই বাংলা কথাটা ব্যবহার করল। আজকাল পিকনিক শব্দটা বড় বেশী আটপৌরে। রাম শ্যাম সকলেই বলে।

—'চড়ুইভাতি?' বিস্তি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

—'হ্যাঁ, রতীশ ঈষৎ ভুরু কোচকাল। 'কেন, তোমার আপত্তি আছে নাকি?'

—'দূর! আপত্তি থাকবে কেন?' বিস্তি হেসে জবাব দিল। 'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম চড়ুইভাতি হবে কখন?'

—'জানুয়ারীর প্রথম দিকে হলে অনেকের সুবিধে।' রতীশ একটু ভেবে বলল। 'অবশ্য ইচ্ছে করলে ডিসেম্বরের শেষ দিকেও করা যায়।'

—'কি জানি! তখন হয়তো আমি কলকাতাতেই থাকব না।' বিস্তি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাল।

—'থাকবে না মানে? কোথায় যাবে?'

—'কেন চন্দনপুরে। আমাদের দেশের বাড়িতে।' বিস্তি ধীরে ধীরে বলল। 'তোমাকে আগে একদিন বলেছিলাম না? রিটায়ার করে বাবা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকবেন।'

—'কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এখনও কিছু পাকাপাকি হয়নি।'

—'তখন হয়নি। এখন সব ঠিক।' বিস্তি ব্যাপারটা খুলে বলতে চাইল। 'সামনের মাসে বাবা রিটায়ার করবেন। তারপর উনি আর একটি দিনও কলকাতায় কাটাতে চান না। জানো রতীশ, আজকাল প্রায়ই বাবা দেশের কথা বলেন। আমি বুঝতে পারি চন্দনপুরের বাড়িঘর বাবাকে ভীষণ আকর্ষণ করছে। অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি এতদিন ধরে বাবা কেমন করে কলকাতায় কাটালেন।—'

রতীশ বলল,—'কিন্তু গ্রামে গেলে তোমার কি হবে বিস্তি? তুমি এত ভালো নাচতে পার। সবাই কতো প্রশংসা করে। তাছাড়া কি সুন্দর ফিগার তোমার! আমি ঠিক জানি, একদিন তোমার খুব নাম হবে। সবাই তোমাকে খুব বড় শিল্পী বলে জানবে।' একটু থেমে সে আবার যোগ করল,—'তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল। এখানে তোমাকে থাকতেই হবে। কলকাতায় না থাকলে তোমার প্রতিভার বিকাশ হবে না।'

বিস্তি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। সত্যি রতীশ তাকে ভীষণ ভালবাসে। তার জন্য কত চিন্তা করে। আর কেমন সুন্দর সব কথা বলে রতীশ।

একদিন নাচে তার নিশ্চয় নাম হবে। কলকাতার লোকে তাকে বড় শিল্পী বলে জানবে। বাড়িতে মা, বাবা, দাদারা কেউ তার জন্য একটুও ভাবে না। এমন সহানুভূতির কথা সে কার কাছে শুনেছে?

মুখ তুলে বিস্তি বলল,—'বাবাকে আর কি বোঝাব? আমাদের চন্দনপুরে যাওয়ার সব ঠিক। কাল রাত্তিরে তোমরা চলে আসবার পর বাবা স্পষ্ট বললেন,—কলকাতায় আমরা আর কটা দিন আছি। মাস দেড় কি বড় জোর দুটো মাস হবে। তারপর চন্দনপুরের বাড়িতে গিয়ে বাস করব। বিস্তিকে বরং সেই ভেবে মনে মনে তৈরি হতে হবে।'

—'আর তোমার মা?' রতীশ ভুরু কুঁচকে শুধোল।

—'মায়ের জন্য খুব কষ্ট হয় আমার। এতদিন পরে কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বাস করতে কার ইচ্ছে করে? তাই চন্দনপুরে যেতে মায়ের ভীষণ আপত্তি। আর এই নিয়ে বাবার সঙ্গে কত ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। কিন্তু আমার বাবা অদ্ভুত মানুষ। মা হাজার কথা বললেও বাবা একটুও রাগে না। কখনও মৃদু হাসে। খুব বেশী হলে গম্ভীর মুখে কি সব ভাবে। কিন্তু তাই বলে বাবা তার মত বদলাবে না। একবার যখন চন্দনপুরে যাওয়ার ঠিক হয়েছে, তখন তার আর নড়চড় নেই।'

'আশ্চর্য মানুষ।'

—'হ্যাঁ, আমার মা ঠিক তাই বলে। বাবার নাকি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। সিদ্ধান্তে তিনি স্থির। কেউ তাকে টলাতে পারে না। দুঃখ করে মা তাই বলছিল,—এই নাচ-গান হৈ-চৈ, ফাংশন, তুই এবার ছেড়ে দে বিস্তি। চন্দনপুরে গিয়ে গ্রামের মেয়ের মত থাকবি চল।'

বিস্তির চোখ দুটি বেদনায় ভারী হয়ে এল। ম্লান হেসে সে ফের বলল,—'আর মা ঠিক কথাই বলে। চন্দনপুরে গিয়ে যখন থাকতেই হবে, তখন আর নাচ শেখার কোনো মানে হয় না। গ্রামের মেয়েরা কি নাচ-গান করে? তারা যেমনভাবে দিন কাটায়, আমাকেও তেমনিভাবে থাকতে হবে।'

—'আমি তোমাকে চন্দনপুরে যেতে দেব না বিস্তি।' একটা চাপা

আবেগ এবং উত্তেজনায় রতীশের ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপল। একটু থেমে সে আবার বলল,—'বাড়ির লোকেরা তোমার ভবিষ্যতের কথা একটুও ভাবে না। নইলে তোমার মত মেয়েকে কেউ গ্রামে বাস করতে বলে? চন্দনপুরে গেলে তোমার কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? সব সম্ভাবনা, ভবিষ্যতের আশা জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হবে। নিজেকে এমনভাবে ধ্বংস করে লাভ কি?'

—'কিন্তু আমার কি উপায় আছে বল?' বিস্তি বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

রতীশ গালে হাত রেখে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। বলল,—'উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু তুমি কি আমার উপর নির্ভর করতে পারবে বিস্তি? মানে আমাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারো?'

'এতদিন পরে বুঝি তোমার তাই মনে হল?' বিস্তি ভুরু কুঁচকে তাকাল। অভিমান করে বলল,—'তুমি ঠিকই বলেছ। আমার ভবিষ্যত নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। তোমার মত এত চিন্তা-ভাবনা কেউ করে না। তুমি ছাড়া আমি কার উপর নির্ভর করি বল? আমাদের দুজনের কথা মিলির কাছে ভাঙিনি, মাকে জানাইনি। সম্পূর্ণভাবে তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই তো তোমার সঙ্গে এতদূর এগোতে পারলাম।'

গঙ্গার ধারে জায়গাটা আরো সুন্দর। এখন ভরা জোয়ার। দুপুরের উজ্জ্বল রোদ্দুরে নদীর জল ঝিকমিক করছে। খানিক দূরে একটা ছোট নৌকো এতক্ষণ চড়ায় আটকে ছিল। জোয়ারের জলে হঠাৎ খুশির আনন্দে সেটা দস্যি ছেলের মত নাচানাচি শুরু করেছে।

কথাবার্তা ক্রমেই ভারী এবং মন্থর হয়ে উঠছিল। রতীশ তাই হাওয়া বদলাবার চেষ্টা করল। হঠাৎ সে সামনে এসে বিস্তির কাঁধের উপর হাত রাখল। মৃদু হেসে বলল, 'প্রায় একটা বাজে। সে খেয়াল আছে? সঙ্গে অত খাবার আনলাম। সেগুলোর কথা এবার ভাবতে হবে না?'

—'যাও! কাঁধের উপর থেকে রতীশের হাত সরিয়ে বিস্তি একটা কটাক্ষ করল। 'পেটুক কোথাকার! এরই মধ্যে তোমার খিদে পেয়ে গেল?'

ঘরের ভিতরে এসে রতীশ রেকর্ড-প্লেয়ারে হাল্কা গান বাজিয়ে দিল। টিফিন ক্যারিয়ার খুলতেই নানা রকমের সন্দেশ আরো কি সব খাবার

উঁকি দিল। প্ল্যাসটিকের ব্যাগের ভিতর থেকে আপেল কমলালেবু আর আঙুর বের করে সে বিস্তির সামনে রাখল।

—'কি সর্বনাশ! এত খাবার কেন সঙ্গে এনেছ? কে খাবে বলতে পারো?'—

একটা আপেল তুলে নিয়ে রতীশ স্বচ্ছন্দে কামড় দিল। বলল—'যা পারি, আমরা দুজনে খাবো, বাকিগুলো ওই মালিটা নেবে।' কথা শেষ করে সে প্রায় অতর্কিতে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে বিস্তির মুখের মধ্যে গুঁজে দিল।

চার-পাঁচ জনের খাবার। সবই পড়ে রইল। রতীশ অবশিষ্ট আহার্য সরিয়ে রেখে প্ল্যাসটিকের ব্যাগের ভিতর থেকে রঙীন পানীয়ের সেই বোতল এবং আরো একটা ছোট শিশি বের করল। অদ্ভুত এক ধরনের গ্লাসে দুটি তরল পদার্থ অল্প-বেশী ঢেলে সে নিঃশব্দে চুমুক দিতে লাগল।

বিস্তি অবাক হয়ে শুধোল, 'ওটা কি খাচ্ছ?'

—'ওষুধ', রতীশ মুচকি হেসে জবাব দিল। বিস্তির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তুমি খাবে একটু?'

—'ধ্যেৎ! আমি কেন ওষুধ খেতে যাব? আমার কি অসুখ করেছে?' বিস্তি সুন্দর ভ্রূভঙ্গি করল। বলল,—তাছাড়া ওটা মোটেই ওষুধ নয় মশায়। আমি জানি, তুমি কি খাচ্ছ।'

—'কি?'

—'মদ', বিস্তি মৃদু গলায় জবাব দিল। ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বলল, —'ছিঃ! তুমি মদ খাচ্ছ রতীশ?'

—'কেন, মদ খাওয়া নিতান্ত দোষের?' রতীশ পাল্টা প্রশ্ন করল। 'আজকাল ড্রিঙ্ক করা তো রেওয়াজ। অনেকে খায়। তাছাড়া এক-আধটু খেলে কিছু খারাপ হয় না। বরং শরীর বেশ চাঙ্গা থাকে। তুমি জান না বিস্তি ইদানীং মেয়েরাও কিছু কম যায় না। পিকনিক চড়ুইভাতি কিম্বা ককটেল পার্টিতে তারা রীতিমত পাল্লা দিয়ে মদ গিলছে।

বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে সে আবার বলল,—'তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। এক ঢোক চলবে নাকি?'

—'উহুঁ। ওসব ছাইভস্ম গিলতে বয়ে গেছে আমার।'

—'বেশ, তাহলে তুমি একটু নাচো—'

—'পাগল নাকি? এই কি নাচবার সময়? তোমার কি মাথা খারাপ হল?'

কিন্তু রতীশ অবুঝ। বিন্তি মেজের উপর পা গুটিয়ে বসেছিল। রতীশ কাছে এসে তাকে জোর করে উঠিয়ে দিল। বলল,—'এই ঘরের মধ্যে একা তোমার নাচ দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। প্লীজ বিন্তি,—আমার কথা রাখো। ডান্স এ লিটল।'

অগত্যা নাচতেই হল। রেকর্ড প্লেয়ারে খুব সুন্দর একটা বাজনার সুর হচ্ছিল। বিন্তি তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে শুরু করল। দেহের প্রতিটি রেখায়, চোখের ভঙ্গিমায়, মুখের নানারূপ অভিব্যক্তিতে ছন্দোময় নৃত্য ফুটে উঠল। পালঙ্কের উপর আধশোয়া অবস্থায় রতীশ দেখছিল ওকে। হাতে পানপাত্র। তারিয়ে তারিয়ে একটু একটু করে রঙীন পানীয় সে গলায় ঢালছিল। এখন বেশ খুশি-খুশি স্বচ্ছন্দ লাগছে তার। শরীরটা ঈষৎ গরম। নাক দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। পালঙ্কে তাকিয়ার উপর হেলান দিয়ে নিজেকে বাদশাহী আমলের কোনো নবাবজাদা বলে ভ্রম হচ্ছে। দেহের শিরায় উপশিরায় প্রতিটি রক্তকণিকার মধ্যে এক ধরনের পোকা অনবরত কামড় দিচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে বিন্তি হেলছে, দুলছে। তাকে একজন নর্তকী, কিম্বা পাখনামেলা প্রজাপতির মত মনে হয়। ছেলেবেলায় রংচংয়ে প্রজাপতি দেখলেই রতীশের হাত নিসপিস করত। যতক্ষণ না সেটাকে ধরছে, ততক্ষণ শান্তি নেই।

পিছনের জানালা দিয়ে এক চটকা রোদ্দুর বাঁকাভাবে পালঙ্কের উপর এসে পড়েছে। বিছানা থেকে উঠে রতীশ জানলাটা বন্ধ করে দিল। এখন ঘরের মধ্যে প্রায় অন্ধকার। ধীরে ধীরে পা ফেলে সে বিন্তির কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তাকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল।

বিন্তি ভেবেছিল রতীশ বোধহয় তার সঙ্গে টুইস্ট নাচতে চায়। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গী কি সে রকম? রতীশ তাকে দেহের সঙ্গে চেপে ধরছে কেন?'

তার নাচ বন্ধ হবার জোগাড়। সে ভালো করে পা ফেলতে পারছে না। বিস্তি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। বলল,—'এই কি হচ্ছে, ছেড়ে দাও আমাকে। নইলে পড়ে যাব।' কিন্তু রতীশের হাত দুটো প্রায় সাঁড়াশীর মতো তাকে বন্দী করে রেখেছে। বিস্তির সাধ্য কি নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়?

তার কানের কাছে ফিস ফিস করে রতীশ ভালবাসার সব অলৌকিক কথা বলছিল। বর্ণময় গাঢ় প্রেম। রতীশের ঘন সান্নিধ্যে বিস্তি যেন ক্রমেই অবশ হয়ে পড়ছে। তার সাড় নেই। বেপথুমতী দেহটাকে রতীশ নৌকোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ পরে ঠিক খেয়াল নেই, বিস্তি হঠাৎ টের পেল তার মাথাটা বালিশের উপর স্থান পেয়েছে।

ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার। দরজাটা বন্ধ। রতীশ বিছানায় নেই। কখন নেমে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে বিস্তি এদিক ওদিক তাকাল। রতীশ আয়নার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে। দর্পণে কি দেখছে সে? নিজের ছায়া? অমন স্থিরভঙ্গিতে কি চিন্তা করছে?

নিজেকে বেশ ক্লান্ত এবং নির্জীব লাগছিল তার। একটা অদ্ভুত, অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। বিস্তি কি ভাবতে পেরেছিল তার জীবনের খাতার পাতায় আজ একটি নতুন আঁচড় পড়বে?

বিছানায় বসে বিস্তি বলল,—'একটু জল খাব।'

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।' রতীশ তাড়াতাড়ি থার্মোফ্লাস্ক থেকে গ্লাসে জল ঢেলে তার হাতে দিল।

জল খেয়ে বিস্তি বিছানার উপর চুপ করে বসে রইল। রতীশ অপরাধীর মত শুধোল,—'তোমার কি খুব খারাপ লাগছে?"

বিস্তি সে কথার কোনো জবাব দিল না। তেমনি মুখ নিচু করে কি ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বলল,—'তুমি একটু বাইরে যাও।'

রতীশ বেরিয়ে যেতে বিস্তি বিছানা থেকে নামল। দর্পণে নিজের ছায়া দেখে কান্না পাচ্ছিল তার। শাড়িখানার যা দশা। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে বেসবাস ঠিক করল।

দরজা খুলে বেরিয়ে বিস্তি দেখল রতীশ গাড়িতে বসে। সে যাবার জন্য তৈরি। আর আশ্চর্য ব্যাপার। এই বাগানবাড়ির মালি অথবা কেয়ার-

টেকার গোছের লোকটা এখন ফিরে এসেছে। দরজা খুলতেই সে নিঃশব্দে ঘরের ভেতর ঢুকল। দুই হাতে খালি টিফিন ক্যারিয়ার, প্লাসটিকের ব্যাগ, থার্মোফ্লাস্ক এবং রেকর্ড-প্লেয়ারটা এনে গাড়িতে তুলে দিল।

তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে লোকটা। ওর সামনে একটুও ভালো লাগছিল না বিস্তির। সর্বাঙ্গে অস্বস্তির সুড়সুড়ি। বিস্তির মনে হল লোকটা মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসল। আসলে ও সব জানে, সব বোঝে। এতক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, তা কি সে লক্ষ্য করেনি? অথচ নিপাট ভালো-মানুষটির মত হাঁটছে, ফিরছে। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

যাবার আগে রতীশ ওকে পাঁচটা টাকা বকশিস দিল। সে নমস্কার করে একগাল হেসে বলল,—'আবার আসবেন বাবু।'

বিস্তি অন্যমনস্কের মত আকাশের নীলিমা, পাখি-টাখি দেখার ভান করছিল। ওই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে তার একটুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু আশ্চর্য! সে অনায়াসে গাড়ির এঞ্জিনের পাশ দিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল,—যখন খুশি আসবেন দিদিমণি। আমি সব সময় থাকি। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।' কথা শেষ হতেই সে আবার দাঁত বের করে হাসল।

পীচের রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি জোরে ছুটতে শুরু করল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রতীশ বলল,—তিনটের সময় রিহার্সাল। মনে হয় তার আগেই পৌঁছে যাব।'

—'আজ রিহার্সালে যেতে ইচ্ছে করছে না।' বিস্তি স্পষ্ট জানাল।

'কেন? তোমার মন ভাল নেই?'

ইঙ্গিতে নিজের বেশবাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলল,—'তোমরা পুরুষ-মানুষ। কিচ্ছু বোঝ না। এই অবস্থায় কি পাঁচজনের সামনে যাওয়া চলে?' ফের সলজ্জ হেসে জানাল,—'জামা-কাপড়ের দশা দেখলে মিলির কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকবে?'

ব্যাপারটা উপলব্ধি করে রতীশ চুপ করে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে কিছুটা স্বগতোক্তির মত বলল,—'সামনের শনিবার ফাংশন। আজকের দিনটা রিহার্সাল নষ্ট হল। শেষ পর্যন্ত বইটা কেমন দাঁড়াবে কে জানে!—'

—'তার জন্যে তুমি দায়ী।' বিন্তি পরিষ্কার বলল। 'কি দরকার ছিল এখানে আসার? আমার একটুও ইচ্ছে হয় নি। শুধু তোমার পাল্লায় পড়ে—'

—রতীশ ঘাড় ফিরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকল। বলল,—'তোমার কি মন খারাপ বিন্তি? সন্দেহ হচ্ছে, খুব রেগে গিয়েছ?—'

—'রাগব কেন?' বিন্তি নরম গলায় কথা কইল। 'বরং আমার খুব ভয় করছে রতীশ।'

—'ভয়?'

—'হ্যাঁ, ভয়। তখন থেকে বুকের ভিতরটা কেবল ঢিপ-ঢিপ করছে। আমার মন বলছে তোমার সঙ্গে এতদূর এগিয়ে যাওয়া বোধহয় ঠিক হয়নি। প্রথমে হাঁটুজল পর্যন্ত নেমেছিলাম। আর এখন তো ডুবজলে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমার কি ফেরার পথ রইল রতীশ? তলিয়ে যাব কিংবা আবার উঠতে পারব, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বিন্তির পিঠের উপর আলগোছে একটা হাত রাখল রতীশ। আদর করে বলল,—'তোমার সব ভার আমি নিলাম বিন্তি। চিন্তা ভাবনাগুলো এবার আমাকে দাও। তোমার সমস্যার কথা আমি ভাবব। সে চিন্তা আমার। তুমি শুধু নাচের কথা ভাব। কেমন করে আরো বড় শিল্পী হবে। অনেক নাম, খ্যাতি হবে তোমার। এই কলকাতায় তুমি নাচবে শুনলে লোকে লাইন দিয়ে ভিড় করবে।' একটু থেমে সে পুনরায় যোগ করল,—'অবশ্য আমি জানি একদিন তুমি মস্ত বড় শিল্পী হবে। শুধু কলকাতা কেন, বোম্বাই, দিল্লী, লখনউ, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ আরো কত শহর থেকে তোমার নিমন্ত্রণ আসবে। তখন সব জায়গায় যাওয়ার মত ফুর্সৎ পাবে না।'

রতীশ এমন সুন্দর সব কথা বলে, ঠিক স্বপ্নের মত মনে হয়। শহরগুলোর নাম কেমন সুর করে উচ্চারণ করল। বিন্তি ওর কাঁধের কাছে মাথা রেখে প্রায় ফিসফিস করে বলল,—'তুমি সত্যি বলছ তো রতীশ? আমার সব ভার তুমি নিলে? সব ভাবনা তোমার?—'

রতীশ তাকে নিজের কাছে আরো একটু টেনে নিল, কানের

কাছে মুখ নামিয়ে খাটো গলায় বলল,—'সত্যি সত্যি। তিন সত্যি। হ'ল তো?'

গলিতে ঢোকার আগে বিস্তি এদিক ওদিক তাকাল। চায়ের দোকানে সেই লক্কড় ছোঁড়াগুলো বসে নেই দেখে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ছেলে-গুলোর জ্বালায় বিস্তি অস্থির। দিন দিন ওদের উৎপাত অসহ্য মনে হয়। তাকে দেখলেই ওরা বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে চটুল সুরে গান ধরে,—'নাচো নাচো প্যারী, বনকে মোর'। এক একসময় বিস্তির ইচ্ছে হয়, একজনকে কাছে ডেকে ঠাস করে ওর গালে একটি চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু তাই কি সম্ভব? যা অসভ্য ছেলে। শেষে তার হাত ধরে টানাটানি করলে কেউ কি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে?

রোদ এখন গলিতে সেই বাড়ির মাথায়, ছাদের উপর উঠেছে। তাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ওই তিনতলা বাড়ির একটি মেয়ে কার্নিশে হাত রেখে দাঁড়াল। মেয়েটিকে চেনে বিস্তি। তারই বয়সী, স্কুলে পড়ে। তবে আলাপ-পরিচয় নেই। রতীশের মত একটি ছেলের সঙ্গে ওকে প্রায়ই সে ঘুরতে দেখেছে। এই তো কদিন আগে ওদের দুজনকে প্রাচী সিনেমা থেকে একসঙ্গে বেরোতে দেখল। নিশ্চয় বাড়ির লোকে এর বিন্দু-বিসর্গ জানে না। কেমন করে জানবে? আজকের বাগানবাড়ির বৃত্তান্ত কি তার মা কোনোদিন টের পাবে?

বাড়ির দরজা হাট করে খোলা। তাই দেখে বিস্তির মনে একটু খটকা লাগল। কিন্তু ঘরে ঢুকে তার প্রায় তাজ্জব হবার জোগাড়। এই অসময়ে বারান্দায় যেন মজলিশ বসেছে। তার মা-বাবা, বড়দা, মেজদা সকলেই উপস্থিত। শুধু ছোটদা নেই। সে নিশ্চয় কাউকে কিছু না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। এত বেলাবেলি তার বাবা কিম্বা বড়দা কেমন করে বাড়িতে ফিরল?

মেয়েকে দেখে মনোরমা হেসে বলল,—'ওমা! খবর পেয়ে তুইও চলে এলি? আজ আর থিয়েটার করতে গেলি না?—'

—'কি খবর মা?' বিস্তি ভ্রু কুঁচকে তাকাল। একটু চিন্তা করে সে অম্লান বদনে বলল,—'আজ রিহার্সাল হল না। তাই স্কুল ছুটি হতে চলে এলাম।'

—'তা আমি কেমন করে জানব? আমি ভাবছিলাম মিলু বুঝি স্কুলে গিয়ে তোকে খবরটা দিয়েছে।

—'তুমি হাসালে মা।' মিলন সকৌতুকে বলল। 'এই সামান্য খবরটা জানাতে আমি ওর স্কুলে ছুটব।'

মেয়ের ছটফটানি দেখে মনোরমার হাসি পেল। তার মনটা আজ ভারী খুশি। ঠিক জোয়ারের মুখে ভরা নৌকার মত। মজা করে সে বলল,—তোর দাদার চাকরির খবর এসেছে বিস্তি। মস্ত চাকরি। মাস গেলে কত মাইনে জানিস?'

—'কেমন করে জানব? তুমি কি আমাকে কিছু বলেছ?' বিস্তি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। 'সেই আমেরিকার চাকরিটা নিশ্চয়?'

'হাঁরে, আজই চিঠি এসেছে।' মনোরমা পরিষ্কার করে জানাল। 'মাস গেলে হাজার ডেলা মাইনে পাবে মিলু।'

—'ডেলা নয় মা। ওটা ডলার।' কিরণ মাকে শুধরে দিল। বলল,—'ও দেশে টাকার তাই নাম। আমাদের এখানের হিসেবে দাদার মাইনে প্রায় আট হাজার টাকার মত দাঁড়াবে।'

—'আ-ট হা-জা-র।' বিস্তির চোখ দুটো বিস্ময়ে প্রায় গোল হয়ে উঠল।

—'আট হাজার টাকা মাইনে শুনে তোমাকে আহ্লাদে আর আটখানা হতে হবে না। ছোট বোনের উৎসাহে কিরণ জল ঢেলে দিল। বলল,—'তেমনি খরচও অনেক। একবার চুল কাটতে হলে কিম্বা সিনেমা দেখতে গেলে কত ডলার বেরিয়ে যায় তা শুনলে চমকে যাবি।'

বাণীব্রত একপাশে চুপচাপ বসে। ভারী গম্ভীর মুখ। দেখলেই বোঝা যায় মানুষটা কি যেন চিন্তা করছে। স্বামীর দিকে বার দুই তাকিয়ে মনোরমা বলল,—'তখন থেকে কি ভাবছ বল দিকি? ছেলেটা এত বড় চাকরি পেল। কোথায় তাই নিয়ে আনন্দ-আহ্লাদ, হৈ-চৈ করবে তা নয়, মন-মরা হয়ে তখন থেকে মুখ বুজে বসে। অথচ টেলিফোনে খবরটা পেয়ে তো আর তর সয়নি তোমার। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এলে।'

॥ সতেরো ॥

স্ত্রীর অনুযোগ শুনে বাণীব্রত শুধু হাসলেন। একটি কথাও বললেন না। আসলে মানুষটার এমনি অমায়িক স্বভাব। কোনো বিষয়েই হৈ-চৈ, মাতামাতি নেই। বরং একটু চুপচাপ, নীরব থাকার ইচ্ছে।

অল্প হাসলে তাকে খুব সুন্দর দেখায়। বয়সের একটা সৌন্দর্য আছে। বাণীব্রতকে হাসতে দেখলে সেই কথাটা মনে পড়ে। পলিমাটির মত নরম মসৃণ মুখ। দৃষ্টির মধ্যে কার্তিক-অঘ্রাণের পাকা ধানক্ষেতের মত একটা পূর্ণতার ভাব আছে। বাণীব্রত খুব বেশী কথা বলেন না। কিন্তু যেটুকু বলেন, তাই যথেষ্ট। তার মধ্যে একটা ভাববার বিষয়বস্তু থাকে।

তাকে চিন্তামগ্ন দেখে কিরণ বলল,—'মা কিন্তু ঠিকই বলেছে বাবা। অফিস থেকে ফিরে আসবার পর তুমি যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেলে।' একটু থেমে সে আবার লঘু স্বরে প্রশ্ন করল,—'দাদার চাকরির খবর শুনে তোমার মন খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

বাণীব্রত জানেন তাঁর মেজছেলে কিরণ কিঞ্চিৎ বাকপটু। কথাবার্তায় চৌকস। ভেবেচিন্তে এমন কোণঠাসা ধরণের সব প্রশ্ন করে যে উত্তর না দিয়ে রেহাই নেই। বাণীব্রত তাই হেসে বললেন,—'নারে, মিলুর চাকরির খবর শুনে আমার মন খারাপ হবে কেন? আমি অন্য কথা চিন্তা করছিলাম।'

—'অন্য কথা আবার কি?' মনোরমা ঈষৎ সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করল।

বাণীব্রত ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'চিন্তার বিষয় আছে বৈকি কিরণ। একটু তলিয়ে দেখলে তোরাও সব বুঝতে পারবি। তুই বিশ্বাস কর টেলিফোনে খবরটা পেয়ে প্রথমে আমি বেশ চমকে উঠেছিলাম। মিলু বলে কি? এমন মোটা মাইনের চাকরি। মাস গেলে প্রায় আট হাজার টাকা হাতে পাবে। এ যে বিশ্বাসই হয় না। আমাদের অফিসের

বড় সায়েব আর কত পান? এর অর্ধেকের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী হতে পারে। শেষ পর্যন্ত মিলু যে এমনিভাবে কিস্তিমাৎ করবে, তাই কি আমি আগে ভাবতে পারতাম? ঈশ্বর কার প্রতি কখন সদয় হ'ন, কেউ তা বলতে পারে?'

—'বেশ তো, তাই যদি মনে কর, তাহলে অত ভাবনা-চিন্তার কি আছে? ভগবান মিলুর উপর সদয় হয়েছেন, সে ওর ভাগ্যি। আমরা পাঁচজনকে বলি। তাই নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করি।'

—'নিশ্চয়ই করব। বাণীব্রত সায় দিয়ে বললেন। 'শুধু কি তোমাদের সঙ্গে আনন্দ করলেই হবে? খবর পেয়ে আমার সেক্‌শনের লোকেরা তো এখনই বলতে শুরু করেছে। ছেলে আমেরিকায় যাওয়ার আগে তাদের একদিন ভালো করে খাওয়াতে হবে।'

—'ওমা!' মনোরমা গালে হতে রাখল। পরিহাসের সুরে বলল,—'অফিস শুদ্ধলোক এরই মধ্যে সব জেনে গেল? তুমি কি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে খবরটা চাউর করে এলে নাকি?'

বাপের পক্ষে কিরণ ওকালতি করল। 'তুমি মিছিমিছি ঠাট্টা করছ মা। অফিসের ঘর তো নয়। যেন হাট-বাজার। টেলিফোনে বললে আশেপাশের লোকেদের কানে সব খবরই যায়। কিছুই চাপা থাকে না। তাছাড়া ছেলে আমেরিকায় যাচ্ছে। এ তো একটা জবর খবর। বাবা যদি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সে-খবর জানিয়ে আসে, তাহলে কিছু দোষের হয় না।'

মিলন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। তার স্বভাব কিছুটা বাণীব্রতর মত। বেশী কথা বলে না। বরং মিতভাষী। চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করে। সে জিজ্ঞাসা করল,—কিন্তু বাবা, তুমি অন্য কথা কি চিন্তা করছিলে তা আমাদের এখনও বলনি।'

—'আমি বুঝতে পেরেছি মিলু। তুই আমার চিন্তা-ভাবনার কারণ জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস।' বাণীব্রত হেসে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন,—'তোর টেলিফোন পাওয়ার পর যতক্ষণ অফিসে ছিলাম, খুব আনন্দ লাগছিল। আমার টেবিলের চারপাশে সারাক্ষণ লোকের ভিড়। তাদের সকলের প্রশ্ন,—ছেলে আমেরিকায় কি চাকরি

পেল ? কত টাকা মাইনে ? কবে রওনা হবে ? কেউ তারিফ করে বলল, —'বাহাদুর ছেলে তোমার। এই কলকাতায় বসে সাত-সমুদ্দুর পারের একটা আট হাজার টাকা মাইনের চাকরি বাগিয়ে নিলে। তারপর এক সময় অফিস থেকে বেরিয়ে নীচে এলাম। আর কি অদ্ভুত ব্যাপার ছাখ। ট্যাক্সিতে উঠে একা হবার পর আমার মনের ভিতর এই ভাবনা-চিন্তাগুলো এসে জড় হল।'

বাণীব্রত তার আগের কথার জের টেনে বললেন—'জানিস মিলু, অনেক দিন আগে অবন্তীর বিয়ের ঠিক্‌ঠাক হবার পর আমার মনটা এমনি খারাপ হয়েছিল। তোর মার হয়তো মনে আছে। অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম।'

কিরণ প্রশ্ন করল,—'তুমি দিদির বিয়ের কথা বলছ বাবা ?'

—'হ্যাঁরে কিরণ, তোরা তখন ছেলেমানুষ। তোর দিদির বিয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করলাম। অমন দশ-পনের জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধে হল, কথাবার্তা চলল। আবার ভেঙেও গেল। শেষে অরুণের বাবা রাজি হলেন। একদিন অফিসে গিয়ে ওর চিঠি পেলাম। মেয়ে পছন্দ হয়েছে তাঁর। দেনাপাওনাতে অমত নেই। ছেলের বিয়ে সামনের অঘ্রাণেই দেবার ইচ্ছে। অসুবিধে না হলে আমি যেন সত্বর তার সঙ্গে দেখা করি।'

বাণীব্রত শুকনো ঠোঁটের উপর জিভটা একবার বুলিয়ে নিয়ে ফের শুরু করলেন,—জানিস মিলু অফিসে দু-একজন বন্ধু-বান্ধবকে চিঠির খবরটা বললাম। তারা সাহস দিল, লেগে যাও শুভকাজে, কোনো অসুবিধে হলে আমরা তোমার পাশে আছি। সেদিন সাহেবকে বলে একটু পরেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বিয়ের কথা পাকা। এমন সুসংবাদ তোর মাকে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু জানিস মিলু ট্যাক্সিতে উঠবার পরই মনটা কেমন ভারী হয়ে এল। ভাবলাম অবন্তীর বিয়ের তো ঠিক হল। কিন্তু মেয়ে এবার পরের ঘরে চলে যাবে। তখন আমার দেখাশুনো অবন্তী করত। অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে সে আমার কাছে এসে দাঁড়াত। হাত বাড়িয়ে জিনিসপত্রগুলো ধরত। মুখ হাত ধুয়ে এলে আমার চা আর জলখাবার নিয়ে আসত।

ট্যাক্সিতে বসে মনে হল এরপর বাড়ি ফিরে অবন্তীকে আর দেখতে পাব না। মাঝে-মধ্যে হয়তো বাপের বাড়িতে আসবে। কিন্তু সে আর ক'টা দিন? তারপর ধীরে ধীরে আসা-যাওয়া কমবে। আর এখন তো তাই হয়েছে। দেড়-দু' বছর পরে অবন্তী একবার আসে। তাও এক হপ্তা, বড়জোর দশদিনের জন্য। নিজের সংসার নিয়ে এমন ব্যস্ত যে বুড়ো বাপের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। এরপর কোনদিন হয়তো মরেই যাব। অবন্তীর সঙ্গে আর দেখাও হবে না।—'

—'ও, তাই বল।' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনোরমা ব্যঙ্গ করে হাসল। সেই জন্য তোমার এত দুঃখ? ছেলে আমেরিকায় চলে যাবে বলে প্রাণ কাঁদছে? তাই মুখ এত গম্ভীর। ভাবনা-চিন্তা, কত কি সব কাণ্ড করছ। কিন্তু আমি বলি, মিলু কি চিরদিনের জন্য আমেরিকায় চলে যাচ্ছে? আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে ওর দেখা হবে না? এই কলকাতায় তার নিজের দেশে ফিরে আসবে না ভেবেছ?'

—'কি জানি!' বাণীব্রত ম্লান হাসলেন। 'মিলু যে ফিরে আসবে, তাই বা কে বলতে পারে? যারা ওসব দেশে চাকরি নিয়ে যায়, তারা সবাই কি ফিরে আসে? অনেকেই তো বিদেশে সেট্‌ল করে থাকে। মিলুও হয়তো তাই করবে। আর যদি ফিরেও আসে, ততদিন আমি যে বেঁচে থাকব, তারই বা গ্যারান্টি কি আছে?'

—'তোমার হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে কেন বাবা? কিরণ চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করল। 'তুমি কি নিজেকে খুব দুর্বল মনে করছ?'

—'না, দুর্বল মনে করব কেন?' বাণীব্রত হাসবার চেষ্টা করলেন। 'তবে হ্যাঁ, শরীরটা তেমন জুৎ নেই বুকের সেই ব্যথাটা মাঝে-মধ্যে অনুভব করি, নিত্যি রুগী কে দেখবে বলতে পারিস? কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বাণীব্রত কি ভাবলেন। ফের গাঢ়স্বরে বললেন,—'আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানিস কিরণ?'

—'কি বাবা?'

—'এবার বোধহয় ঘণ্টা বাজছে।"

—'ঘণ্টা?'

—'হ্যাঁরে, ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা। ইস্টিশনে গিয়েছিস তো? কত রকম বেল পড়ে শুনিসনি? ফার্স্ট বেল, সেকেণ্ড বেল। গাড়ি আসে যায়। আজ ট্যাক্সিতে উঠে আমার তাই মনে হল। এবার ঘণ্টা বাজছে। এখন মিলন মেলা ভাঙতেই হবে। অমিয় বারিক লেনের ফ্ল্যাট বাড়ি ছেড়ে সব দিকে দিকে চলে যাব।

বাণীব্রতকে বেশ অন্যমনস্ক লাগছিল। নিস্তেজ, বিষণ্ণ ভঙ্গি। এবং একটু অসহায়।

—'কি সব বলছ বাবা? মিলন বাপের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখল।

—'ঠিকই বলছি মিলু। দিনে দিনে এই বাড়িটার উপর বেশ মায়া জন্মেছে। কম দিন তো থাকলাম না। এতদিন ভাবতাম যাচ্ছি—যাব। কিন্তু এবার ঘণ্টা বাজল। সময় সত্যি ঘনিয়ে এসেছে। আর পনের দিন পরে তুই আমেরিকায় যাবি। বাক্স-বিছানা নিয়ে কিরণ গিয়ে উঠবে হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে তারপর ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে আমরাও বেরুব। হিরু পড়বে বাঁকুড়ার কলেজে। আর তোর মা, আমি, বিন্তি—আমরা সবাই গিয়ে থাকব চন্দনপুরের বাড়িতে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাণীব্রত ফের বললেন,—এই তো শরীরের অবস্থা। খুব শীগ্গীর আবার বেল বাজবে। আমার ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা শুনব। তখন তুই আমেরিকায় বসে। কিরণ কলকাতায় আর হিরু বাঁকড়োর কলেজে। ঘণ্টা বেজেছে খবর পেলেও অত দূর দেশ থেকে তুই কি আর চোখের দেখা দিতে আসতে পারবি?

—'যত সব আদিখ্যেতার বুলি তোমার। আমার শুনতে একটুও ভালো লাগছে না!' মনোরমা চটেমটে উঠে দাঁড়াল। তারপর কিছুটা আদেশের সুরে ছেলেদের বলল,—যা দেখি তোরা। ঘরে বসে বাপের ওই সব অলক্ষুণে কথা শুনতে হবে না। বরং একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আয়। মন-মর্জি ভালো থাকবে।'

মিলন হেসে বলল—'আমি তাহলে একটু কলেজ স্ট্রীটের দিকে যাচ্ছি মা। খান তিন-চার সার্ট করানো দরকার। হাতে আর সময় কই? আজকে বরং অর্ডারটা দিয়ে আসি।'

—আর তোমার গরম স্যুট বড়দা ? কিরণ প্রশ্ন করল।

—'কাল অপরেশ এক জায়গায় নিয়ে যাবে বলেছে। গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রীটের দোকানে ওর জানাশুনো আছে। খুব ভালো টেলার। অথচ চার্জ বেশী নয়। গরম স্যুট সেখানেই করতে দেব।'

মনোরমা বলল—'যাবার আগে আমাকে কিন্তু একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাস মিলু। ভুলিস নি বাবা। ভালো করে মায়ের পুজো দেব। অত দূর দেশে যাচ্ছিস। একটুকু পেসাদী ফুল সর্বদা কাছে রাখবি।'

বাণীব্রত চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে গেলেন। গায়ে জামাটা দিয়ে ফের বেরিয়ে এলেন। স্ত্রীকে বললেন,—'আমি একটু ঘুরে আসি, বুঝলে ?'

—'তুমি বেরুচ্ছ ? মনোরমা ভুরু কুঁচকে তাকাল। জানালার ফাঁকে আকাশের দিকে নজর করে বলল,—'সন্ধ্যে হতে দেরি নেই। যাবে কোন দিকে ?'

—'এই আমহার্স্ট ষ্ট্রীট ধরে একটু বেড়িয়ে আসি। ডাক্তার বলেছে সকাল-সন্ধ্যে অল্প হাঁটলে শরীরটা ভালো থাকবে।'

তবু মনোরমার চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া ভাসছিল। সে শুকনো মুখ করে বলল,—তা হোক গে। তুমি বেশী দূর যেওনা বাপু। এই তো দুপুরবেলায় দুম দুম করে বোমা ফাটছিল। আর যা দিন কাল পড়েছে। নিত্যি কেবল খুনোখুনীর খবর। মানুষ খুন। কাল ভাবনীপুরে রাস্তার মোড়ে একটা সেপাইকে কারা কেটে ফেলেছে।

বাণীব্রত মৃদু হেসে বললেন—অত ভয় পেও না। গণ্ডগোল দেখলে আমি কি আর সেদিকে পা বাড়াব ?

—'কি জানি! আমার বুকের ভিতরটা কেবল ঢিপঢিপ করে। যতক্ষণ না তোমরা বাড়ি ফিরছ, ততক্ষণ আর মনে সোয়াস্তি নেই। হাতে-পায়ে যেন জোর পাই না।'

কিরণ বলল,—'তুমি চিন্তা কর না মা। চিরকাল এমন থাকবে না, বর্ষার মেঘ যতই কালো হোক গর্জন করুক সূর্যকে সারাক্ষণ আড়াল করে রাখতে পারে? নীল আকাশ একদিন হেসে উঠবে। তার কণ্ঠস্বরে একটা স্থির বিশ্বাস ফুটে উঠল। সে পুনরায় বলল,—'যে

মানুষটা ক্ষেতে লাঙল দেয়, যে লোকটা রুজি-রোজগারের ধান্দায় রোজ পথে বেরোয় তোমার মত যে মায়েরা নিত্যি স্বামী পুত্রের জন্য খাবার তৈরি করে অপেক্ষা করে, তারা কিছুতেই এসব গণ্ডগোল বেশীদিন বরদাস্ত করবে না।'

তার মেজছেলে কেমন হেঁয়ালীর মত কথা বলে। ওর বক্তব্যের অর্থ মনোরমার কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। কিন্তু কিরণের মুখের ভাষায়, কথার সুরে একটা আশ্বাস রয়েছে। মনোরমা তা বেশ বুঝতে পারে।

প্রথমে মিলন, তারপর বাণীব্রত দরজা খুলে বেরোলেন। কিরণ বাড়িতে রইল। মনে হল তার এখন বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই। সে ঘরে ঢুকে একটা মোটা ডাক্তারী বই বের করে নিবিষ্ট মনে পড়ত লাগল। বিন্তি কখন উঠে বাথরুমে খিল দিয়েছে। এখনও বেরিয়েছে বলে মনে হয় না।

রান্নাঘরে ঢুকে মনোরমার হঠাৎ ছোট ছেলের কথা খেয়াল হল। আশ্চর্য! এতক্ষণ সে হিরুর সাড়া-শব্দ শোনে নি। অথচ ছেলেটা বাড়িতেই ছিল। বাণীব্রত যখন ফিরলেন, তখন সে টেবিল-চেয়ারে বসে কি সব লিখছিল।

তার হয়েছে যত জ্বালা। এত বড় ছেলেকে কি চোখে চোখে রাখা যায়? কখন সে সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ে মনোরমা তা কেমন করে টের পাবে? অথচ স্বামীর মুখে এক কথা। ছেলেটার উপর তোমার একটুও নজর নেই। নইলে হিরু কখন বেরিয়ে যায়, কোথায় আড্ডা দেয় মনোরমা সে খবরটুকু রাখতে পারে না।

ছেলের খোঁজে সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। খুন জখম, মারামারির আলোচনা হলে হিরুর জন্য তার চিন্তা বাড়ে। একটা অদ্ভুত ভয় এবং অস্বস্তি সমস্ত অঙ্গে শীতল স্রোতের মত ওঠা-নামা করে। হৃদপিণ্ডের ধুকধুকুনি আরো দ্রুত হয়।

বারান্দায় মেয়েকে দেখতে পেয়ে মনোরমা শুধোল,—'হাঁরে তোর ছোড়দা কোথায়? তাকে দেখেছিস নাকি?

বিন্তি ছাদে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সে মাথা নেড়ে জবাব দিল,—

'জানি না তো।' ফের হাঁসের মত গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'যদি ছাদে গিয়ে থাকে তো পাঠিয়ে দেব মা?'

—'হ্যাঁ পাঠিয়ে দিবি, বলবি, আমি এখুনি ডেকেছি।' মেয়েকে সে পরিষ্কার নির্দেশ দিল।

কি খেয়াল হতে মনোরমা একবার ছেলে-মেয়ের পড়ার ঘরে ঢুকল। শুধু পড়বার ঘর বললে ভুল বলা হয়। এখানে হিরু রাত্তিরে শোয়। নেহাৎ ছোট ঘর। একটা কাঠের তক্তপোশ আছে। আর পড়বার চেয়ার টেবিল। তাইতেই ঘর বোঝাই। দুটো মানুষ পাশাপাশি দাঁড়াবার মত ঠাঁইটুকু নেই।

এই ঘরটায় মনোরমা খুব কম আসে। বিস্তি ঝাঁট-পাট দেয়, পরিষ্কার করে। চারপাশে তাকিয়ে মনোরমার খুব খারাপ লাগছিল। কি অগোছালো আর নোংরা। যেন ভূতের ঘর করে রেখেছে। টেবিলের উপর বই-টই, খাতাপত্র ছড়ানো। বিছানার চাদরটা যাচ্ছেতাই ময়লা। খাটের তলায় পুরু ধুলো জমেছে। ওদিকে এককোণে কিছু ছেঁড়া, দলা-পাকানো কাগজ ডাঁই করে রাখা। বিস্তির উপর ভীষণ রাগ হল তার। ধিঙ্গি মেয়ে। কেবল নাচতে জানে। দিন দিন ঘরকন্নার কাজের যা নমুনা হচ্ছে।—

ঘরটাকে সংস্কার করার জন্য কোমর বেঁধে লাগল মনোরমা। টান মেরে ময়লা চাদরটাকে নীচে ফেলে দিল। ধোপার বাড়িতে কাচানো একটা চাদর তার বাক্সে আছে। দ্রুত পা ফেলে মনোরমা নিজের ঘর থেকে সেটা নিয়ে এল। কিন্তু তোশকের যা অবস্থা। কেমন ট্যারা-বাঁকা করে পাতা। আর কবে এতখানি ফেটেছে কে জানে। বিস্তি তাকে কিছু জানায় নি। মনোরমা সেটাকে তুলে ছেঁড়া দিকটা উল্টো করে ফের পাতবে ভাবল। আর তোশকটা তুলতে গিয়ে সে ভীষণ চমকে উঠে একটা অব্যক্ত আতঙ্কসূচক ধ্বনি মুখ দিয়ে বের করল।

পাশের ঘর থেকে কিরণ তখুনি ছুটে এল।—'কি হয়েছে মা? তুমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?' সে ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করল।

মনোরমা তখনও থরথর করে কাঁপছে। কিরণ এগিয়ে এসে মায়ের

হাত দুটো ধরতে সে ক্রমে ক্রমে সহজ, স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তোশকের নীচে রাখা প্রাণহর চকচকে বস্তুটির উপর অঙ্গুলি সংকেত করে মনোরমা বলল,—'ওই দ্যাখ কিরণ, ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভিতর সিঁধিয়ে আসছে বাবা।'

কিরণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গেল। উজ্জ্বল, চকচকে জিনিস হাতে তুলে নিয়ে বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে দেখল। প্রায় ছ-ইঞ্চি লম্বা একটি ছোরা। খাঁটি ইস্পাতের জিনিস। ধারালো মুখটার দিকে তাকালে সাপিনীর জিহ্বাগ্রের কথা মনে হয়।

গম্ভীর মুখ করে কিরণ বলল,—'হিরু অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ভয় হয়, আমরা হয়তো ওকে আর ফিরিয়ে আনতে পারব না।'

—'কি বলছিস তুই?' মনোরমা ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করল, 'হিরু কোথায় গিয়েছে যে ওকে আমরা আর ফিরিয়ে আনতে পারব না।'

'কোথাও যায় নি মা।' কিরণ ম্লান হেসে জবাব দিল।'

পরে মুখ নীচু করে কিছুটা রহস্যের সুরে বলল,—'আমি বলছিলাম হিরুর মন আর এ বাড়িতে নেই। সে এখন অন্ধের মত অন্য এক বাড়ির পিছনে ছুটছে।'

মনোরমার কান্না পাচ্ছিল। তার হিরু অমন সোনার টুকরো ছেলে। ফি-বছর-পরীক্ষায় ফার্স্ট, ....কোনোদিন সেকেণ্ড হয় নি। বরাবর স্কুল থেকে একরাশ প্রাইজ পেয়েছে। কতদিনকার ক'থা হল। সেই প্রাইজের বই দেখতে তার বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় পড়ে যেত। দুপুর বেলায় আর পাঁচটা ফ্ল্যাটের মেয়ে-বৌরা এসে হিরুর কত প্রশংসা করত। বলত, —'ছেলে আপনার হীরু নয়, ও হ'ল হীরে। খাঁটি হীরে দিদি। কি সুন্দর স্বভাব, দেখলে চোখ জুড়োয়। সেই হিরু···· তার ঘর আলো-করা হীরে। ছি, ছি! অমন ছেলের শেষকালে কিনা এই পরিণতি। লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের কাছে ছোরাছুরি রাখছে?—

কিরণ বলল,—'তুমি অত ভেব না মা। হিরুর সঙ্গে আমি একটা বোঝাপড়া করব। বাবাকে ঘুমোতে দাও। তারপর ঘরে খিল দিয়ে আমরা দুজনে একবার আলোচনায় বসব।'

—'কি হবে বসে? ওকে কি কিছু বোঝাতে পারবি?'—মনোরমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ফের ছেলেকে ঈষৎ মিনতি করে বলল,—'তোর বাবাকে আর এসব কথা জানাস নি কিরণ। রোগা মানুষ, এই ছোরা-ছুরির বৃত্তান্ত শুনলে ভীষণ অস্থির হবে। তখন কিছুতেই আর শান্ত করতে পারবি না—'

কিরণ খাটো গলায় বলল,—'শুধু বাবাকে কেন? বাড়িতে এসব কথা আর নাই বা আলোচনা করলে। দুদিন বাদে দাদা আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। তাকে বলে মন ভারী করে লাভ কি?'

সন্ধ্যে হতেই মনোরমা রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। আর বেরোল না। দরজায় শব্দ হ'লেই সে উঠে দাঁড়ায়। কড়া নাড়ার ভঙ্গি তার সব চেনা। তবু তার গলা শুনবার জন্য সে কান পাতল। প্রথমে বাণীব্রত, তার পর আরো ঘণ্টাখানেক পরে মিলন বাড়ি ফিরল। দুবারই বিস্তি গিয়ে দরজা খুলেছে। মনোরমা নিঃশব্দে বসে। তার বিষন্ন হৃদয়, মনটা পাথরের মত নীরেট শক্ত বোধ হচ্ছে। কারো সঙ্গে একটা কথা বলতে ভাল লাগে না।

ঘড়িতে আটটা, তারপর নটা বাজল। কিন্তু হিরুর দেখা নেই। মনোরমার মাথার ভিতর হাজার রকম চিন্তা ধোঁয়ার মত পাক খাচ্ছে। এই অবুঝ, গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলেকে নিয়ে সে যে কি করবে! বাণীব্রত একবার ঘরের ভিতর থেকে বিস্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোর ছোড়দা কোথায় রে? কোনো সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না।' আর মেয়েও তেমনি। একটু রেখে ঢেকে কথা বলতে শেখে নি। সে চটপট জবাব দিল,—'ছোড়দা এখনও ফেরেনি বাবা।'

'এখনও ফেরেনি?' বাণীব্রত যেন গর্জে উঠলেন। পর মুহূর্তে বেশ চেঁচিয়ে বললেন,—'আজ আসুক সে। আমি একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।'

কিরণ কাছে গিয়ে বলল,—'হিরু তো প্রায়ই অমন দেরি করে ফিরছে। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বাবা? তোমার প্রেসারটা আবার বেড়েছে না? চেঁচামেচি করলে শরীর খারাপ হতে কতক্ষণ?'

রাত দশটা বাজলে মনোরমা ব্যস্ত হয়ে উঠল। হতভাগা ছেলে, ঘরে ফিরুক একবার। ওর জন্যে ভাতের থালা আগলে মনোরমা আর বসে

থাকতে পারবে না। ঘরশুদ্ধু লোককে উপোসী রেখে রাত দুপুর পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে? আজ সে নিশ্চয় এর একটা বিহিত করবে। ছেলে তো নয়, পেটের শত্তুর। মনোরমাকে দিন রাত্তির কাঁদাবে বলেই যেন ও কোলে এসেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় শব্দ হল। এবং কি আশ্চর্য। এত চিন্তা-ভাবনা এক লহমায় যেন কুয়াশার মত কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু না। দরজার কড়া নাড়ার ধরনটা তো ঠিক হিরুর নয়। তাহলে এত রাত্তিরে কে আবার তাকে জ্বালাতে এল?

দরজা খুলে বিস্তি প্রায় চিৎকার করে উঠল। 'মেজদা শীগগীর এস। কারা এসেচে দেখে যাও—'

কিরণ দরজার সামনে গিয়ে একটু থতমত খেল। ঢোক গিলে প্রশ্ন করল,—'আপনারা? এত রাত্তিরে?'

ছোট একটি দল। প্রায় আট-দশ জন সশস্ত্র পুলিশ। সার্জেণ্ট, সাব-ইন্সপেক্টর, সেপাই সব আছে। দরজার সামনে স্থান অসংকুলান। তাই পাঁচ-ছটা সিঁড়ি পর্যন্ত পুলিশে ভর্তি। নিশ্চয় নীচে রাস্তার উপর এবং এদিক-ওদিক আরো কিছু সশস্ত্র পুলিশ বাড়িটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

একজন সাব-ইন্সপেক্টর কথা বলল,—'আমরা হীরন রায়কে খুঁজছি।' তাকে একটু ডেকে দিন।'

—'হিরু বাড়িতে নেই।'

—'বাড়িতে নেই মানে? কোথায় গিয়েছে নিশ্চয় বলবেন।'

'আমরা জানি না।'

—'কখন ফিরবে?'

'তাও বলতে পারি না।'

সাব-ইন্সপেক্টর তার সঙ্গীর দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বলল,—'পাখি উড়েছে মনে হয়।'

কিরণ সমস্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেনি। একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল,—'আমার ভাই মানে হিরুর বিরুদ্ধে কি কোনো অভিযোগ আছে?'

—'নিশ্চয় আছে।' সাব-ইন্সপেক্টর ঝাঁকিয়ে জবাব দিল। মৃদু হেসে বলল,—'হিরণবাবুর ঘরটা একটু সার্চ করতে চাই। আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিন।'

বাদানুবাদ শুনে ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে। মিলন, মনোরমা এবং বাণীব্রত নিজেও। বিস্তি খানিকটা ভয় পেয়ে মায়ের পিছনে দাঁড়িয়েছে।

মিলন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল,—'ওর ঘরটা সার্চ করবেন কেন?'

'সে প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে পারব না। তবে আমাদের সঙ্গে সার্চ-ওয়ারেন্ট আছে।' দারোগা পরিষ্কার উত্তর দিল।

মনোরমা হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠল,—'ঘর-তল্লাসী করে কি পাবেন আপনারা? একটা দুধের ছেলে। এখনও ভালো করে গোঁফ-দাড়ি বেরোয় নি। তার ঘরে কি থাকবে ভেবেছেন?'

বাণীব্রত এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। একটি কথাও বলেন নি। দারোগা কিছু বলবার আগেই তিনি বড় ছেলেকে জানালেন,—'তোর মাকে বুঝিয়ে বল মিলু, মিছিমিছি তর্ক করে কোনো লাভ নেই।'

কিরণ দরজা থেকে সরে দাঁড়াতেই পুলিশের দলটি বাড়ির ভিতর ঢুকল। হিরুর ঘরটা নেহাত ছোট। দুটি মানুষের পাশাপাশি দাঁড়াবার জায়গা হয় না। এতগুলি লোক কোথায় ঢুকবে? অগত্যা সকলেই বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। সেই সাব-ইন্সপেক্টর আর একজন পুলিশ মিলে তল্লাসী শুরু করল।

বাক্স-বিছানা, তোশক-বালিশ, খাটের নীচে থেকে শুরু করে ঘরের কোণ পর্যন্ত সমস্ত জায়গা ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজল। সেই চকচকে ছোরাটার কথা মনোরমার বার বার মনে পড়ছিল। ভাগ্যিস্ আজ বিকেলে ঘর গোছাবে বলে সে কোমর বেঁধে লেগেছিল। নইলে এতক্ষণ ছোরাটা ওই পুলিশের লোক খুঁজে বের করত। অবশ্য এখনও ঠিক দুশ্চিন্তা যায় নি। ছোরাটা তার ঘরের আলমারিতে। পুলিশকে বিশ্বাস কি? আবার অন্য ঘরগুলোতে ঢুকে হামলা তল্লাসী করতে চাইবে কিনা কে জানে!

টেবিলের উপর অগোছালো করে রাখা বইপত্র ওরা নেড়ে-চেড়ে দেখছিল। দু-একটা বই সরাতেই হিরুর চিঠিটা বেরিয়ে পড়ল। খুব ছোট

চিঠি। দারোগা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,—'যা ভেবেছিলাম তাই। চলুন, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। পাখি উড়ে পালিয়েছে—'

মনোরমার মুখখানা রক্তশূন্য, ছাইবর্ণ মনে হচ্ছিল। সে ভিজে স্যাঁতসেঁতে গলায় শুধোল,—'কার চিঠি ওটা?'

—'আপনার। হিরণবাবু মানে আপনার ছেলে লিখেছেন। পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, চলি আমরা।' কথা শেষ করে দারোগা আর একটি মুহূর্তও দাঁড়াল না। তার দলবল নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

মনোরমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল,—'ও কিরণ, চিঠিটা পড় না বাবা। পেটের শত্তুর কি লিখেছে তাই শুনি।'

পত্রের বক্তব্য দারোগা আগেই ফাঁস করে দিয়েছে। তবু কিরণ ধীরে ধীরে পড়ল। হিরু লিখেছে—

মাগো,

চিঠি লিখে জানিয়ে যাওয়া আমাদের নির্দেশ নয়। তবু পারলাম না। এখন তুমি বারান্দার চেয়ারে বসে হাসিমুখে গল্প করছ। আর এই সুযোগে আমি চলে যাচ্ছি মা,....তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

কতদিন তোমাদের কথা শুনিনি। কত অবাধ্যতা করেছি। বাবাকে বলো আমাকে ক্ষমা করতে। আর তুমি? আমার জন্যে কেঁদ না মা। দিন রাত্তির চোখের জল ফেলে নিজেকে কষ্ট দিও না।

কোথায় যাচ্ছি জানাতে পারব না। তবে দাদার মত ডলারের দেশে নয়। যেখানে যাব, সেখানে অট্টালিকা দূরে থাক, হয়তো একটা ইটের বাড়িও নেই। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। খালি গা। নামমাত্র বস্ত্র সম্বল অসহায় মানুষ।

তুমি বিশ্বাস কর মা। একদিন ওই গ্রাম থেকেই আমরা দলে দলে শহরে এসে ঢুকব। ইতি

তোমার

হিরু

## ॥ আঠার ॥

ঘরের মধ্যে এখন নিশীথের স্তব্ধতা। সকলেই চুপ। কেউ একটি কথা বলছে না। বাণীব্রত, মিলন, কিরণ এমন কি মুখরা বিন্তিও। মনোরমা একটা চুপসানো বেলুনের মত বিছানার উপর প্রায় হেলে পড়েছে।

অনেকক্ষণ পরে মিলন মুখ খুলল। সে দুঃখ করে বলল,—'এই কাঁচা বয়সে হিরু বাড়ী ছেড়ে রাজনীতি করতে চলে গেল?'

আর কদিন পরেই ওর টেস্ট পরীক্ষা। সেটাও দিল না।'

কিরণ মুখ তুলে বলল,—'তুমি ওর চিঠির ভাষা শুনে বুঝতে পার নি দাদা? হিরুর কনভিকশন বা বিশ্বাস এখন ইস্পাতের মত কঠিন রূপ নিয়েছে। পড়াশুনো বা পরীক্ষার চিন্তা ওর মাথায় নেই। তার সিদ্ধান্তকে তুমি ভুল বা ঠিক যাই বল, হিরু এখন ওই পথেই চলবে।'

মনোরমা কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'তোরা দুই ভাই হিরুকে খুঁজে বের কর বাবা। একটিবার আমার সামনে নিয়ে আয় তাকে। আমি আর এক বেলাও কলকাতায় থাকতে চাই না। তোর বাবা নিয়ে যায় ভালো, নইলে হিরুকে সঙ্গে করে আমি একাই চন্দনপুরে চলে যাব।'

মায়ের কথায় মিলন কোনো উত্তর দিল না। সে চুপ করে রইল। কিরণ মাথা চুলকে ঈষৎ সন্দেহের সুরে বলল,—'কিন্তু হিরু কি তোমার সঙ্গে চন্দনপুরে যেতে চাইবে মা?'

মনোরমা চোখ মুছে জবাব দিল,—'আমি সামনে দাঁড়ালে হিরু কোনো-দিন না বলে নি। কখনও আমার কথার অবাধ্য হয় নি। আজ যদি দুঃখিনী মাকে বিমুখ করে তাহলেও আমি ছাড়ব না কিরণ। যেমন করে পারি ওকে রাজি করাব। যতক্ষণ না আমার সঙ্গে চন্দনপুরে যেতে চাইবে ততক্ষণ আমি কাঁদব, চোখের জল ফেলব। দেখি সে কতক্ষণ শক্ত থাকতে পারে। তোরা শুধু একটিবার তাকে ফিরিয়ে আন বাবা।'

কিরণ ঠোঁট কামড়ে অল্পক্ষণ চিন্তা করল। নাস্তিকের মত মাথা নেড়ে বলল,—'নিজেকে শক্ত কর মা। হিরুকে বোধহয় এখন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।'

—'তার মানে? তোরা দুই ভাই ওকে খুঁজে আনতে পারবি না?'

কিরণ ম্লান হাসল। 'কোথায় খুঁজতে যাব বলতে পার? হিরু তো রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যায় নি। যে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনব? কিম্বা বাইরে বেরিয়ে সে পথ হারিয়ে ফেলবার ছেলে নয়। বরং যেখানে যাবার সেখানে হিরু পথ চিনেই গেছে মা।'

—'ছাই চিনেছে।' মনোরমা রাগ করে বলল, 'দুধের ছেলে, ভালো-মন্দ সে কি বোঝে তাই বলতে পারিস? তোদের আর চিন্তা-ভাবনা কিসের বল? তোরা দুই ভাই মানুষ হয়ে গেছিস। মিলু ইনজিনিয়ারিং পাশ করেছে। আজ বাদে কাল আমেরিকায় চলে যাবে। সেখানে আট হাজার টাকা মাইনের চাকরি তার জন্য তৈরী আছে। আর তুই পাশ-করা ডাক্তার। শীগগির তোর ভালো চাকরি হবে। কিম্বা পশার জমবে। ছোট ভাইটা স্কুলের গণ্ডী পেরোয় নি। তাকে নাবালক বলতে পারিস। সে কোথায় মরল কি বাঁচল, তার খোঁজে তোদের আর প্রয়োজন কি?

মিলন তাড়াতাড়ি বলল,—'এসব কি বলছ মা? হিরুর জন্য আমাদের যথেষ্ট দুর্ভাবনা। এই বয়সে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? কেমন করে ওর খোঁজ পাওয়া যায় আমি তাই ভাবছি। তুমি চিন্তা কর না মা। আমরা নিশ্চয় হিরুর খোঁজ করব।'

বাণীব্রত এতক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। মানুষটা নির্বাক বসে। তাঁর দুঃখ চিন্তা সবই গভীর। বাইরে সীমিত প্রকাশ। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বাণীব্রত মন্থর এবং বিষণ্ণ গলায় বললেন,—'আমি তখন বলি নি মিলু? এবার ঘণ্টা বাজছে। হাতে আর সময় নেই, বিদায়ের বেলা ঘনিয়ে এল। অমিয় বারিক লেনের ফ্ল্যাট বাড়ী ছেড়ে আমরা সব দিকে দিকে চলে যাব। কিন্তু তাই বলে ঘণ্টা বাজিয়ে আমার হিরু যে প্রথম বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে, একথা আমি কোনোদিন ভাবি নি রে।'

মনোরমা কান্না-ভেজা গলায় মিনতি করল,—'তোমার ওই অলক্ষুণে কথাগুলো আমার কানে আর শুনিও না। খালি ঘণ্টা বাজছে আর ঘণ্টা বাজছে। এতই যদি ঘণ্টা শুনতে পাও তাহলে একবার বল না আমার মরণের ঘণ্টা কবে বাজবে? কবে এই জ্বালা-যন্ত্রণা সব জুড়োবে গো?—'

কিরণ মায়ের হাত ধরে বলল,—'চুপ কর মা। স্থির হও। এত চঞ্চল হলে কি চলে? দাদা তো বলেছে, আমরা নিশ্চয় হিরুর খোঁজ করব। তুমি একটু ধৈর্য ধর।'

ছেলের সান্ত্বনায় কাজ হ'ল। মনোরমা কান্না থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। পুলিশ চলে যাবার পর বিস্তি বুদ্ধি করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে কৌতূহলী প্রতিবেশীদের উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছে মনোরমা। বাড়ীতে পুলিশ ঢুকে ঘর তল্লাসী করে গেল। এমন মুখরোচক খবর এখন এই ফ্ল্যাট বাড়ীর প্রতিটি দুয়ারে প্রচার হয়ে গেছে। কক্ষে কক্ষে তাই নিয়ে সরস আলোচনা। নেহাৎ রাত্তির এগারোটা বাজে। নইলে কৌতূহলী গৃহিণীরা কেউ কেউ মনোরমার কাছে নিশ্চয় আসত। আর হিরুর চিঠির খবর শুনলে তো কথাই নেই। শুধু ফ্ল্যাটের লোক নয়। পাড়ার মেয়েরাও বাদ থাকবে না। তার দুঃখে সমবেদনা জানাতে সব দল বেঁধে হাজির হবে।

আজ রাত্তির বেশী বলে মনোরমা রেহাই পেল। কিন্তু কাল সকাল হলেই পড়শীদের আনা-গোনা, সমব্যথীদের জ্বালায় তাকে অস্থির হতে হবে। শুকনো সান্ত্বনার বুলি কত শোনা যায়? মনে হয় যেন কাটা ঘায়ের উপর নুনের ছিটে পড়ছে।

রাত আটটা বাজলে বাণীব্রত খেতে বসেন। ডাক্তারের নির্দেশ সে রকম। কিন্তু অত সকালে মানুষটা কি খেতে চায়? কেবল গাঁইগুঁই আর একটু রাত করবার অভিপ্রায়। কিন্তু মনোরমা নাছোড়বান্দা, ডাক্তার যখন বলেছে, তখন রাত আটটা বাজলেই খেতে বসতে হবে। বিস্তিটা সারাদিন এ-ঘর, ও-ঘর ছুটে বেড়ায়। তারপর স্কুলে যাওয়া আছে। আবার নাচের পরিশ্রম। রাত একটু বেশী হলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিম্বা বসে ঢুলবে। স্বামীর সঙ্গে মেয়েকেও তাই খাইয়ে দেন মনোরমা। অত বড়

মেয়ে। একবার ঘুমোলে তাকে তুলে খাওয়ানো এক ঝামেলা। যা ঘুমকাতরে বিন্তি। রাগ করে মনোরমা বলে,—'আদিখ্যেতা।' আড়ালে অবশ্য হাসে আর নিজের মনে বকে—'দেখব মা। বিয়ের পরে ছেলেপুলে কোলে আসুক। তখন এই ঘুম কোথায় পালাবে। দরকার হলে সমস্ত রাত্তির ছেলে কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে। অমনি ছেলে-মেয়ে বড় হয় না।'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনোরমা তাই অবাক হল। দেখে মনে হয় বিন্তি যেন একটু ভয় পেয়েছে। এত রাত্তির পর্যন্ত সে বেশ জেগে আছে। দিব্যি বড় চোখ। নিদ্রার ভারে তেমন ছোট হয় নি। অথচ অন্যদিন খাওয়ার পরই বিন্তি বিছানায় শোয়। আর বড়জোর দশ মিনিট পেরোবার আগেই সে নিদ্রামগ্ন, অসাড়। কানের কাছে শাঁখ না বাজালে তার ঘুম ভাঙবে বলে মনোরমা বিশ্বাস করে না।

স্বামীকে লক্ষ্য করে সে বলল,—'তুমি আর জেগে আছ কেন? ওষুধটা খেয়ে শুয়ে পড়গে। বিন্তি এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। মনোরমা তাকে দেখে সস্নেহে হাসল। 'তুই দেখছি আজ রাতচরা পাখি হয়েছিস। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই।' ফের বিষণ্ণ ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করল,—'ছোড়দার জন্যে খুব মন কেমন করছে, নারে?'

এতক্ষণ বিন্তি কাঁদে নি। কিন্তু মায়ের কথা শুনে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মনোরমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে বলল,—'ছোড়দা আর ফিরে আসবে না মা?'

—'বালাই ষাট। ফিরে আসবে না কেন? নিশ্চয় ফিরে আসবে।' মনোরমা যেন নিজের অবুঝ মনকে সান্ত্বনা দিল। ধীরে ধীরে বলল,—'মা-বাবা, ভাই-বোন, নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে ক'দিন ভাল লাগে? কিন্তু তুই আর রাত করিস নে মা। যা, এবার শুয়ে পড়। তোর দাদাদের খেতে দিয়ে আমি এখুনি আসছি।'

মিলন প্রস্তাব করল,—'আজ আমরা একসঙ্গে খাব মা। তুমি, আমি আর কিরণ তিনজনে বসব।'

—'আমাকে আজ আর খেতে বলিস না মিলু। মনোরমা একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলল। ফের চোখের জল মুছে বলল,—'সেই শত্তুরের জন্য আমি আজও হাঁড়িতে চাল নিয়েছি বাবা। এই রাত্তিরে সে কোথায় পড়ে রইল, কি খেল কিছুই জানতে পারলাম না। আর আমি পঞ্চব্যান্নন দিয়ে সাজানো থালার সামনে বসে দিব্যি ভাতের গেরাস মুখে তুলব, তা পারব না। কিছুতেই আজ পারব না।'

কিরণ যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল,—'মিছিমিছি শরীরকে কষ্ট দিচ্ছ মা। হিরু যদি দুদিনের জন্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বেড়াতে যেত, তাহলে কি তুমি উপোস করে থাকতে? আর দাদা তো বলেছে, আমরা নিশ্চয় হিরুর খোঁজ করব।'

—'দ্যাখ, খুঁজে যদি পাস তাকে।' মনোরমা ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ম্লান হেসে বলল,—'তোর ভয় নেই কিরণ। শরীর যখন আছে তখন আহার নিদ্রা দুই-ই প্রয়োজন হবে। আর দুঃখ-শোক কি চিরকাল সমান থাকে? দিনে দিনে কমবে বাবা। আজ খেলাম না তো কি হয়েছে? দেখবি কাল দুপুরে আবার ভাতের থালার সামনে বসব। তার পরের দিন হাসব, বেড়াব। হিরুর কথা ভেবে কি নিত্য উপোসী থাকতে পারব?'

রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে মনোরমা নিজের ঘরে ঢুকল। রাত্তির প্রায় বারোটা হবে। খাটের উপর বাণীব্রত শুয়ে। মানুষটা ঘুমোচ্ছে কিনা কে জানে। নীচে মেঝের উপর বিছানা পেতে সে আর বিন্তি শোয়। মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনোরমা নিশ্চিন্ত হল। বিন্তি এখন ঘুমে কাদা। তবু ভাল মেয়েটা ঘুমিয়েছে। নইলে বিছানায় শুয়ে তাকে পাঁচ রকম প্রশ্ন করত। সব কথার জবাব দিতে মনোরমার হয়তো-ভালো লাগত না।

ঘরের জানালা খোলা। বাপ আর মেয়ে কেউ বন্ধ করে নি। একটু রাত বাড়লেই ঠাণ্ডা পড়বে। ভোরের দিকে বেশ শীত-শীত করে। ঋতু পরিবর্তনের সময়,—সাবধানে না থাকলেই সব রোগে ভুগবে। শোবার আগে মনোরমা তাই জানালা বন্ধ করে রাখে। শুধু পুব দিকের একটা পাল্লা খোলা থাকে। কিন্তু তাই যথেষ্ট। শেষ রাত্তিরে ঠাণ্ডা বাতাস ফাঁকটুকু দিয়ে হু-হু করে ঢোকে।

বিছানায় শুয়ে মনোরমা এপাশ-ওপাশ করল। কই তার চোখ ভারী

হয়ে আসছে না তো? আজ রাত্তিরে কি ঘুম হবে না তার? মনোরমা নানা রকম সব কথা মনে করবার চেষ্টা করল। ছেলেবেলার বন্ধুদের মুখ··· খুঁটিনাটি কত রকম ঘটনা। তার বাবা বলতেন দুঃখ পেলে পুরোন দিনের কথা ভাববি। যে সমস্ত কথা মনের মাটির তলায় বহুদিন ঢাকা পড়ে আছে। দেখবি, তাতে অন্তরের ভার লাঘব হয়। কিন্তু মনোরমা কত চেষ্টা করছে। কবরের মাটি খোঁড়ার মত মনের ভিতরটা কেবল খুঁচিয়ে চলেছে। তবু তার একটা ঘটনাও ভালো করে মনে পড়ল না। মনোরমা বার বার চোখ খুলে তাকাচ্ছে। ভাগ্যিস ঘরে আলো নেই প্রায় অন্ধকার। নইলে এই রাত দুপুরে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে তার কি রকম অস্বস্তি লাগত। অথচ চোখ বন্ধ করলেই সেই শত্তুরের মুখ। তার সব স্মৃতি। ছোটখাট কত ঘটনা। ঠিক যেন মিছিল করে মনের পর্দায় ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে। নিজেকে আর কিছুতেই সামলাতে পারল না মনোরমা। তার চোখের কোল বেয়ে অবাধ্য অশ্রুধারা ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। খেতে বসে কিরণ বলছিল,—'হিরুর কথা তুমি বেশী ভেব না মা। তাহলেই তোমার মনটা একটু হাল্কা হবে।' তার ছেলেরা বড় হয়েছে ঠিকই। কিন্তু মায়ের মনের ব্যথা কতটুকু বোঝে? কেমন করে হিরুর চিন্তা ভুলবে মনোরমা? শুধু অন্য কথা ভাবতে হবে? ঘরময় হিরুর স্মৃতি। ঘুরতে ফিরতে গেলে সব চোখে পড়ে। আরো সব সূক্ষ্ম স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। কাল সকালে কেৎলিতে মাপ করে জল নেবার মুহূর্তে সেই হতভাগা ছেলের কথা তার মনে পড়বে না। হাঁড়িতে চাল ফেলবার সময় হিরুকে বাদ দিতে হবে। তারপরও কি নিজের জন্য জল মাপতে পারবে মনোরমা? হায় ঈশ্বর! আর কিছুদিন আগে কেন তার স্বামী অবসর নিলেন না? এক মাস পূর্বেই কেন সে চন্দনপুরে চলে যায়নি?

বিকেল প্রায় মরতে বসেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। অবসন্ন বেলা যায় যায়। মেট্রোর সামনে অপরেশ দাঁড়িয়েছিল। পরনে একটা হাল্কা নীল রঙের প্যাণ্ট আর কোট। গায়ে সাদা জামা। গলায় নিপুণভাবে বাঁধা সুদৃশ্য টাই। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। সে বারবার এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে আঙুলের টোকা দিয়ে

সিগারেটের ছাই ঝাড়ছিল। সুন্দর অভিজাত চেহারা। মেয়ে-পুরুষ অনেকে যেতে যেতে তার দিকে দু-একবার চোখ তুলে তাকাল।

সামনে ছোটখাটো একটা ভিড়ের মধ্যে মিলনকে দেখতে পেয়ে অপরেশ ব্যস্ত হল। হাত নেড়ে ইশারা করে তাকে কাছে ডেকে বলল,—'কিরে, দেরি কেন? রেজিগনেশন লেটার তো শুধু টাইপ করতে বাকি। এখনও কাজে এত আঠা কিসের?

মিলন একটু লজ্জিতভাবে বলল,—'খুব দেরি হয়ে গেল, তাই না রে?'

—'ভীষণ।' ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে অপরেশ জবাব দিল, 'ঝাড়া আধ ঘণ্টা তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি। টেলিফোনে সাড়ে চারটে টাইম দিয়েছ অ্যাণ্ড ইউ আর সো লেট।' তারপর বিজ্ঞজনের মত মৃদু হেসে সে আবার বলল,—'বাট বি কেয়ারফুল। যে দেশে যাচ্ছিস সেখানকার লোকেরা সব ব্যাপারেই দারুণ পাংচুয়াল।'

—'ভেরি সরি', মিলন কৈফিয়ৎ দেবার ঢঙে কথা কইল, কি করব বল? ঠিক সাড়ে চারটের সময় আমাদের একজন অফিসার ডেকে পাঠালেন। মানে কোনো কাজের জন্য নয়। এমনি দুটো কথা বলবার ইচ্ছে। আমি আমেরিকায় যাচ্ছি খবরটা শুনেছেন। তাই নিয়ে আলোচনা। চাকরির সংবাদ আমি কোথায় পেলাম? কার চেষ্টায় এমন লোভনীয় অফার আমার ভাগ্যে জুটল। তারপর কবে ফ্লাই করছি। সেখানে মানে আমেরিকার লাইফ কেমন হবে? এরকম আরো অনেক প্রশ্ন'—

অপরেশ ভুরু কুঁচকে শুধোল,—'তোর বস'কে কি জবাব দিলি?'

—'কি জবাব দেব আবার? তোর নাম করলাম। বললাম আমার একজন স্কুলফ্রেণ্ড। হি ইজ নাউ এ বিগ বিজনেস একজিকিউটিভ। চেষ্টা-চরিত্র করে এই চাকরিটা সে আমাকে জোগাড় করে দিল।'

—'দুর।' অপরেশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করল। বলল,— 'আমি হলে তোর বস'কে অন্যরকম উত্তর দিতাম।'

—'তাই নাকি? কি উত্তর বল না—'

—'বলতাম আমার একজন ওল্ড স্কুলফ্রেণ্ডের সঙ্গে হঠাৎ একদিন পথে দেখা। অনেক দিন সে ফরেনে ছিল। এখন কলকাতার একটা ফার্মের

বিজনেস একজিকিউটিভ। ইনজিনিয়ারিং পাশ করে কেরাণীগিরি করছি শুনে হেসে খুন। জিভ কেটে বলল,—'মাই গড্। এদেশে ইনজিনিয়াররা পাশ করে কেরানী হয় নাকি? এরপর কোনদিন শুনব কলেজ থেকে বেরিয়ে ডাক্তাররা সব স্কুলের মাস্টার। আর ছাত্ররা এম-এ ডিগ্রী নিয়ে পিওনের চাকরির জন্য লাইন দিয়েছে। আমার দুরবস্থা দেখে সে এই অফারটা জোগাড় করে দিল স্যর।' কথা শেষ করেই অপরেশ হা-হা করে হাসল। ফের ঈষৎ চিন্তিত এবং গম্ভীর মুখে বলল,—'তবে একটা কথা বোধহয় ভুল বললাম। তোর এই চাকরিটা কিন্তু আমি জোগাড় করিনি। সত্যি কথা বলতে এর জন্য আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আসলে সমস্তটাই এলসীবৌদির চেষ্টা জানবি। সেজন্য বসের কাছে তোর এলসীবৌদির নাম করা উচিত ছিল।

—'দূর! আমি জানি চাকরিটা তোর চেষ্টাতেই হয়েছে।' মিলন পরিষ্কার জবাব দিল। ফের মুচকি হেসে বলল,—'তাছাড়া তোর সেই বিদেশিনী বৌদিকে তো আমি চিনি না বা তাকে চোখে দেখিনি।'

—'এবার দেখতে পাবি।' অপরেশ ভুরু নাচিয়ে রহস্য করল। বলল, 'আজকের ডাকে আর একখানা চিঠি এসেছে। তুই কবে যাচ্ছিস, অবিলম্বে জানাতে হবে। এয়ার পোর্টে তোকে রিসিভ করার জন্য এলসীবৌদি নিজেই আসবে লিখেছে।'

মেট্রোর সামনে ক্রমেই ভিড় বাড়ছে। ম্যাটিনি শো ভাঙতে দেরি নেই। আবার নতুন শো আরম্ভ হবার সময় এগিয়ে আসছে। বিকেল হতেই চৌরঙ্গীতে কি জনসমাগম। পথের উপর দোকানপাট,—যেন মেলা বসেছে। জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে-পুরুষ, বোঝাই ট্রাম-বাস। খালি ট্যাকসি কদাচিৎ চোখে পড়ে। অফিস ফেরত চার-পাঁচজন লোক বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের দিকে হেঁটে গেল।

মিলন বলল,—'আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? সেই দরজীর দোকান তো কাছেই। চল যাই—।'

—'সার্টেনলি।' অপরেশ তাড়াতাড়ি জবাব দিল। 'আরো আগে

গেলেই ভালো হত। সন্ধ্যের মুখে ওসমানের দোকানে আবার বেশ ভিড় জমে যায়।'

চৌরঙ্গী ছেড়ে ওরা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডে ঢুকল। পাশেই ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস। সাজানো-গোছানো লাইব্রেরী। প্রায় নিঃশব্দ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে নানা বয়সী মেয়ে-পুরুষ, বই-টই কিম্বা পত্রিকার পাতায় চোখ বুলোচ্ছে। পথের দু-পাশে ফুটপাতের উপর স্বল্প দূরত্বে ব্যাঙের ছাতার মত বিপণি। দম দেওয়া গাড়ি, দামী খেলনা, সুগন্ধী সেণ্ট-সাবান, জাপানী ছাতা, ছুরি-কাঁচি, ক্যামেরা-ট্রানজিস্টর আরো কত কি। কয়েক জন ফড়ে দালাল গোছের লোক খানিকটা ছিটকাপড় কিম্বা ফাউণ্টেন পেন হাতে নিয়ে খরিদ্দারের কাছে ফরেন গুডস্ বলে চালাবার ফন্দী-ফিকির খুঁজছে।

অপরেশ বলল,—'তোর প্লেনের টিকিট বুক করে ফেললাম। শনিবার-সন্ধ্যে সাতটায় ফ্লাইট।'

—'শনিবার?'

—'ইয়েস। নেকসট্ সাটারডে।' একটু হিসেব করে অপরেশ আবার বলল,—'এখনও প্রায় বারো দিন আছে। এর মধ্যে ঝুটঝামেলাগুলো মিটে যাবে মনে হয়। অবশ্য তোর কিছু চিন্তা করবার নেই। হাতের মুঠোয় রঙের গোলাম। আই মিন জব ভাউচার রয়েছে। সুতরাং স্টেটসে যাওয়া কে আটকাবে?'

মিলন ধীরে ধীরে বলল,—'জানিস, চাকরি পাওয়ার আগে বেশ একটা উত্তেজনা ছিল। রোজ ভাবতাম কবে তোর বৌদির চিঠি আসবে। এক একদিন চোখে ঘুম নামত না। আর এখন সব কিছু সেট্‌লড্ হবার পর কেমন ঝিমিয়ে পড়ছি। উৎসব দূরে থাক, যাওয়ার কথা ভাবলেই মনটা ভার-ভার, অবসন্ন লাগছে।'

অপরেশ হাসল। বলল,—'ও রকম হয়। চাকরি পাওয়ার পর কি উত্তেজনা থাকে? আর তুই নিশ্চয় জানিস,

'The real joy lies in chase and not in possession.

আসলে অনুসরণেই আনন্দ। পেয়ে গেলতো আর কিছু করার রইল না।'

—'কি জানি!' মিলন স্বগতোক্তির মত কথা কইল। পরে বলল,—'অবশ্য সবটা বোধহয় তাই নয়। মন ঝিমিয়ে পড়ার পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে।'

—'কারণ?'

—'হ্যাঁ। কিছুদিন ধরেই ব্যাপারটা চলছিল। মানে বাড়িতে একটা অস্বস্তিকর ভাব। আমরা সকলেই বেশ উদ্বিগ্ন ছিলাম। তারপর কাল রাত্তিরে হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটল, যার জন্য কেউ তৈরি ছিলাম না।

—'তার মানে?' অপরেশকে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল।

মিলন ধীরে ধীরে বলল,—'কাল অনেক রাত্তিরে আমাদের ফ্ল্যাটে পুলিশ এসেছিল।'

—'পুলিশ?'

—'হ্যাঁ। আমার ছোটভাই হিরু মানে হিরণের খোঁজে। পুলিশের দারোগা বলছিল, তার বিরুদ্ধে নাকি অভিযোগ রয়েছে।'

'কিসের অভিযোগ?' অপরেশ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। 'তোর ভাই রাজনীতি করে নাকি?'

'ঠিক বলতে পারি না। তবে রাজনীতির ব্যাপারে তার বোধহয় একটা নিজস্ব ধারণা আছে। আমি আমেরিকায় যাচ্ছি শুনে সে একটুও খুশি নয়। ঠাট্টা করে বলল, ধনতন্ত্রের দেশের একটা নাট-বল্টু হতে চলেছি।'

—'আই সী।' অপরেশ রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট কেসটা পকেট থেকে বের করল। মিলনের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে প্রথমে নিজেরটা ধারাল। তারপর বন্ধুর সিগারেটের মুখে লাইটারের আগুন ঠেকিয়ে প্রায় নিশ্চিতভাবে মন্তব্য করল,—'তোর ভাই কম্যুনিস্ট, তাই না?' একটু থেমে সে স্পষ্ট শুধোল,—'পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে?'

—'অ্যারেস্ট করতেই এসেছিল মনে হয়।' মিলন ম্লান হাসল। তবে পায়নি। হিরু তার আগেই পালিয়েছে।'

অপরেশ কিছু বলার আগেই মিলন ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করল। দুঃখ এবং ঈষৎ রাগের সঙ্গে সে বলল,—'হতভাগা ছেলে। যাবার আগে শুধু একটা চিঠি লিখে গেছে। আমার মত ডলারের দেশে পা বাড়ায়নি।

যেখানে যাচ্ছে সেখানে অট্টালিকা দূরে থাক একটা ইট-কাঠের বাড়িও নেই। শুধু অন্নহীন, বস্ত্রহীন মানুষ। একদিন সেই গ্রাম থেকেই তারা দলে দলে আবার শহরে এসে ঢুকবে।'

অপরেশ সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করল। নাক-মুখ দিয়ে প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করে সে বলল,—'তোর ভাই তাহলে শুধু কম্যুনিষ্ট নয়। হি ইজ এ রেভলিউশনারি।'

মিলন মৃদু হেসে জবাব দিল,—'আমার মেজভাই এসব নিয়ে মাথা ঘামায়। তোর মত কথা-টথা বলে। কিন্তু হিরুর সম্বন্ধে আমি এসব চিন্তা করিনি। এই তো দু-তিন বছর আগেও তাকে কত ছোট দেখেছি। এই বইটা কিনে দাও। ওই জিনিসটা এনে দাও। এমনি সব নানা আবদার করত। সেই হিরু কম্যুনিষ্ট কিংবা রেভলিউশনারি এই ধরণের কোনো চিন্তা আমার মাথায় আসেনি।'

সিগারেটে একটা ছোট টান দিয়ে সে আবার বলল,—'আমি শুধু ভাবছি মায়ের কথা, আমার বাবার কথা। হিরু চলে যাবার পর বাড়িতে যেন মেঘলা দিনের অন্ধকার নেমেছে। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভাব। সকলেই বিষণ্ণ। মা তো অনবরত কাঁদছে। বাবা শুকনো, গম্ভীর। আর সেজন্যই বোধহয় আমার মনটা অবসন্ন। এদের এই অবস্থায় ফেলে আমেরিকায় যেতে পা উঠছে না।'

## ॥ উনিশ ॥

গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে দরজীর দোকানে বেশী দেরি হল না।

অবশ্য শুধু টেলারিং শপ বললে ভুল বলা হবে। কারণ দোকানে জামাকাপড়ের স্টক কিছু কম নয়। গরম কাপড় তো প্রচুর। এবং ক্রেতার ভিড়ও আশানুরূপ।

অপরেশ আগেই ফোনে কথা বলে রেখেছিল। তারা দোকানে ঢুকতে

ওসমান সাহেব নিজেই এগিয়ে এল। নানা ধরনের গরম কাপড় বের করে দেখাতে শুরু করল।

এক ফাঁকে অপরেশ বলল,—'বড় দোকানে গেলে তোর খরচ অনেক বেশী পড়ত। কিন্তু এখানে কাপড়ের ভ্যারাইটি কিছু কম নয়। মেকিং চার্জও মডারেট। অথচ বেশ ভালো কাটার আছে। মাপে-জোখে এতটুকু গরমিল পাবিনে। তাছাড়া ওসমান সাহেব আমাদের অফিসের কাজকর্ম করে। আমি বললে আর একটু কমেসমে রাজি হবে।'

ছুটো স্যুটের কাপড় অপরেশ পছন্দ করল। এসব ব্যাপারে মিলন নেহাৎ আনাড়ি। আসলে তার গরম স্যুট নেই। একটা টুইডের কোটই সম্বল। ডিসেম্বরের শেষে কিম্বা জানুয়ারীর প্রথমে সেটা বাক্স থেকে বের করে। তাছাড়া কলকাতায় শীতের স্বভাব ঠিক চড়ুই পাখির মত। উড়ু-উড়ু ভঙ্গি। নরম পা ফেলে ঘাসের উপর বসছে, আবার ফুড়ুৎ করে পালাচ্ছে। হাড়-কাঁপানো শীত দূরে থাকুক, কনকনে ঠাণ্ডা আর কটা দিন পড়ে? একটা পুল ওভারে শীত কাটে। গরম স্যুট বাহুল্য, লোক-দেখানো চটক বলা চলে।

দোকান থেকে বেরিয়ে অপরেশ প্রস্তাব করল,—তোর মন-মর্জি ভালো নেই, মরচে পড়েছে বলছিলি। চল একটু চাঙ্গা করে আসবি।'

ইঙ্গিত স্পষ্ট। মিলন বুঝতে পারল। অপরেশের যা স্বভাব তাই। এই সন্ধ্যেবেলায় সে শুঁড়িখানায় যেতে চায়। আধুনিক বার অ্যাণ্ড রেস্তোঁরায়। সেখানে পান এবং আহার ছুই প্রস্তুত। উর্দি-পরা বেয়ারার দল শুধু অর্ডার পাবার অপেক্ষায় আছে।

মিলন এক মুহূর্ত চিন্তা করল। অপরেশের বারে যাওয়া মানেই আরো ছুটি ঘণ্টা কাবার। কিন্তু তার হাতে কি কাজ? বাড়ি ফিরেই বা কি করবে? গতকাল রাত্তিরে পুলিশ হানা দেবার পর থেকে তাদের বাড়িতে একটা বিষণ্ণ স্তব্ধভাব। মা আর বাবা কারো মুখে কথা নেই। ছুজনেই চুপ....ছিন্নমূল বৃক্ষের মত মা নিস্তেজ। অথচ তার আমেরিকায় চাকরি হয়েছে শুনে মা কেমন চঞ্চল বোধ করল। তারপর তাড়াতাড়ি কত কি যে ঘটে গেল। হঠাৎ একখণ্ড কালো মেঘ এসে তাদের বাড়ির সুখের

সূর্যটাকে আড়াল করে দাঁড়াল। এখন বাড়ি ফিরে মিলন সেই একই অবস্থা দেখবে। তার মত কিরণও নিশ্চয় এখন পথে পথে ঘুরছে। বাড়িতে শুধু মা, বাবা আর বিন্তি। কে জানে বিন্তি এতক্ষণ তার থিয়েটারের রিহার্সাল শেষ করে বাড়ি ফিরেছে কিনা! আর একটু মদ খেলেই বা দোষ কি? অপরেশ বলে সে যে-দেশে যাচ্ছে, সেখানে মদ্যপান অপরিহার্য। ড্রিঙ্ক করা প্রায় স্বাস্থ্যবিধির আওতায় পড়ে। তাছাড়া সুরা উত্তেজনা জোগায়,....এতে তার মনের অবসন্নতা কাটে।

অন্তরের ইচ্ছা গোপন রেখে সে বলল,—'চল, তোকে একটু কম্‌প্যানী দিতে আর আপত্তি নেই।'

—'এই তো গুড বয়ের মত কথা।' অপরেশ দাঁত বের করে হাসল। ফের গলা খাটো করে বলল,—'আজ কিন্তু জিন নয়। তোকে এক পেগ হুইস্কী খেতে হবে।'

পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত গেল না অপরেশ। গ্র্যাণ্ট্ স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে ছোটখাটো একটা বারে তাকে এনে তুললে। খুব জমকালো বার নয়। ঠাঁটবাটে চোখ ধাঁধায় না। বাজনাবাদ্যি নেই। বেয়ারাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ। আগন্তুকদের চেহারায় চটক কম। বেসবাসে স্বাচ্ছল্যের ইঙ্গিত নেই। বরং দু'একজনকে দেখে মিলনের সাধারণ নেশাখোর মাতাল বলে মনে হল। এখানে অপরেশ বেমানান। তার সুন্দর পোশাক, উজ্জ্বল চেহারা এই বার অ্যাণ্ড রেঁস্তোয়ার সঙ্গে আদৌ মিশ খায় না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে মিলন বলল,—'এই বাজে জায়গায় মরতে এলি কেন? এর চেয়ে পার্ক স্ট্রীট রেস্তোঁরা অনেক ভাল ছিল।'

—'এখানে তোর ভাল লাগছে না বুঝি?' অপরেশ মুখ না তুলে জবাব দিল। বলল,—'এই ছোটখাটো, বারগুলোতে কিন্তু ভিড় কম হয় না। বিশেষ করে সেলার্স মানে নাবিকেরা যখন বন্দরে নামে। তখন একটি আসনও খালি পাবি না। সব ভর্তি। হৈ-হৈ,...হুল্লোড়।' মুচকি হেসে সে যোগ করল,—'তাছাড়া কল-গার্লরা আসবে। সেলার্সরা এলেই [illegible] ভিড় ভীষণ বেড়ে যায়। অবশ্য একটু ভয়ের কারণও আছে।

মাঝে মাঝে পুলিশ হানা দেয়। কিন্তু নেহাৎ এ্যাকসিডেণ্ট। বছরে কটা দিন আর পুলিশের এসব দিকে নজর পড়ে।'

সুরার পাত্রে ঠোঁট ডুবিয়ে অপরেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করল। ছোট্ট এক চুমুক দিয়ে সে আবার বলল,—'অবশ্য আমি আর কলকাতায় বেশীদিন থাকছিনে। সামনের মাসে হয়তো এখান থেকে চলে যেতে পারি।'

—'তাই নাকি?' মিলন খুব অবাক হয়ে শুধোল। কোনোদিন তো আমাকে বলিস নি? ভীষণ চাপা স্বভাব তোর।'

অপরেশ হেসে বলল,—'দূর! চাপা স্বভাব হবে কেন? এখনও ফাইন্যাল কিছু হয়নি। তবে মনে হয় ওরা আমাকে সিলেক্ট করবে। আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে। তারপর বিজনেশ অ্যাডমিন্সট্রেশনের বিলিতী ডিপ্লোমা পেয়েছি। তাছাড়া বাবা একটা ভালো রেফারেন্স জোগাড় করেছেন। প্রাইভেট ফার্মে কানেকশন আর রেফারেন্সের খুব দাম। উঁচু পোস্টে যেতে হলে এগুলো ভীষণ প্রয়োজন।

মিলন খুশি হল। 'তাই বল। তুই বেটার চান্স পেয়ে যাবি। কিন্তু চাকরিটা কোথায়? কি পোস্টের জন্য লোক চেয়েছে?'

ঢক করে খানিকটা হুইস্কী গিলে অপরেশ সোজা হয়ে বসল। পীরিতীর কথা শুনলে মেয়েরা যেমন চঞ্চল হয়, মিলনের তেমনি কৌতূহলী ছটফটে ভাব। অপরেশ তাই খুলে বলল,—'চাকরিটা ফরিদাবাদে। ওয়ার্কস ম্যানেজারের পোস্ট। দিল্লী থেকে বাবা লিখলেন একটা দরখাস্ত পাঠাতে। আমি টাইপ করে ছেড়ে দিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে ওরা আমাকেই সিলেক্ট করবে। তারপর আর দেরি করবার কোনো মানে হয় না। আই শ্যাল হ্যাভ টু প্যাক আপ।'

মদের পাত্রে ঠোঁট ডুবিয়ে মিলন চাঙ্গা হতে চাইল। আজ জিন নয়, অপরেশ তার জন্য হুইস্কীর অর্ডার দিয়েছে। কিন্তু মিলন এখনও আনাড়ি। সুরা তাকে উদ্দীপ্ত করে না। বরং মুখে দিলে কটু ঝাঁঝালো মনে হয়।

বন্ধুকে সে প্রশ্ন করল,—'তোর নতুন পোস্টে কেমন মাইনে টাইনে হবে?

'প্রায় আড়াই হাজার টাকা। তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টার্স অ্যাণ্ড এ কার।'

মিলন হেসে বলল,—'সত্যি তোকে দেখলে জীবনটাকে ঠিক লুডো খেলার

ঘুঁটি বলে মনে হয়। কেমন এক লাফে দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকায় পৌঁছে গেলি। এর উপর আবার ফ্রি-কোয়ার্টার্স অ্যাণ্ড এ কার। নিশ্চয় আরো কিছু সুবিধে আছে।'

মদের পাত্র নিঃশেষ করে অপরেশ আর এক পেগের অর্ডার দিল। ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে একটা নতুন ভঙ্গি করে বলল,—'কিন্তু জীবনকে হঠাৎ লুডো খেলার ঘুঁটি বলে মনে হল কেন তোর?'

—'তাছাড়া আর কি বলব?' মিলন ঈষৎ ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। বলল,—'দেখছি তো, এই পৃথিবীতে সবাই লুডোর ঘুঁটি। তবু জীবন দু-রকম। কেউ সাপ লুডোতে তরতর করে উপরে উঠছে। আবার কেউ সাদা লুডোর ঘুঁটি সেজে ঘর থেকে বেরোতেই পারছে না। কিংবা এক-ঘর, দু-ঘর করে ধীরে ধীরে শম্বুকের মত এগোচ্ছে।'

অপরেশ মুচকি হাসল। তারিফ করে বলল,—'গ্র্যাণ্ড উপমা তোর। আমি তাহলে স্নেক লুডোর ঘুঁটি?'

—'নিশ্চয়।' মিলন জোর গলায় বলল, 'জীবন তোর কাছে একটা সাপ-লুডোর বোর্ড। একটা করে দান ফেলে হাতের কাছে সিঁড়ি পেয়ে যাচ্ছিস। অবশ্য তুই একা ন'স। এমন আরো অনেকে আছে। ব্যবসায়ী সাপ্লায়ার, বড় ডাক্তার, জাঁদরেল অফিসার, কিংবা তোর মত বিলিতী ডিগ্রী যাদের পুঁজি, এদেশে এখন তারাই ভাগ্যবান। অথচ আর দশজনের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, সাধারণ কেরানী, শিক্ষিত বেকার, কিংবা অল্প মাইনের কর্মচারী। বেচারীরা পড়ে পড়ে মার খায়। জীবনের লুডোর বোর্ডে তারা ক্রমাগত দান ফেলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ভালো দানের দেখা কি মেলে? কপাল জোরে হয়তো একটা ছক্কা পড়ে। তবু তার ক্ষমতায় আর কতদুর নড়বে। কতটুকু এগোতে পারে।

মদের গ্লাস থেকে মুখ তুলে অপরেশ হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল। সুরার নেশায় তার চোখ দুটি ক্রমেই ভারী এবং স্থির মনে হচ্ছিল। মিলনের পিঠের উপর একটা আলতো চাপড় মেরে সে বলল,—খুব তো বুলি কপচাচ্ছ বাবা। কিন্তু তুমি নিজেও একটি সাপ লুডোর ঘুঁটি হয়ে বসেছ। এক দান ফেলেই যা ভেল্কি দেখালে। একেবারে [illegible]। ইণ্ডিয়া থেকে

গিয়ে আমেরিকায় জুড়ে বসবে। তোমার কপালকে এখন আমার মত ভাগ্যবানরাই হিংসে করছে।'

মিলন লজ্জা পেয়ে বলল, 'দূর ভাগ্য না ছাই। এতদিন তাহলে ঘাস কাটছিলাম কেন? ও সব তোর চেষ্টা। নইলে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে?'

এক পেগ, দু পেগ শেষ পর্যন্ত তিন পেগ হুইস্কী টেনে অপরেশ উঠবার জন্য প্রস্তুত হল। ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে। দরজার দিকে আর একবার নিরাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল,—'চল, চপলা নন্দী বোধহয় আজ এখানে আসবে না।'

—'চপলা নন্দী?' মিলন ভুরু কুঁচকে তাকাল।

—'বারে, এরই মধ্যে নামটা ভুলে গেলি? না, তুই একেবারে হোপলেস। মেয়েদের নাম এত তাড়াতাড়ি কেউ ভোলে?'

মিলন মনে করবার চেষ্টা করল। কিন্তু স্মৃতির অরণ্য হাতড়ে নামটা খুঁজে না পেয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল।

অপরেশ হেসে বলল—তুই নির্ঘাত বুড়ো হয়ে গেছিস। নইলে একটা মেয়ের নাম এখন মনে পড়ল না?'

—'কোন মেয়েটা বল তো?'

—অপরেশ চোখ নাচিয়ে বেশ রহস্য করে বলল—'সেই যে পার্ক স্ট্রীটে যাকে দেখে তুই ভয় পেয়ে পালালি। তোর কানে কানে আমি বললাম, ওর নাম অলকা নয়। নামটা চপলা,—চপলা নন্দী। সার্কাস রেঞ্জে ওরা থাকে।'

—'ও, হ্যাঁ। মিলন ডান গালে তর্জনীর অগ্রভাগ চেপে কথা কইল। 'এখন মনে পড়েছে। সেই ট্যাকসি-গার্ল মেয়েটা? তার কি আজ এখানে আসবার কথা ছিল?'

—'ইয়েস। আমি তাই জানতাম। চপলা ইদানীং এখানে আসে। এবং আজ তার আসবার কথা ছিল।' ডান চোখটা ঈষৎ ছোট করে এক মুহূর্ত চিন্তা করল অপরেশ। তারপর টেবিলের উপর দু-তিন বার টোকা মেরে বলল,—'ঠিক আছে। এখন ওর বাড়ি যাব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই অপরেশের মাথাটা হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে গেল। তার পা টলছিল। কোনো মতে টেবিলটা ধরে সে নিজেকে সামলে নিল। মুচকি হেসে বলল,—'দেখছিস তো? অজন্তা বার ছোট হলে কি হবে? কিন্তু জলমেশানো চীজ নয়। এরা খাঁটি মাল সার্ভ করে। নইলে তিন পেগে আমি আউট হই?'

রাস্তায় নেমে অপরেশ একটা ট্যাকসি নিল। পাঞ্জাবী ড্রাইভার। গাড়িতে উঠে সে ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে নির্দেশ দিল,—'থোড়া ময়দানমে ঘুমকে সার্কাস রেঞ্জ চলিয়ে।'

—'এত রাত্তিরে আবার ময়দানে?'

—'হ্যাঁ। মাথাটা কেমন ঘুরছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভালো লাগবে। এক চক্কর মেরে তোকে আবার মেট্রোর সামনে নামিয়ে দেব।'

মিলন অনুরোধ করল। এত রাত্তিরে নাই বা সার্কাস রেঞ্জে গেলি? বাজে জায়গা। ওখানে কি যেতে আছে?'

—'তুই চল না।' সে মৃদু হাসল। দেখবি, সময়টা ভালো কাটবে। তাছাড়া চপলার একটা খুবসুরৎ বোন আছে।' অপরেশ নীচের ঠোঁটটা কামড়ে একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল। মুচকি হেসে বলল,—'তোর তো কোন এক্সপেরিয়েন্স নেই। দেখবি চল।' বেরিয়ে আসবার সময় ওরা কেমন মিষ্টি হেসে বলে,—আবার এসো, বুঝলে?'

মিলন সজোরে মাথা নাড়ল। অসম্ভব। ওসব কল-গার্লদের সঙ্গ আমার আদৌ ভাল লাগে না। একটু থেমে সে বন্ধুকে সকাতর অনুনয় করল,—'এই বাজে মেয়েগুলোর পিছনে কেন ছুটোছুটি করিস? ভগবান তোকে সব দিয়েছেন অপরেশ। কন্দর্পের মত চেহারা, মোটা মাইনের চাকরি, ভালো কনেকশনস্....তোর উন্নতির সিঁড়ি ক্রমেই আকাশে ঠেকবে। জীবনে একটা লোক আর কি চায়? তুই এবার বিয়েটা সেরে ফেল অপরেশ। কিম্বা একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম শুরু কর। অফিসের পর তাকে নিয়ে বেড়াবি। তোর পয়সা আছে, সামর্থ্য আছে। ছুটির দিনে কবুতর-কবুতরীর মত গঙ্গার ধারে বসে দু'জনে গল্পের জাল বুনবি।'

তার কথা শুনে অপরেশ মাতালের মত হা-হা করে হেসে উঠল।

মিলন আহত গলায় বলল,—'অমন হেসে উঠলি কেন? একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোকে প্রেম করতে বলেছি। এতে হাসবার কি হল?'

সুরার নেশায় অপরেশের চোখ দুটি ঈষৎ লাল দেখাচ্ছিল। সে অসংলগ্ন জড়িত কণ্ঠে জবাব দিল,—'তুই শেষ পর্যন্ত পীরিত করতে বলছিস্ শুনে আমার ভীষণ হাসি পেল।'

মিলন চুপ করে রইল।

অপরেশ ফের বলল,—'জানিস মিলন লণ্ডনে থাকতে একটা গান শুনতাম। তখন মোটামুটি সেটা হিটসঙ হয়েছিল। শুনবি গানটা?'

বন্ধুর সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে অপরেশ গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করল—

When I was just a lad of ten,
My father said to me
Come here and take a lesson
From the lovely lemon tree.
Don't put your faith in love my boy,
My father said to me
I fear you will find that
Love is like the lovely lemon tree.
Lemon tree is very pretty,
And the lemon flowers are white
But the fruit of the poor lemon,
Is impossible to eat.

মদের নেশা একটু বেশী হয়েছিল। গান শেষ করে অপরেশ তাই অর্থহীন আনন্দে হা-হা করে হেসে উঠল। মিলনের গলা জড়িয়ে ধরে বলল,—'কিরে, গান শুনে কেমন লাগল তোর?' ফের চোখ ঘুরিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে মন্তব্য করল,—'প্রেম বৃক্ষের ফল মধুর নয় বন্ধু। টক, টক....দারুণ টক।'

—'তুই আজ বাড়ি যা অপরেশ। এত রাত্তিরে সার্কাস রেঞ্জে নাই বা গেলি?' মিলন প্রায় মিনতি করল।

অপরেশ জড়িত কণ্ঠে বলল,—'যাব না কেন? দেখিস, আজ চপলা নন্দীর সঙ্গে নিশ্চয় প্রেম করব। ওকে কি বলব জানিস?' অপরেশ নেশার ঝোঁকে ফের গান গাইতে শুরু করল—

A long long time ago
On a graduation day
You handed me a book
I signed this way
Roses are red my love
Violets are blue
Sugar is sweet my love
But not as sweet as you.

মেট্রোর সামনে তাকে নামিয়ে দিয়ে ট্যাকসিটা আবার চলতে শুরু করল। মিলনের ইচ্ছে করছিল অপরেশকে জোর করে ট্যাকসি থেকে নামিয়ে আনে। এত রাত্তিরে সার্কাস রেঞ্জের সেই নিষিদ্ধ বাড়িতে যাওয়া ওর কখনও উচিত হবে না। কিন্তু অপরেশ কি তার কথা শুনবে? মিলন কিছু বলতে গেলে সে ফের একটা গানের কলি ভাঁজবে। নেশার ঝোঁকে তার সব অনুরোধ হাসির ঝোড়ো বাতাসে কোথায় উড়িয়ে দেবে।

রাস্তার উপর সে চুপচাপ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। রাত প্রায় সাড়ে আটটার মত হবে। ইদানীং চারপাশে গণ্ডগোল বলে চৌরঙ্গীতেও ভিড় অনেক কম। এরই মধ্যে রাস্তাঘাট ফাঁকা। সিনেমা হলের সামনে অপেক্ষমান জনতার সংখ্যা হাতের আঙুলে গোনা চলে। ট্রামে-বাসে দিব্যি স্বচ্ছন্দে ওঠা যায়।

মিলন হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল। আকাশে চাঁদ হাসছে। শীতের আকাশ নির্মেঘ, কি তিথি কে জানে? কিন্তু চৌরঙ্গীতে জ্যোৎস্না কি বোঝা যায়? শুক্লপক্ষে আর কৃষ্ণপক্ষে একই চেহারা। সন্ধ্যে হলেই চৌরঙ্গীর নটীর বেশ। দুধশাদা নিওন বাতির আলোয় দিন আর রাত সমান মনে হয়।

এই কলকাতায় সে আর কদিন আছে? বড় জোর দশ বারো দিন। তারপরই সে হাজার হাজার মাইল দূরের এক নতুন দেশে গিয়ে পৌঁছবে।

আমেরিকা⋯পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ। হিরু বলে সে ধনতন্ত্রের বড় মেশিনটার একটা নাটবল্টু হতে চলেছে। সেখানে কলকাতার এই দিনগুলি শেষরাতে দেখা স্বপ্নের মত প্রায়ই তার মনে ভেসে উঠবে।

কলকাতা ছেড়ে যাবার কথা ভাবলেই কেন তার মন ভারী হয়ে উঠছে? কিসের এই বেদনা? এখানে তার মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই আছে বলে? কিন্তু তারা কেউ কলকাতায় থাকছে না। ডিসেম্বরের শেষে চন্দনপুরে চলে যাবে। শুধু তার মেজভাই বাদে। তাই বা কদিন? চাকরি-বাকরি নিয়ে কিরণ যে দূরে পাড়ি দেবে না, এমন কি কোনো গ্যারান্টি আছে?

আসলে এই মহানগরীর সঙ্গে তার নাড়ির বন্ধন। যাবার আগে শহরটা তাই পিছু ডাকছে। সুন্দরী যুবতীর মত রূপসী কলকাতার আকর্ষণ। অথচ এখানে কি আছে তার? আত্মীয়স্বজন নেই বললেই চলে। বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা নেহাৎ কম। তবু কলকাতা যেন এক মোহিনী মায়া। কিছুতেই তার মোহ কাটে না। এত গণ্ডগোল, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি, পথেঘাটে প্রাণ সংশয়, তবু কলকাতা ছেড়ে যাবার কথা ভাবলেই মন ভিজে ভিজে লাগে। কোথায় যেন কাঁটার মত কি খচখচ করে। যাবার দিনে নিশ্চয় অনেক বেশী খারাপ লাগবে।

হাঁটতে হাঁটতে মিলন নিজের মনে কথা বলছিল। নতুন বিয়ের পর একাকী প্রবাসে যাবার সময় তরুণ স্বামী যেমন সদ্য পরিণীতা যুবতী স্ত্রীর কানে ফিসফিস করে কথা বলে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে সে বলছিল,—'কলকাতা আমার কলকতা। রাগ করো না তুমি। দেখো বিদেশে আমি বেশিদিন থাকছিনে। তোমার কাছে আবার ফিরে আসব। দু-বছর, কিংবা পাঁচ বছর পরে। ততদিনে আমাকে ভুলে যাবে না তো?'

স্টপে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা আমহার্স্ট স্ট্রীটগামী বাস ঠিক তার পাশে এসে থামল। রাত অনেক হয়েছে। দিনকাল সুবিধের নয়। মা নিশ্চয় তার জন্য ভাবতে শুরু করেছে। মিলন আর দেরি করল না। সে হাতল ধরে বাসে উঠে পড়ল।

অফিস ছুটির পর ভিড় বাড়ছে। রাস্তায়, ফুটপাতে শুধু মানুষ। ওরই মধ্যে কমলালেবু, আঙুর আরো কত রকম ফল সাজিয়ে দোকান বসেছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা দায়। এত লোক। প্রতি মুহূর্তে ভয়, এই বুঝি কেউ ঘাড়ে এসে পড়ছে।

সেই বেলা দুটো থেকে ওয়াই-এম-সি-এর সামনে অপেক্ষা করছে রীতাবরী। তার বিমর্ষ মুখ, চিন্তিত চাহনি। মাঝে মাঝে চোখ তুলে সে ভিড়ের মধ্যে কাউকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে।'

কিরণ এল আড়াইটের কিছু পরে। ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলল,—'তুমি নিশ্চয় অনেকক্ষণ এসেছ?'

আশ্চর্য! রীতাবরী একটুও রাগল না। অভিমান করে দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তা করল না। বরং কোনোরকম কৈফিয়ৎ না চেয়ে জবাব দিল,—'চল, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

কিরণ এদিক ওদিক তাকিয়ে ট্যাকসির খোঁজ করছিল। রীতাবরী তার জামাতে মৃদু টান দিয়ে বলল,—'উঁহু আজ অত সময় হবে না। ধারে-কাছে কোথাও নিয়ে চল। আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে।'

—'কেন এত তাড়া কিসের?' কিরণ ভ্রূ কোঁচকাল। 'তোমাদের পাড়ায় আবার গণ্ডগোল নাকি?'

—'হ্যাঁ।' রীতাবরী ঘাড় হেলাল। 'তবে পাড়ায় নয়, গণ্ডগোল আমাদের বাড়িতেই। মলিন মুখে সে বলল,—'বেলা চারটের মধ্যে না ফিরলে অপমানের আর বাকি থাকবে না।'

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য না হওয়ায় কিরণ মাথা চুলকাল। রীতাবরী গুরুতর কিছু বলতে চায়। এবং খুব সত্বর। তার বাড়ি ফেরবার তাগিদও বেশী। নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

ট্রামলাইন পেরিয়ে একটু হাঁটলেই দিলখুস। রীতাবরীকে নিয়ে কিরণ সেখানে ঢুকল। কলেজস্ট্রীট পাড়ার রেস্তোঁরাগুলি দুপুরের দিকে প্রায় খালি। তবু শনিবার বলে কিছু লোকজন। নইলে ভিড় বাড়ে সন্ধ্যের মুখে। তখন চেয়ার খালি পাওয়ার জন্তে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

একটা প্রীলে ঢুকে কিরণ বসল। দু কাপ চা এবং আরো কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে বলল,—'নাও তোমার কথা এবার শুরু করতে পার।'

টেবিলের উপর মাথা গুঁজে রীতাবরী নির্জীব কণ্ঠে বলল,—'আমার স্বপ্নের বাড়ি এবার ভেঙে যাচ্ছে কিরণ।'

—'ভেঙে যাচ্ছে?' কথার গুরুত্ব বুঝে কিরণ সোজা হয়ে বসল। 'কি হয়েছে খুলে বলবে আমায়?'

রীতাবরী মাথা না তুলেই জবাব দিল,—'যা হবার তাই হয়েছে। বাবা অন্যত্র আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছেন।'

—'আহা! একথা তুমি আগেও বলেছ আমায়।' কিরণ হাসবার চেষ্টা করল। ফের গলা নামিয়ে শুধোল,—আমাদের কথা তুমি জানাওনি বাড়িতে?'

—'জানিয়েছি। রীতাবরী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তবে বাবাকে নয়। মাকে শুধু তোমার কথা বলেছি।'

—'তিনি কি বললেন?' কিরণ সাগ্রহে জানতে চাইল।

—'যা ভয় করছিলাম তাই।' রীতাবরী মুখ তুলে তাকাল। বড় বড় চোখ করে বলল,—'শুনে মা ভীষণ ভয় পেল। বলল, এ বিয়েতে তোর বাবা কখনও মত দেবে না। বরং শুনলে রাগারাগি করে একটা বিশ্রী কাণ্ড করবে।'

—'তারপর?'

—'মা আমাকে সাবধান করে দিল। বলল, তোমার সঙ্গে যেন আর মেলামেশা না করি। ওসব কাঁচা বয়সের রঙ, দু'দিন থাকে। বিয়ের জল পড়লেই সব ধুয়ে-মুছে উঠে যায়।

কিরণ চুপ করে শুনছিল।

ঢোক গিলে রীতাবরী বলল,—'আরো একটা মুস্কিল হয়েছে। বর্ধমান থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক পরশুদিন আমাকে দেখতে এসেছিল। বাবা কাল রাত্তিরে মাকে বলছিলেন যে, ছেলের নাকি আমাকে খুব পছন্দ হয়েছে।'

## ॥ কুড়ি ॥

তিন-চার মিনিট কিরণ চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বলল না। বেয়ারা এসে দু-কাপ চা, টোস্ট আর ওমলেট টেবিলের উপর রেখে গেল। কিরণকে নীরব এবং চিন্তিত দেখে রীতাবরী চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, —'নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।'

কিন্তু কিরণের মুখভাব বদলাল না। সে গম্ভীর এবং অন্যমনস্কের মত চা-পান শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল,—'আমি একবার তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব ভাবছি।'

কি হবে দেখা করে? রীতাবতী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'তোমাকে বলেছি না? বাবার টনটনে বংশ-গৌরব। আমরা নিমতার বিখ্যাত গোস্বামী বংশের সন্তান, একথা তাঁর মুখে দিনের মধ্যে সাতবার শুনি। তোমার কাছ থেকে মেয়ের অসবর্ণ বিয়ের প্রস্তাব শুনলে বাবা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। তারপর একটা বিশ্রী রাগারাগি হবে। হয়তো ভীষণ চটে গিয়ে তোমাকে অপমান করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলবেন। দাদা-বৌদি, ঝি-চাকর, বাইরের লোকেদের সামনে আমাকে নিয়ে এমন একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী কিছুতেই হতে দিতে পারব না।'

কিরণ বলল,—শুরুতে আপত্তি করলেও পরে হয়তো তোমার কথা ভেবে উনি রাজি হতে পারেন। আর এমনি তো ঘটে। প্রথম দিকে কারো মা-বাবাই এই ধরনের বিয়েতে রাজি হতে চান না। পরে ছেলে-মেয়েদের কথা চিন্তা করে মত দিতে হয়।'

রীতাবরী অবসন্ন রোদ্দুরের মত ম্লান হাসল।—'তুমি আমার বাবাকে চেন না। ভীষণ জেদী আর গম্ভীর। তাঁকে আমরা বরাবর দূরের মানুষ বলে জানি। বাবার স্বভাব ঠিক পাহাড়ের মত। অটল, অনড়। তাঁর কথার কিছুতেই নড়চড় হবে না। একবার কোনো বিষয়ে না বললে তাঁকে আমরা মত বদলাতে দেখিনি।'

কিরণ ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'তাহলে উপায় কি হবে? আমাকে বিয়ে করলে বাবা বোধহয় কোনোদিন তোমার মুখদর্শন করবেন না।'

—'তার জন্যে দুঃখ নেই।' রীতাবরী পরিষ্কার বলল। 'আমি পরে চিঠি লিখে তাঁকে সমস্ত কিছু জানিয়ে আশীর্বাদ চাইব। যদি ক্ষমা করে উত্তর দেন, তাহলে তোমার সঙ্গে ফের ও বাড়িতে ঢুকতে পারি, না হলে আর প্রয়োজন নেই। আমি জানব বাপের বাড়ির দরজা আমার জন্য চিরদিন বন্ধ হয়ে গেছে।'

কিরণ কোনো কথা বলল না। সে চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিল।

রীতাবরী জিজ্ঞাসা করল,—'আমাদের কথা বাড়িতে বলছে নাকি?'

কিরণ মাথা নাড়ল। 'আগে বলিনি রীতাবরী। কিন্তু জানিয়ে রাখলে বোধহয় ভালো হত। আসলে ঠিক এই মুহূর্তে মা আর বাবার কাছে তোমার কথা বলতে একটু অসুবিধে আছে আমার।'

—'অসুবিধে?' রীতাবরী সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। কিরণের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল,—'অসুবিধে কিসের? এ বিয়েতে কি তোমার মা বাবা আপত্তি করবেন?'

—'না, না। আপত্তি করবেন কেন? ওসব কিছু নয়।' কিরণ চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে তাকাল। 'মুস্কিল হয়েছে আমার সেই ভাইকে নিয়ে। যার কথা তোমাকে সেদিন বলেছিলাম।'

রীতাবরী ঈষৎ দুশ্চিন্তার ভাব করে বলল,—কেন, কি হয়েছে তার? তুমি তো বলছিলে হিরু মানে তোমার ছোট ভাই খুব ভালো ছেলে। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে তার নাম দেখলে তুমি আশ্চর্য হবে না।'

—'হ্যাঁ। পরীক্ষায় বসলে হয়তো সে রকম কিছু হতে পারত। কিন্তু এখন তার কোনো সম্ভাবনা নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিরণ বলল, 'হিরু বাড়ি থেকে চলে গেছে রীতাবরী।'

—'চলে গেছে? কোথায়?' বিস্ময়ে তার চোখ দুটি বেশ বড় দেখাল।

—'ঠিক জানি না। তবে বাড়ীতে একটা চিঠি লিখে গেছে। সে গ্রামে যাচ্ছে....কোথায় কোন গ্রামে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।'

রীতাবরী চুপ করে শুনছিল। টেবিলে আহার্য সব পড়ে। মামলেট কেউ মুখে দেয় নি। কিরণ শুধু একটা টোস্টে কামড় দিয়েছিল মাত্র। কেমন করে খাবে? আড়ালে বসে কে যেন একটা বিষণ্ণ সুরের রাগ বাজিয়ে চলেছে। সেই সুর সমস্ত ঘরময়, এই গ্রীলের ভিতর, বাতাসের মত বার বার তাদের দুজনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে।

কিরণ মুখ নীচু করে বলল—মুস্কিল হয়েছে ভাই। হিরু চলে যাবার পর মা একবারে ভেঙ্গে পড়েছে। সবই করে....নাওয়া, খাওয়া ঘুমোন কিছুই বাদ নেই। তবু মায়ের মুখের দিকে যেন তাকান যায় না। আমি বুঝতে পারি দেহের ভিতরে রোগ যখন ছড়িয়ে পড়ে, বাইরে থেকে তা ধরবার উপায় নেই। মায়ের অবস্থা ঠিক তাই। মনের ভিতরে ঘুণ ধরেছে। তিলে তিলে মা নিঃশেষ হচ্ছে, অথচ কাউকে একটি কথাও বলবে না। শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কখনও নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়।'

—'আর তোমার বাবা?' রীতাবরী সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

—'তাঁর অবস্থাও কিছু ভালো নয়। আগে বাবা বেশ শক্ত মানুষ ছিলেন। কথাবার্তা কম বলতেন। ছোটখাটো ব্যাপারে আদৌ মাথা গলাতেন না। কিন্তু ইদানীং তিনি বেশ দুর্বল। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে প্রায়ই একটা ব্যথা অনুভব করেন। আর মাঝে মাঝে পাগলের মত অর্থহীন ভঙ্গিতে বলে ওঠেন,—'ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টা বাজছে কিরণ। শুধু হিরু নয়, আমাদের সকলকেই এবার যেতে হবে।'

রীতাবরীকে রীতিমত হতাশ দেখাল। সে মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে রইল।

কিরণ তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি নিজের করতলে টেনে নিয়ে বলল—'তুমি বিশ্বাস কর রীতাবরী। এই মুহূর্তে আমার বড় অসহায় অবস্থা। বাড়ির কথা তো শুনলে? হিরু চলে গেছে। সামনের শনিবার সন্ধ্যের প্লেনে দাদা আমেরিকায় উড়বে। আর কিছু দিনের মধ্যে বাবা রিটায়ার করে দেশে যাবেন। আমাদের অমিয় বারিক লেনের বাড়িতে এখন

ভাঙনের সুর শুনতে পাই। মায়ের মলিন মুখ....শ্রীহীন রুক্ষ বেশ। বাবা ভীষণ নিস্তেজ আর মনমরা। ঠিক এই অবস্থায় মা-বাবার কাছে নিজের বিয়ের কথা বলতে আমার খুব লজ্জা আর দ্বিধা বোধ হচ্ছে।'

রীতাবরী খুব আস্তে আস্তে তার হাতের আঙুলগুলি কিরণের মুঠোর মধ্য থেকে বের করে নিল। মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করল,—'আমি তাহলে এখন কি করব বল?'

—'তুমি একটু অপেক্ষা কর রীতাবরী। আমাকে কিছু দিন সময় দাও।

—'সময়?'

—'হ্যাঁ। বেশী দিন নয়। মাত্র দু মাস। এই কটা দিন আমার বড় প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত জানি তার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে যা দেরি। তারপর মা-বাবা দুজনেই অনেকখানি স্বাভাবিক হবে। আর ইতিমধ্যে আমিও কিছুটা প্রস্তুত হতে পারি।'

—'তুমি বুঝি এখন প্রস্তুত নও কিরণ? রীতাবরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

—কিরণ ম্লান হেসে বলল,—'প্রস্তুত আছি এই মুহূর্তে সেকথা কেমন করে বলি? তুমি তো সবই জান রীতাবরী। এই বিয়েতে তোমার মা-বাবার সম্পূর্ণ অমত। আর আমাদের বাড়ির পরিস্থিতি তো শুনলে। বিয়ে করে তোমাকে কোথায় তুলব বলতে পার?' একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল,—আমার মনের ইচ্ছে তোমাকে কত দিন বলেছি। একটা দু-কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাট। সাউথ ক্যালকাটায় কিম্বা কাছাকাছি কোনো স্থানে। আমরা দুজনে মিলে সুন্দর করে বাড়িঘর সাজাব। কিন্তু তার জন্যেও কিছু দিন সময় দরকার। এখনও তো ফ্ল্যাট জোগাড় করা হয় নি।'

রীতাবতী হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখন যাই তাহলে।'

কিরণ একটু অবাক হল। সে ভুরু কুঁচকে বলল—'এখনই যাবে? তুমি তো—কিছুই খেলে না।'

—'ভালো লাগছে না খেতে। রীতাবরী আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে দিয়ে কিরণ ওর পিছু পিছু রাস্তায় এসে নামল। কিন্তু রীতাবরী যেন খুব ব্যস্ত। পথের ধারে একটা রিকস দাঁড়িয়েছিল। সে কিছু না বলে তাতে উঠে বসল। সব বুঝতে পেরেও কিরণ বোকার মত প্রশ্ন করল,—'তুমি বোধ হয় রাগ করলে রীতাবরী, তাই না?

—'হ্যাঁ। এই তো রাগ করবার সময়।' রীতাবরী ঠোঁট উল্টিয়ে বিচিত্র একটি ভঙ্গি করল। ফের বলল,—'আমি বুঝতে পারছি কিরণ। এখন তোমার অসুবিধে,—খুব অসুবিধে। বোকার মত আমি শুধু নিজের কথা ভেবেছি। তোমার দিকে তাকিয়ে দেখিনি।'

—'দু মাস খুব বেশী দিন নয়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে রীতাবরী।

—'হ্যাঁ। নিশ্চয় কেটে যাবে।' রীতাবরী প্রায় ফিস ফিস করে বলল। 'দিন কি কারো জন্যে অপেক্ষা করে কিরণ?'

—'আবার কবে দেখা হচ্ছে? তুমি কোথায় অপেক্ষা করবে কিছুই তো বলে গেলে না—'

—'দেখি। একটু ভেবে দেখি কিরণ। আমি কোথায় অপেক্ষা করব এখনই কিছু জানাতে পারছি না।' রীতাবরী ঠিক হেঁয়ালির মত কথা কইল। ফের কিরণের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল,—'তোমাকে চিঠি লিখব। তাতেই সব জানবে—।'

রিকশ চলতে শুরু করল। চারপাশে লোকজন। তবু রীতাবরী পিছন ফিরে একটু অস্পষ্টভাবে হাত নাড়ছিল। একটা রং-বেরংয়ের সুন্দর ছবির মত দেখাচ্ছিল তাকে। খানিকটা দূরে যেতেই সে আবার সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

ট্রাম লাইনের পাশে কিরণ বিমর্ষ মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনটা এখন সীসের মত ভারী। আজকের অভিজ্ঞতা তাকে বেশ পীড়া দিচ্ছিল। রীতাবরী তাকে স্টেশন পর্যন্ত যেতে বলে নি। অথচ তার হাতে কোনো কাজ নেই। ইচ্ছে করলে সে ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে পারত। কিরণ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা গভীরভাবে চিন্তা করছিল। শেষ পর্যন্ত রীতাবরী কি-তাকে ভুল বুঝল?

আজ বিস্তির থিয়েটার।' কাংশনে তাদের বাড়িশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ।

সেই ভদ্রলোকরা বিকেলে গাড়ি পাঠাবেন। কিন্তু কেউ যাবে না। পাশপোর্ট ভিসার ব্যাপার নিয়ে তার দাদা ভীষণ ব্যস্ত। সকাল বিকেল ছুটোছুটি করছে। আর মা-বাবা? হিরু চলে যাবার পর তাদের মুখে হাসি নেই। ফ্যাংশন শুনবার মত কারো মনের অবস্থা নয়।

বিস্তি তাকে আড়ালে বলেছিল—মেজদা তুমি যেও। সত্যি যাবে কিন্তু। নইলে ওরা কি ভাববে? আমাদের বাড়ি থেকে কেউ না গেলে—'

কিরণের তাই ইচ্ছে ছিল, রীতাবরীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সে নিশ্চয় বিস্তির থিয়েটার দেখতে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভীষণ অবসন্ন লাগছে তার, মন মর্জি জং-ধরা লোহার মত অকেজো, এখন ফাংশন কেন, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না, বরং একা একা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকলে তার ভালো লাগবে। একটা এসপ্ল্যানেডগামী ডবল-ডেকার বাস ক্রশিং এর মুখে দাঁড়িয়ে। মোটামুটি ফাঁকা। কিরণ লম্বা লম্বা পা ফেলে বাসটা ধরবার জন্য এগোল।

* * * *

রাত নটায় ফাংশন শেষ হল। বিস্তি যখন গাড়িতে উঠল, তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে। রতীশ বলল,—'তবু অনেক তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়েছে। আমি তো ভেবেছিলাম শুরু হতেই সাতটা বেজে যাবে।'

গাড়ির সীটে বসে বিস্তি উসখুস করছিল। তার গালে, মুখ, ঠোঁটের উপর রঙ। কপালে টিপ। ভালো করে মেক-আপ তুলতে গেলে অনেক দেরি। তাই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। মুখের উপর বার দুই তিন রুমাল ঘষে বিস্তি প্রশ্ন করল,—'থিয়েটার কেমন হল? সবাই কি বলছিল আমাকে বলবে না?'

—'আহা! নিজের প্রশংসা শুনতে বুঝি খুব ইচ্ছে করছে?' রতীশ বাঁকা চোখে তাকাল।

—'ধ্যেৎ। আমি কি তাই বলছি?' বিস্তি লজ্জা পেল।

রতীশ হেসে বলল,—'তোমার নাচের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। আগে শুধু আমি ভালো বলতাম। তুমি একদিন বড় শিল্পী হবে। অনেক নাম···যশ···খ্যাতি। এই কলকাতায় তোমার নাচ হবে শুনলে হলে আর লোক

ধরবার জায়গা থাকবে না। তখন আমার কথা গ্রাহ্য করতে না। এখন কত লোক তারিফ করছে। এবার নিশ্চয় তুমি বিশ্বাস করবে।'

—'তোমার কথা কি আগে অবিশ্বাস করেছি?' বিস্তি প্রায় হেলে পড়ে তার মাথাটা রতীশের কাঁধের উপর রাখল। কয়েক সেকেণ্ড পরে সে বলল,—'আচ্ছা, তুমি নাকি খুব শীগগির বিলেতে যাবে?'

—'কে বলল তোমাকে? মিলি নিশ্চয়?'

—'হ্যাঁ।' বিস্তি স্বীকার করল। 'কিন্তু কথাটা সত্যি কিনা বল?'

—'ঠিক সত্যি বলা চলে না।' রতীশ ঢোক গিলল। ঠোঁটের উপর জিভটা বুলিয়ে ফের সচল করে নিল। বলল,—'বাবার তাই ইচ্ছে। অনেকদিন থেকেই কথাটা হচ্ছে। আমি এবার লণ্ডনে গিয়ে একটা কোর্স কমপ্লিট করি। কিন্তু আমার ভালো লাগে না। কি হবে বিদেশে গিয়ে? ইণ্ডিয়াতে কি ডিগ্রি মেলে না?' কথা শেষ করে সে ধূর্ত শিয়ালের মত মুচকি হাসল।

বিস্তি আড়চোখে তাকিয়ে বলল,—'আমার কথা মনে রেখ রতীশ। তোমার সঙ্গে অনেক দূর এগিয়েছি। এখন ডুবজলে দাঁড়িয়ে রইলাম। তোমার হাত ধরে ভাসতে ভাসতে ওপারে যেতে পারি। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিলে আর পথ নেই। জলে ডুবে মরতে হবে।'

একটা জনহীন স্বল্পালোকিত জায়গায় রতীশ হঠাৎ গাড়ি থামল। বিস্তি কিছু বলবার আগেই সে বাঁ হাত বাড়িয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে প্রায় শাড়াশির মত ভঙ্গিতে তাকে আরো কাছে টেনে আনল।

বিস্তি অস্ফুট চিৎকার করে বলল,—'এই ছেড়ে দাও। লাগছে আমার—'

রতীশ কোনো কথা বলল না। সে একটু জোর করে এবং কিছুটা কৌশলে বিস্তিকে কোলের উপর আধশোয়া অবস্থায় ফেলে তার মুখে, গালে, ঠোঁটের উপর অনবরত চুমু খেতে শুরু করল।

খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বিস্তি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল,—'কি যে কর। এমন রাগ হয় আমার—'। তারপর রতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ফিক করে হেসে ফেলল। বলল,—'কেমন জব্দ! মুখে গালে রঙ লেগে এবার বেশ সঙের মত দেখাচ্ছে।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রতীশ বলল,—'তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমার সেই মাসী কলকাতায় আসছে।'

—'তাই নাকি? কোন মাসী বল তো? সেই যিনি খুব ফেমাস? এখান থেকে তেরশ মাইল দূরে থাকেন?'

—'হ্যাঁ। সামনের শনিবার মাসী আসছে। মোটে তিনদিন থাকবে। আমাকে রবিবার সকালে দেখা করতে বলেছে। তুমি যাবে নিশ্চয়?'

—'কোথায় যেতে হবে?'

—'কেন, গ্র্যাণ্ড হোটেলে। যেখানে মাসী এসে ওঠে।'

বিন্তি সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করল,—'তোমার মাসী হোটেলে ওঠেন কেন? নিজেদের বাড়ি নেই? তাহলে আত্মীয়স্বজন কিম্বা জানাশুনো কারো বাড়িতে উঠলেই পারেন।'

—'হুম্। তাহলেই হয়েছে।' রতীশ রহস্য করে বলল। মাসীকে বেরোবার রাস্তা করে দিতে শ'খানেক পুলিশ ডাকাতে হবে।'

—'পুলিশ?' বিন্তি একটু ভয় পেল। তোমার মাসীকে বেরোবার সময় পুলিশ ডাকতে হয় নাকি?'

—'না, না, ডাকতে হবে কেন? প্রয়োজন বুঝলে পুলিশ এমনিই থাকে।' রতীশ হেসে জবাব দিল। সে ফের বলল,—'বেশ তো। রবিবার সকালে মাসীর সঙ্গে আলাপ কর। তাহলেই সব বুঝতে পারবে।

অমিয় বারিক লেনের মুখে গাড়ি থেকে নেমে বিন্তি তাড়াতাড়ি গলিতে ঢুকল। এত রাত্তির। একা একা হাঁটতে বেশ ভয় ভয় লাগে। তাদের বাড়ি থেকে কেউ থিয়েটার দেখতে যায়নি। বিন্তি আশা করেছিল, তার মেজদা হয়তো যাবে। কেন গেল না কে জানে? গলিটা একেবারে ফাঁকা ....জনহীন। বিন্তি বড় বড় পা ফেলে বাড়ির দিকে হেঁটে চলল।

* * * *

সন্ধ্যে সাতটার অনেক আগেই ওরা এয়ারপোর্টে এসে পৌছল। আজ দুপুর থেকে মনোরমা আবার চোখের জল ফেলছে। হিরুর নাম করে সে নিঃশব্দে কাঁদছিল। পনের দিন হল ছেলে বাড়ি থেকে নিখোঁজ। এখনও তার কোনো হদিশপাওয়া যায় নি। অথচ তাই নিয়ে কি কারো দুর্ভাবনা আছে?

কিরণ একবার বলল,—'মিছিমিছি তুমি কেঁদে কি করবে? হিরু তো তোমাকে জানিয়ে গেছে মা। সে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে। গ্রামের কুঁড়েঘরে নিঃসম্বল মানুষগুলির মধ্যে। একদিন সেখান থেকেই দলে দলে আবার শহরে এসে ঢুকবে।'

সান্ত্বনার কথা শুনলে মনোরমার কান্না আরো বাড়ে। গলা বন্ধ হয়ে আসে। চোখ দুটি ছলছলে দেখায়। বড় বড় জলের ফোঁটা টলমল করে। আর কিরণের এসব কথার কোনো মানে আছে? ছেলেটা দু-ছত্র লিখে গেছে বলেই কি বাড়িশুদ্ধ লোক নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে? কোথায় কোন গ্রামে সে পড়ে রইল? সেখানে কি খায়? এই ঠাণ্ডায় লেপ-কম্বল দূরে থাকুক, একটি শীতবস্ত্রও হিরু সঙ্গে নেয়নি। এরপর মনোরমা কেমন করে নিশ্চিন্ত থাকে? শীতের রাত্তিরে লেপ মুড়ি দিয়ে আরামে চোখ বন্ধ করতে পারে?

হিরু চলে যাবার পর বাণীব্রত বড় বেশী অস্থির। চোখেমুখে ভরসা নেই।···মাঝে মাঝে সেই এক বুলি। ঘণ্টা বেজেছে। আর সময় নেই রে। হিরু চলে গেল। এবার আমাদেরও সব দিকে দিকে যেতে হবে। তৈরি হতে শুরু কর। ট্রেনের বাঁশী কখন বাজবে বুঝতেই পারবে না।

সকালবেলায় বাণীব্রত খুব সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়েছিলেন। মিলনকে কাছে ডেকে তার মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,—'তোর সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না রে খোকা। শরীরের অবস্থা তো বুঝতে পারছি। ভিতরে ঘুণপোকা কুরে কুরে খাচ্ছে। কবে আছি, কবে নেই। আমেরিকায় বসে হয়তো একদিন খবর পাবি বুড়ো বাপ নক্ষত্রের দেশে রওনা হয়েছে।'

মিলন জানে তার বাবার মন ভেঙে গেছে। আর জোড়া লাগবে না। এই ক'দিনে যেন বেশ রোগা হয়ে গেছেন বাণীব্রত। কণ্ঠার হাড় দুটো বিশ্রী প্রকট। দৃষ্টি বিষণ্ণ। বাবার হাত ধরে সে বলল,—'তোমার যত অলুক্ষণে চিন্তা, আমি কি চিরকাল বিদেশে থাকতে যাচ্ছি? দু-বছর কিম্বা তিন বছর পরে আবার ফিরে আসব। আর এই কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

অপরেশ প্রায় শেষ সময়ে এসে পৌঁছল। মিলনকে দেখে সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল,—'বাঃ! নতুন স্যুটটায় গ্র্যাণ্ড দেখাচ্ছে তোকে।' তারপর

কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল,—দেখিস, এলসী বৌদি আবার না তোর প্রেমে পড়ে যায়।'

—'যাঃ। কি যে বলিস, তোর নিজের বৌদি। মুখের যদি এতটুকু আগল থাকে।'

পরিচয় পেয়ে মনোরমা একগাল হাসল। —'ওমা। তোর সেই বন্ধু? কি সুন্দর চেহারা। ঠিক রূপকথার রাজপুত্তুরের মত।'

মিলন আশা করে নি। কিন্তু অপরেশ তার মা-বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। মনোরমা ওর চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ জানাল। মুখে বলল,—'বেঁচে থাক বাবা। তোমার কাছে আমরা বড় ঋণী। মিলুর জন্য তুমি অনেক করেছ। চিরদিন তা মনে রাখব।'

যাবার বেলায় বিস্তি কাঁদতে লাগল। মিলন তাকে আদর করে বলল,—'এই মুখপুড়ী, কাঁদছিস কেন? তোর জন্যে কি আনব বল? টেপ-রেকর্ডার, ক্যামেরা না টেরিকটনের শাড়ি।

তবু বিস্তির চোখের জল থামল না।

মিলন আবার বলল,—বোকা মেয়ে কাঁদিস নে। মা-বাবাকে দেখবি। তারপর ভালো করে নাচ শিখে তুইও একদিন আমেরিকা যাবি।'

বিদায় নেবার মুহূর্তগুলি বড় মন্থর আর বিষণ্ণ হয়। দুঃখ-কষ্টের যে সমস্ত অনুভূতি এতকাল ভোঁতা ছিল, সেগুলি হঠাৎ স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। গলা বুজে আসতে চায়। নয়ন ছলছল করে।

মনোরমা তাই আঁচলের খুঁটে চোখ মুছল। এতকাল ধাড়ি মুরগীর মত সে ছেলেমেয়েদের আগলে রেখেছিল। এখন তারা বড় হয়েছে। এবার উড়ে যাবে। হিরু পালিয়েছে। মিলন আজ চলল। বাকি শুধু কিরণ আর বিস্তি।

নিয়মমাফিক কাস্টমসের চেকিং ইত্যাদির পর মিলন প্লেনে উঠল। তারপর মস্ত একটা হুমো পাখির মত বিমান আকাশে উড়ল। জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর রূপ সুন্দরী নারীর মত। অচেনা, মোহময়। আকাশের বুকে প্লেনটা লাল আলো, নীল আলো দুলিয়ে ক্রমে দিগন্তে কোথায় অদৃশ হল।

* * * *

হোটেলের কাছে এসে বিস্তি খুব অবাক হল। আর রতীশ যা

বলেছিল সব ঠিক। এত সকালেও দরজার কাছে কি ভিড়। অন্তত আট-দশ জন পুলিশ তাদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। নিশ্চয় হোটেল থেকে কেউ বের হবে। তাকে এক পলক চোখে দেখার জন্য মানুষগুলো তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রতীশ বলল,—'তাড়াতাড়ি চল। আটটা বেজে গেছে। এরপর মাসী আবার বেরিয়ে যাবে।'

—'হোটেলের দরজার কাছে এত ভিড় কিসের?' বিস্তি ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল। 'তোমার মাসীকে দেখবার জন্য এরা এসেছে নাকি?'

প্রশ্নটার উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই যেন রতীশ মুচকি হাসল। পরে বলল,—'আগে মাসীকে দেখবে চল। তখন তোমার সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।'

স্লিপ্ পাঠাতেই বেয়ারা এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে বিস্তি প্রায় হতভম্ব। তার সামনে দাঁড়িয়ে ইনি কে? প্রথমটা সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। কেমন যেন ওলটপালট ঠেকছে। তারপর মগজটা ধীরে ধীরে আবার পরিষ্কার হয়ে এল।

এবার সে বুঝতে পারল। রতীশ তাকে মিথ্যে বলে নি। তার মাসীকে সে চেনে বৈকি। শুধু সে নয়। এই কলকাতায় কত লোক চিনবে। তার কথা বলা, চলাফেরা, গান গাওয়া, সব বিস্তির পরিচিত। এতবার দেখেছে। কখনও ভুল হতে পারে?

চিত্রতারকা মধুমিতা সেন তাকে দেখে মিষ্টি হাসল। বলল,—'তোমার নাম বিস্তি, তাই না? রতীশ আমাকে চিঠিতে সব লিখেছে। তুমি খুব ভালো নাচতে পার।' ফের চোখের একটি সুন্দর ভঙ্গিমা করে প্রশ্ন করল,—'তারপর বড় হয়ে কি করবে? আমার মত সিনেমায় নামবে নাকি?'

বিস্তি কোন জবাব দিল না। সে লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠল।

রতীশের মাসীর সময় ছিল না। ব্যস্ত নায়িকা। সকাল নটা থেকে সুটিং চলবে। আজ আর কাল। দুদিনই মাল বোঝাই নৌকোর মত প্রোগ্রামে ভারী। পরশু সকালে আবার বোম্বাই ফিরতে হবে। দুদণ্ড বসে গল্প করবার সময় কোথায়?

মিনিট পাঁচ পরেই মধুমিতা উঠল। বলল,—'ভেরি সরি। আজ আর সময় নেই রতীশ। তোর মাকে বলবি এর পরের বার মাসী নিশ্চয় দেখা করবে।'

—'হ্যাঁ, তুমি আবার দেখা করেছ।' রতীশ প্রায় অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে জানাল।

মধুমিতা তাদের দুজনের গাল টিপে আদর করল। চোখ নাচিয়ে বেশ মজা করে বলল,—'বি কেয়ারফুল। দুজনে মিলে আবার যেন একটা সিনেমার স্টোরি করে বস না।'

তারপর ডান হাতের তর্জনীটা ঈষৎ কামড়ে জলতরঙ্গের সুমিষ্ট বাজনার মত খিল খিল করে হেসে উঠল।

* * * *

আরো কুড়ি পঁচিশ দিন পর। বাড়িতে গোছগাছ শুরু হয়েছে। এতদিনের সংসার। তিলে তিলে গড়ে উঠেছে। টুকিটাকি নানা জিনিসপত্র। কতকাল ধরে সব সংগ্রহ করেছে। সার্কাসের তাঁবু নয় যে একদিনেই মনোরমা সব গুটিয়ে ফেলবে।

ডিসেম্বরের শেষে বাণীব্রত চন্দনপুরে যাবেন। চাষীকে চিঠি লেখা হয়েছে। উঠোনের আগাছা, বুনো ঝোপজঙ্গল কেটে সে যেন ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখে।

ক'দিন ধরে কিরণ খুব চিন্তিত। রীতাবরী তাকে চিঠি লিখবে বলেছিল। কিন্তু মাসখানেক হতে চলল, তার কোন খবর নেই। কিরণ একদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল। খোঁজখবরের আশায়। কিন্তু সে কাউকে চেনে না। কার কাছে রীতাবরীর খবর জানতে চাইবে? তবু বুদ্ধি করে অফিসের কেরানীবাবুর কাছে খোঁজ নিয়েছে। কিন্তু সে সংবাদও খুব উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়। রীতাবরী নাকি বেশ কিছুদিন হল ক্লাসে আসছে না। প্রায় পনের-কুড়ি দিন? হ্যাঁ, তা হতে পারে। কিম্বা আরো দু-পাঁচদিন বেশী। ক্লাসের রোলকলের খাতার উপর একনজর বুলিয়ে কেরানীবাবু তাকে পরিষ্কার উত্তর দিল।

অগ্রাণের সকাল। ক'দিন হল শীত বেশ ঝাঁকিয়ে পড়েছে। রোদ্দুরে পিঠ রেখে কিরণ চিন্তা করছিল। তার এখন কি করা উচিত? দু-একদিনের

মধ্যে সে রীতাবরীর বাড়ি যাবে নাকি? এ ছাড়া উপায় নেই। যা সেন্টিমেন্টাল মেয়ে। নিশ্চয় তার উপর রাগ করে ঘরে বসে আছে।

অবশ্য রীতাবরী নিষেধ করেছে। তার বাবা ভীষণ রাগী। সব শুনে হয়তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। কিরণকে দুটো অপমানের কথা হজম করতে হতে পারে। তবু সে তৈরি। ভীরুর মত লেজ গুটিয়ে বসে থেকে লাভ নেই। যা হয় হবে। কিন্তু রীতাবরী এবং তার পরিচয় ও সম্পর্কের কথা জোর গলায় জানাতে সে দ্বিধা করবে না।

মনোরমা হঠাৎ তার কাছে এসে বলল—'ও কিরণ। শোন বাবা তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

চোখ তুলে কিরণ অবাক হল। কথা বলতে গিয়ে মায়ের ঠোঁট দুটো অমন থরথর করে কাঁপছে কেন? মা কি আবার কিছু দেখল? হিরুর বিছানার তলায় চকচকে ছোরাটা দেখতে পেয়ে মা ঠিক অমনি কেঁপে উঠেছিল না?

মনোরমা ফিস ফিস করে বলল,—তুই তো ডাক্তার। বিন্তিকে একটু দেখবি? মানে ওর শরীরটা—'

কিরণ ভুরু কোঁচকাল। মা যেন কি ইঙ্গিত করছে। অথচ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পারছে না।

—'কি হয়েছে বিন্তির?' কিরণ প্রশ্ন করল। আজ সকালে সে বাথরুমে বসে বমি করছিল দেখলাম। ওর অম্বল-টম্বল হয়েছে নাকি?'

—'নারে বাবা। বোধহয় সর্বনাশ হয়েছে।' মনোরমা দাঁত কিড়মিড় করে কান্না চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'পোড়ারমুখী আমাদের সকলের মুখে কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছে।'

## ॥ একুশ ॥

মনোরমা পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে যেতেই চোখের সামনে অন্ধকার মনে হ'ল, হাত বাড়িয়ে সে শূন্যে একটা কিছু আশ্রয় খুঁজছিল।

চেয়ার থেকে উঠে কিরণ তাড়াতাড়ি মাকে ধরে ফেলল। বিছানার

উপর একটা বালিশে হেলান দিয়ে তাকে ভালো করে বসাল। বলল,—'এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন মা? বিস্তির কি হয়েছে আগে শুনি।'

মনোরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল,—'আর কি শুনবি বাবা? ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাজ নেই। কালামুখী আমার কাছে সব স্বীকার করেছে। কিছু গোপন করেনি। আঁচলের কোণে চোখের জল মুছতে মুছতে ফের বলল,—'সেই বড়মানুষের ছেলে। সেই রতীশ আমার মেয়ের এই সর্বনাশ করল।'

সব শুনে কিরণ প্রায় নিঃসন্দেহ হ'ল। মায়ের নির্ণয় বোধহয় অভ্রান্ত। প্রকৃতির নিয়ম-টিয়ম হিসেব করলে ঠিক এরকম একটা কিছু ধরে নিতে হয়। কিন্তু কি সাংঘাতিক অবস্থা। খুব শীগগীর একটা বিহিত করা প্রয়োজন। কথাটা বাড়ির ঝি কিম্বা বাইরের কোনো লোকের কানে গেলে আর রক্ষে নেই। পাড়ায় একটা ঢি-ঢি পড়ে যাবে। তারপর দশজনের কাছে মুখ দেখানো লজ্জার ব্যাপার হবে না?

একটু আগে সকালের সোনা-রোদ জানালা ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। এতক্ষণ চাদর জড়িয়ে চুপ করে বসে থাকতে কি সুন্দর লাগছিল। রোদ্দুরে পিঠ রেখে রীতাবরীর কথা ভাবছিল কিরণ। তার নিজের সমস্যা। এরপর সে কি করবে? রীতাবরীর বাবার সঙ্গে দেখা করবে কি-না। চুপ করে ভাবতে ভাবতে কখন অবচেতন মনে সে নানারকম স্বপ্নের জাল বুনছিল।

মায়ের কথা শুনে কিরণ যেন ঘেমে উঠল। এখন তার একটুও শীত করছে না। টান মেরে গায়ের চাদরটা বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে সে আলনা থেকে হ্যাঙগারে টাঙানো জামাটা টেনে নিল।

মনোরমা ব্যস্ত হয়ে শুধোল,—'যাবি কোথায়?'

—'সেই ভদ্রবেশী শয়তানটার কাছে। কিরণ দাঁতে দাঁত ঘষল। তারপর নীচের ঠোঁটটা ঈষৎ কামড়ে একটা শপথের ভঙ্গি করে জানাল,—'ওর সঙ্গে ফয়সালা করব আমি। বিস্তির এই অবস্থার জন্য সে দায়ী। সুতরাং তাকে বিয়ে করতে হবে।'

দুঃখ করে মনোরমা বলল,—'বিয়ের কথা আমি অনেক দিন ধরে তুলেছি কিরণ। তোর কাছে, মিলুর কাছে। তোর বাবাকেও জানিয়েছি।

কিন্তু কেউ গা করিস নি। সবাই মিলে আমাকে শুধু বুঝিয়ে দিলি, বিন্তি ছেলেমানুষ, ওর এখনও বিয়ের বয়স হয় নি।' একটু থেমে সে ফের যোগ করল,—'এখন বুঝতে পারছিস তো? তোর বোনের বয়স না হলে কখনও এমনি সব লজ্জার ব্যাপার ঘটে?'

উত্তরে কিরণ অনেক কিছু বলতে পারত। কিন্তু সে চুপ করে রইল। তার মাথায় অনেক দায়িত্ব। এখন কত কাজ। মায়ের সঙ্গে মিছিমিছি তর্ক করে লাভ নেই। আজ সকালে প্রথমে সেই ছেলেটার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। কিন্তু রতীশ যদি দায়িত্ব অস্বীকার করে? তার বোনকে এখন বিয়ে করতে রাজি না হয়? তাহলে কি করবে কিরণ একটা হৈ-চৈ, চেঁচামেচি করে পাড়ার ছেলেদের সাহায্য চাইবে? কিম্বা থানা-পুলিশের দ্বারস্থ হবে?

দরজার কাছে এসে মনোরমা চুপি চুপি জানাল,—'শোন বাবা। এসব কলঙ্কের কথা। বেশী চেঁচামেচি, রাগ-রোষ করিসনে যেন। হিতে বিপরীত হতে পারে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল,—'তোর বাবা কিন্তু এখনও কিছু জানেন না। রোগা মানুষ, আর এই তো মনের অবস্থা। শুনলে এখনই অস্থির হয়ে উঠবেন। তখন মেয়েকে সামলাব না, তোর বাবাকে দেখব বলতে পারিস?'

—'বিন্তি কোথায় মা?' কিরণ এতক্ষণ পরে বোনের খোঁজ করল।

ওর পড়ার ঘরে। বিন্তিকে দেখলে তোর মায়া হবে কিরণ। মুখখানা ভয়ে কালি। হিরুর খাটে চুপ করে শুয়ে আছে।'

আমহার্স্ট স্ট্রীটে কিরণ ট্যাক্সি নিল। অবশ্য ফাঁকা বাস ছিল। কিন্তু এসপ্ল্যানেডে গিয়ে আবার বদল করবার ঝামেলা। মিছিমিছি খানিকটা সময় যাবে। সাদার্ন অ্যাভেনিউ অবশ্য অনেকখানি পথ। পাঁচ-ছ টাকা নির্ঘাত গচ্চা। কিন্তু এই দুঃসময়ে পয়সা-কড়ির হিসেব করলে চলবে না। যেমন করে হোক রতীশকে রাজি করাতে হবে। সে যদি বিন্তিকে না বিয়ে করে তাহলে সামনে গাঢ় অন্ধকার। কি করবে কিরণ ভেবে পাচ্ছে না।

সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ে বাড়ির নম্বর সে খুঁজে বের করল। কি সুন্দর

শান্ত নির্জনতা। বাগানে কত রকম মরশুমী ফুল। এক-একটা বড় জাতের গোলাপের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কলিং বেল টিপতেই ধুতি আর হাফ সার্ট-পরা একজন বাজার সরকার গোছের লোক বেরিয়ে এল। ছেলেবেলায় ওর বসন্ত হয়েছিল। মুখে অল্প-বিস্তর সেই ক্ষতের চিহ্ন।

—'রতীশবাবু আছেন? তাঁকে একটু ডেকে দিন—'

—'আপনি দাদাবাবুকে খুঁজছেন?' লোকটি তার মুখের দিকে ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। 'তিনি তো এখানে নেই।'

—'নেই মানে?' কিরণের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। 'কোথায় গেছেন?'

—'কেন, আপনি জানেন না? দাদাবাবু তো গত বুধবার বিলেত গেলেন।'

—'বিলেত গেলেন?' কিরণ যেন আকাশ থেকে পড়ল। ঘাড়ের উপর করতল চেপে বলল,—'তার বাবা-মা কাউকে ডেকে দিন না।'

—'কেউ নেই বাড়িতে। তাঁরা সবাই দিল্লীতে আছেন। এক মাস পরে কলকাতায় ফিরবেন।—'

কিরণ অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মত মাটি কাঁপছে। সে পা শক্ত করে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারছে না। একটা শীতল ভয়ের স্রোত পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ক্রমাগত উপরে উঠছে আবার নীচে নামছে। এখন কি করবে কিরণ? কেমন করে বিন্তি কলঙ্কমুক্ত হবে? তার মাকে, বাবাকে লোক হাসি আর অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে?

প্রায় টলতে টলতে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে তার একজনের কথা মনে পড়ছে। ইচ্ছে করলে সে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তার বন্ধু পরিতোষ। বিন্তি বুঝতে পারেনি। ভুল করে সে আঘাটায় নেমে পড়েছিল। তাই পায়ে-হাঁটুতে নোংরা কাদা। সকলের অলক্ষ্যে সেটুকু ধুয়ে-মুছে দূর করলেই হয়। পরিতোষ বলে, আমাদের দেশের মেয়েরা পানকৌড়ি নয়। ওরা হাঁসের মত,—ডাঙায় উঠলেই পালক থেকে জল ঝরে পড়ে। তখন আর অন্যায়ের ছিটে-ফোঁটাটি গায়ে লেগে থাকে না।

হাসপাতালে গিয়ে সে পরিতোষকে খুঁজে বার করল। প্রায় টানতে টানতে মাঠের এক কোণে তাকে নিয়ে গেল। জায়গাটা বেশ নির্জন। ডাক্তার-নার্স কিম্বা হাসপাতালের অন্য কর্মচারীদের আনাগোনা কম। তার চিন্তিত মুখ, শুকনো ঠোঁট, প্রায় অবিন্যস্ত চুল এবং উদভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে পরিতোষ রীতিমত অবাক হল।

ভুরু কুঁচকে সে প্রশ্ন করল,—'কি হয়েছে তোর ?'

—'ভীষণ বিপদে পড়েছি। তুই যদি আমার একটা উপকার করিস।'

—'বেশ তো, কি করতে হবে তাই বল।'

কিরণ একটা ঢোক গিলল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে অবশেষে বলল,—'ইয়ে, মানে একটি মেয়ের খুব বিপদ। আমার বিশেষ জানাশুনো। কি হয়েছে—বুঝতে পারছিস ? শী ইজ অ্যানম্যারেড। তুই যদি একটা ডি, এন, সি করবার ব্যবস্থা করে দিস। মানে যেখানে হোক, আমি সমস্ত খরচ দিতে প্রস্তুত।'

—'ছি, ছি!' পরিতোষ বিরক্তিতে মুখখানা শক্ত করল। বন্ধুকে তিরস্কার করে বলল,—'তোর গালে একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে। এমন আস্ত গবেট। নিজে ডাক্তার হয়ে রীতাবরীর এই সর্বনাশটি করলি। আজকাল কত রকম উপায় আছে। একটাও মাথায় আসেনি ?'

লজ্জায়, দুঃখে কিরণের দু চোখে জলের ফোঁটা টলমল করছিল। চোখের কোল বেয়ে অবাধ্য অশ্রুর ফোঁটা এখনই গড়িয়ে পড়বে। 'রীতাবরী নয়। পকেট থেকে রুমাল বের করে সে চোখ মুছল। 'তোকে যার কথা বলছি সে আমার বোন,—'আপন ছোট বোন পরিতোষ।'

—'মাই গড। বলিস কি তুই ?' পরিতোষ বিস্ফারিত চোখে তাকাল।

—'হ্যাঁ। আমি সকালে উঠে সেই স্কাউণ্ড্রেলটার বাড়ি ছুটেছিলাম। কিন্তু সে ভীষণ চালাক। গত বুধবার ইংল্যাণ্ড চলে গেছে, এমন কি বাড়িতে তার মা, বাবা কেউ নেই। সবাই এখন দিল্লীতে।' পরিতোষের হাত দুখানা ধরে কিরণ মিনতি করল,—'আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর তুই।'

—'নিশ্চয়।' পরিতোষ আশ্বাস দিল। একটু ভেবে বলল,—'তুই কাল ওকে নিয়ে আয়। বেলা বারোটা নাগাদ। আমার এক বন্ধুর

ছোটখাটো একটা নার্সিং হোমের মত আছে, ওখানেই সব ব্যবস্থা হবে। দাঁড়া, তোকে কার্ডটা দিচ্ছি।'

কিরণকে নিরুত্তর দেখে সে ফের বলল,—'ভয় নেই তোর। এটা আর্লি স্টেজ,—'সুতরাং রিস্ক নামমাত্র। তাছাড়া জায়গাটা খুব সেফ। আর মোটে দেড় দিনের ব্যাপার। কোথায় কি হল শিবের বাবাও টের পাবে না।'

*  *  *  *

বেলা হুটো নাগাদ কিরণ বাড়িতে ফিরল। ঘরে এখন শুধু মা আর বিন্তি। বাণীব্রত অফিসে, তাই কথা কইবার সুবিধে। সব শুনে মনোরমা কপালে করাঘাত করে বলল,—'আমার অদেষ্ট বাবা। নইলে ইস্কুলে-পড়া কুমারী মেয়ের এমন কলঙ্ক হয়? কি কুক্ষণেই আমি ওকে থিয়েটার করতে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন পাপপুণ্য, ভালো-মন্দ বিচার করবার অবসর নেই। যেমন করে হোক এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে।'

বিন্তির ঘরে ঢুকে সে প্রায় চিৎকার করে বলল,—'দ্যাখ, হতচ্ছাড়ি। কেমন ছেলের সঙ্গে পিরীত করেছিলি। কেষ্টঠাকুর এখন বিলেতে গিয়ে মেমসাহেবদের নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। তোর কথা তার মনেও নেই।'

কিন্তু বিন্তি চুপ। আজ সকাল থেকে সে বোবা। ঠিক পাষাণ প্রতিমার মত। একটি কথাও বলছে না।

মনোরমা ছেলেকে কাছে ডাকল। গলা খাটো করে বলল,—'দোহাই কিরণ। তোর বাবাকে যেন একটি কথাও বলিস না। কেমন মানুষ জানিস তো? এই সব অনাছিষ্টি খবর শুনলে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। কাল তাকে অফিসে পাঠিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব। আর মোটে একটা রাত্তির। বলব, বিন্তি ওর এক বন্ধুর জন্মদিনে গেছে। রাত্তিরে সেখানেই থাকবে। তাহলে আর কোন চেঁচামেচি করবে না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর চাদর মুড়ি দিয়ে কিরণ বিছানায় শুয়েছিল। আজ সকাল থেকে সে বোনের সঙ্গে একটি কথাও বলে নি। তার কাছে যায় নি। আর বিন্তি কি অসম্ভব ঠাণ্ডা। ঠিক মরা মাছের মত কাঠকাঠ···আড়ষ্ট। এখন কথা বলতে গেলে সে তাকাতেই পারবে না। লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকবে।

কি প্রয়োজনে মনোরমা এ-ঘরে ঢুকেছিলেন। হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে বলল,—'ওই যাঃ। তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সকালের ডাকে তোর নামে একখানা চিঠি এসেছে কিরণ।'

—'চিঠি'! সে তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসল।

মনোরমা কোথা থেকে খামটা এনে দিতে কিরণ বুঝতে পারল। মেয়েলি হস্তাক্ষরে তার নাম পরিষ্কার লেখা। নিশ্চয় রীতাবরীর চিঠি। খামটা না খুলেও কিরণ নির্ভুল বলে দিতে পারে।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গেলে সে আপন মনে মুচকি হাসল। আশ্চর্য! এতদিন বাদে রীতাবরীর তাকে মনে হল। প্রায় এক মাস পরে মেয়ের তাহলে রাগ পড়েছে?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিরণ খামটা ছিঁড়ল। যা ভেবেছিল তাই। রীতাবরীর চিঠি। সে লিখেছে—

আমার ভালবাসার কিরণ,

তুমি যখন এই চিঠি পাবে তখন আমি অনেকদূরে চলে যাচ্ছি। আর একজনের সঙ্গে যার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার কুমারী মনের লজ্জা-অনুরাগ মেশানো নরম রাঙ্গা মাটিতে কোনোদিন তার ছায়া পড়েনি। তবু সেই অচেনা মানুষটির হাত ধরে তালগাছের বুক চিরে বানানো জোড়া ডিঙির মত আমরা দুজনে সংসার-সমুদ্রে ভেসে পড়লাম। নিশ্চয় অদৃষ্টে তাই লেখা ছিল। নইলে যাকে চিনলাম, জানলাম সে আমার কেউ হ'ল না। আর যাকে কোনোদিন দেখিনি, সেই মানুষ কেমন করে আমার জীবনতরীর হাল ধরবার অধিকার পেল?

সেদিন কলেজ ষ্ট্রীট থেকে রাগ করে চলে এসেছিলাম। তুমি নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছ? সমস্ত পথ আমি শুধু চিন্তা করেছি, তুমি কেমন করে আমাকে দু'মাস অপেক্ষা করতে বলতে পারলে? তোমার কাছে আমার অবস্থার কথা একটুও গোপন করিনি। আমাদের রক্ষণশীল বাড়ি। বাবা বংশ গৌরবকে চোখের মণির মত সযত্নে রক্ষা করতে চান। তার কাছে অসবর্ণ বিয়ের অনুমতি চাওয়া অথবা পাথরে মাথা ঠুকে মরা প্রায় এক কথা।

তুমি কত সহজে আমার কাছে সময় চেয়ে নিলে। আরো ছুটি মাস আমাকে অপেক্ষা করতে বললে। কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে কিরণ? মা-বাবা, বাড়ির লোকে আরো দু'মাস অপেক্ষা করবে কিনা, একথা তো তুমি একবারও জিজ্ঞাসা করলে না? আমার সৌভাগ্য কিম্বা দুর্ভাগ্য যাই বল। যারা আমাকে পছন্দ করেছেন, তারা বাবার কাছে এসে বিয়ের দিন স্থির করতে চাইবেন একথা কি তোমার মনে ভেসে উঠল না?

আমি বুঝতে পেরেছি কিরণ। তোমার অনেক দায়িত্ব, নানা সমস্যা। বাড়ির কথা তোমাকে বেশ ভাবতে হয়। তোমার ছোটভাই গ্রামে চলে গেছে। তাই মায়ের মনে সুখ নেই। দাদা আমেরিকায় যাবেন। বাবা অবসর নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলি দেশের বাড়িতে কাটাবেন বলে স্থির করেছেন। এই মুহূর্তে তোমার কারো দিকে তাকাবার অবসর নেই। বলতে গেলে দায়িত্ব এখন একার। বাড়ির ভাবনা শুধু তোমার কিরণ। আর দু-মাস মিছে বলা, অন্তত আরো কিছুদিন না গেলে দুই কাঁধে তুমি কিছুতেই শক্তি পাবে না।

বিশ্বাস কর, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হল। এত সমস্যা, তার ভারে তুমি জর্জর। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত নিজের ভাবনার কথা বলে তোমাকে বিব্রত করা আমার উচিত হয়নি। তাই আমি বিদায় নিচ্ছি কিরণ। লক্ষ্মীটি, আমাকে ভুল বুঝে তুমি দুঃখ পেও না।

অনেক ভেবে-চিন্তে এই বিয়েতে মত দিলাম। মা আমাকে বারবার বলেছেন, বোকা মেয়ে, তোর ভালো-মন্দ আমরা অনেক বেশী বুঝব। নিজের ভাবনা-চিন্তা আমাদের উপর ছেড়ে দে। দেখবি তুই জীবনে কত সুখী হয়েছিস।

নিজের সুখের জন্য নয়। তোমার কথা ভেবে বিদায় নিচ্ছি কিরণ। আমি চলে গেলে হয়তো তুমি একটু হাল্কা বোধ করবে। ভালো করে বাড়ির কথা ভাবতে পারবে। তোমার দুঃখিনী মায়ের কথা, বাবার কথা। ছোট বোন বিন্তি, যার বিয়ের জন্য তোমাকেই এবার কোমর বেঁধে তৈরি হতে হবে।

আমার মা বলেন, এসব কাঁচা রঙ। বিয়ের জল পড়লেই সব ধুয়ে-মুছে

যাবে। আমি একথা মানি না কিরণ। ভালোবাসার রঙ কোনোদিন কাঁচা হয় না। দূরে সরে যাচ্ছি বলেই কি মন থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারব ?

আবার কোনোদিন দেখা হবে কিনা জানি না। কিন্তু কলকাতায় গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালে তোমার কথা বড় বেশী মনে পড়বে। এই মাঠে-ময়দানে, শন্‌শনে হাওয়ায় সবুজ ঘাসের উপর বসে দুজনে কত গল্প করেছি। আমার সেই স্বপ্নের বাড়িটার ছবি মনের আয়নায় কতবার ভেসে উঠবে।

কোনোদিন অনেক রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে পুরোন দিনের হাজার স্মৃতি মনের বন্ধ দরজার মুখে ভিড় করবে, আমি চোখ বুজে আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখার মতো তোমার কথা চিন্তা করব কিরণ। আমাদের ভালো-বাসার কথা। সেই ঝমঝমে বর্ষায় কলেজ স্ট্রীটে দু'জনে দু'দিক থেকে ছুটে এসে একই ট্যাকসি ধরতে চেষ্টা করলাম। আবার কোনোদিন শ্রাবণের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যাবে। ঘন ঘোর বর্ষা নামলে তোমার কথা সর্বাগ্রে মনে হবে।

ভালোবাসার দিনগুলি বড় ছোট। শীতের বেলার চেয়েও স্বল্প পরিসর। কিন্তু তারা স্থায়ী। কোনোদিন মন থেকে মুছে যায় না। আর আমার কুমারী জীবনে তুমি প্রেমের প্রথম কিরণ। তোমার কথা কি কখনও ভুলতে পারি ?

বিদায়—
ইতি
রীতাবরী

চিঠিখানা পকেটে রেখে কিরণ আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার মনে রাগ বা অভিমান নয়। কেমন একটা বিচিত্র দুঃখের অনুভূতি ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল। অন্তরের কোন নিভৃত প্রদেশে বিষণ্ণ মেঘের ছায়া ক্রমেই ঘন হচ্ছে। অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়ল তার। কলেজে এক বন্ধু ভীষণ তর্ক করে বলেছিল,—'মেয়েরা আদৌ ভাবপ্রবণ নয়। ওরা

খুব প্র্যাকটিকাল।' এতদিন পরে সেই মন্তব্যটা কেবল মাথায় ঘুরছে। আর সত্যি কথা, রীতাবরী তাকে ঠিক নিক্তির ওজনে বিচার করেছে। তার মাথায় এখন অনেক দায়িত্ব। দাদা আমেরিকায়, হিরু বাড়িঘরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছে। সুতরাং তার মাকে-বাবাকে কে দেখবে? আর বিস্তি? এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে কি ভাবনার শেষ আছে? আরো কতদিন এই দুর্ভাবনা চলবে তাই বা কে বলতে পারে? দু'মাস কেন, ছ'মাস কিম্বা এক বছর হয়তো কিরণকে বাড়ির কথা ভাবতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বাইরে কোথাও ঘুরে এলে ভালো লাগবে? দেহে-মনে কেমন বিশ্রী অবসাদ। একটা তিক্ত কটুগন্ধ ওষুধ খাওয়ার পর মুখের যা দশা হয়, কিরণের মনের অবস্থাও তাই। সে ভাবছিল এসপ্ল্যানেডে গিয়ে কিছুক্ষণ বসবে কি না? কিম্বা কলেজ স্ট্রীটের কফি-হাউসে। সন্ধ্যের সময় সেখানে হয়তো পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

জামাটা মাথায় গলিয়ে কিরণ বেরোবার জন্য তৈরি হল। এই ফ্ল্যাটে এখন সে ছাড়া আরো দুটি প্রাণী। তার মা ও বিস্তি। তবু সমস্ত বাড়িটা কি অদ্ভুত নিস্তব্ধ আর চুপচাপ। যেন সব মৃত। প্রাণহীন এক প্রেতপুরীর মধ্যে কিরণ আটকা পড়েছে। কিন্তু বিস্তি? অমন প্রাণচঞ্চল ছটফটে মেয়েটা। কলঙ্কের কথা রটবার পর সে কি বোবা হয়ে গেছে?

সমস্ত রাত্তির কিরণের ঘুম হয়নি। রীতাবরীর চিঠিখানা তার পকেটে। চোখ বুজলেই পুরনো দিনের কথা কেবল মনে হয়। সেই গঙ্গার তীর। সূর্য ওপারে শিবপুরের কল-কারখানাগুলির মাথায় হেলে পড়েছে। রাজহংসীর মত একটা শাদা মোটর লঞ্চ তরতর করে জল কেটে দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। সেই ছায়াঢাকা বিকেলে সবুজ ঘাসের উপর বসে তারা দুজনে শুধু স্বপ্নের জাল বুনত। কতদিন শিয়ালদ স্টেশনে নেমে রীতাবরী তার জন্য অপেক্ষা করেছে। হাসপাতালের উল্টোদিকে খানিকটা দূরে সিনেমা হলটার কাছে দাঁড়িয়ে এই কলকাতার পথে পথে তারা দুপুরে-বিকেলে ঘুরে বেড়িয়েছে। অমন সোনার দিনগুলি পাখির মত ডানা মেলে কোথায় হারিয়ে গেল।

কিন্তু এখন বিছানায় শুয়ে রীতাবরীর কথা ভেবে তার মন খারাপ করলে চলে না। কাল অনেক কাজ। বিস্তির জন্য সে খুব দুর্ভাবনায় আছে। পরিতোষ অবশ্য তাকে আশ্বাস দিয়েছে। ব্যাপারটা খুব সামান্য। আর্লি স্টেজে গেলে রিস্কের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু একটা কিন্তু থেকে যায়। সে নিজে চিকিৎসক। আর ডাক্তার তো ঈশ্বর নয়। সুতরাং ভুলচুক অ্যাকসিডেণ্ট সবই ঘটতে পারে। কিছুই বিচিত্র নয়।

খুব সকালে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনোরমা যেন তাকে ব্যাকুলভাবে ডাকছেন। কিরণের মনে হল কথা বলতে গিয়ে মায়ের গলা কান্নায় বুজে আসছে। এই শীতের সকালে তার মস্তিষ্কের ভিতর বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত একটা চিন্তার প্রবাহ শুরু হ'ল। কি হয়েছে মায়ের? দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে সে ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল।

—'ও কিরণ, তুই একটু ওঠ বাবা।' মনোরমা তেমনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'একবার দেখবি চল। বিস্তি কেন জেগে উঠছে না? এত ডাকা-ডাকি, ঠেলাঠেলি করলাম। তবু ওর ঘুম আর কিছুতেই ভাঙ্গে না।'

—'তাই নাকি?' কিরণ বেশ অবাক হ'ল। তারপর বিছানা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মেঝের উপর বিস্তি নিশ্চিন্তে শুয়ে। এখন তার মুখখানি ঠিক নিশীথ রাতের জ্যোৎস্নার মত। বড় শান্ত, বড় সুন্দর। চিন্তা নেই। ভাবনা নেই। বিস্তি যেন পরম সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। তার বাবা বিছানার পাশে বসে গালে করতল চেপে গভীরভাবে চিন্তা করছে।

ঘুম চোখে প্রথমটা সে ধরতে পারেনি। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে কিরণ চমকে উঠল। মাথার বালিশের কাছে পরিতোষের দেওয়া সেই নীল শিশিটা খালি পড়ে আছে। বিস্তি একটিও রাখেনি। তার বাবা মাঝে মধ্যে দু-একটা ব্যবহার করে থাকবেন। বাকিগুলি বিস্তি খেয়ে ঘুমিয়েছে। ফলে গাঢ় নিদ্রা। তারপর ঘুমের দেশ পেরিয়ে আর এক অজানা দেশের মাটিতে সে পা দিয়েছে। সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। তবু চিকিৎসক হিসেবে একবার পরীক্ষা করতে হয়। গায়ে হাত রেখে কিরণ ভ্রূ কোঁচকাল। ঠাণ্ডা দেহ। হৃদস্পন্দনের কোনো চিহ্ন নেই।

একটু খুঁজতেই বালিশের নীচে একটা ছোট্ট কাগজ পাওয়া গেল। তার শেষ চিঠি। কিরণ যা ভেবেছিল তাই। বিস্তি আত্মহত্যা করেছে। চিঠিতে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

কাগজটা মনোরমার হাতে দিয়ে কিরণ মাথা নীচু করে দাঁড়াল। 'একটু শক্ত হও মা। বিস্তিকে ডাকাডাকি ক'র না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সে ফের বলল, 'ওর ঘুম আর কখনও ভাঙবে না।'

মনোরমা ডুকরে কেঁদে উঠল। মেয়ের মৃতদেহটা আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল,—'তুই অভিমান করে চলে গেলি মা। তোকে কলঙ্কিনী বলেছি, তাই—।' মনোরমা আর কথা বলতে পারল না। সে বিছানার উপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বাণীব্রত আশ্চর্য মানুষ। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি গুম হয়ে বসে রইলেন। এমন একটা দুর্ঘটনা। তবু চোখে এক ফোঁটা জল গড়াল না। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। বাপের এমন শুকনো গম্ভার মূর্তি কিরণ জন্মে দেখেনি।'

তবু সে একবার ভয়ে ভয়ে বলল,—'তুমি অমন চুপ করে বসে থাকবে বাবা? এখনও তো অনেক কাজ। আমার বুঝি মন খারাপ হয়নি?'

বাণীব্রত ঠোঁট ফাঁক করে একটু হাসলেন। কেমন পাগলের মত হাসি। চোখ দুটো বড় বড় করে ছেলের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন।—'আমি তোকে বলিনি? ঘণ্টা বেজেছে কিরণ। এবার ঘণ্টা বেজেছে। আর দেরি করিস নে বাবা। তাড়াতাড়ি আমাদের চন্দনপুরে পাঠিয়ে দে—।'

মা-বাবাকে প্রায় জোর করে বারান্দায় এনে কিরণ আর একবার ঘরের ভিতর ঢুকল। একটা সাদা চাদরে মৃতদেহটা ঢাকতে গিয়ে সে কতক্ষণ ছোট বোনের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল,—'তুই ভুল করলি বিস্তি। অকারণে মা-বাবাকে এত দুঃখ দিলি। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করেছিলাম রে। এই কলঙ্কের কথা কাকপক্ষীতেও টের পেত না। মিছিমিছি সব ভেস্তে দিয়ে অকালে চলে গেলি।—'

শুধু পাড়ার ছেলেরা নয়। পরিতোষ তাকে যথেষ্ট সাহায্য করল। সমস্ত দিন ছুটোছুটি। কাটা-ছেঁড়া, পোস্টমর্টেমের হাঙ্গামা। সমস্ত কাজ চুকিয়ে কিরণ যখন বাড়িতে ফিরল, তখন অনেক রাত্তির। প্রায় ঘুমন্ত শহর। এগারোটা কখন বেজে গেছে।

পরের দিন সকাল হতেই বাণীব্রত অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি আজই চন্দনপুরে যাবেন। কলকাতায় আর এক মুহূর্তও নয়। অবসর নেবার কয়েকটা দিন বাকি ছিল। বাণীব্রত তাই কোম্পানীকে চিঠি লিখলেন। আজ থেকেই তিনি রিটায়ার করতে চান। এই শহরে আর একটি দিনও থাকবার অভিরুচি নেই। সাহেব যেন তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

চন্দনপুরে যেতে মনোরমার এখন আপত্তি নেই। কি হবে কলকাতায় থেকে? অমিয় বারিক লেনের এই ফ্ল্যাটটা তাঁকে হাঁ করে গিলতে আসছে। সমস্ত ঘরে হিরু আর বিন্তির হাজার স্মৃতি। মনোরমা কোনদিকে তাকাবেন? কেবল তাঁর কান্না পাচ্ছে। এখানে থাকলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবেন।

স্টেশনে অনেকে এল। অফিসের আদিনাথবাবু আরো দু-তিনজন সহকর্মী। পাড়ার ক'টি ছেলে, এবং পরিতোষ। কিরণ তাদের সঙ্গে দু-একদিনের জন্য চন্দনপুরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাণীব্রত রাজি হননি। এক রাত্তিরেই তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। কত বুড়ো। চুলগুলি উস্কোখুস্কো, নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। যেন অন্য মানুষ। ভীষণ খটমটে, শক্ত মেজাজ। স্টেশনেও বললেন—'তোর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা বুড়োবুড়ি দিব্যি যেতে পারব। আর বিদেশ তো নয়। নিজের গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি। অত চিন্তা-ভাবনার কি আছে? একটু থেমে ছেলেকে সাবধান করে বললেন,—'তুমি কলকাতায় বেশিদিন থেক না। পারলে অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে চলে যেও, বুঝলে?'

পরিতোষ শুনতে পেয়ে বলল,—'হ্যাঁ মেসোমশায় আমি ওর জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করেছি। দার্জিলিঙের কাছে, বেশ বড় চা-বাগানের হাসপাতালে। ভালো মাইনে। তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টার্স। কিরণ রাজি আছে।'

মনোরমা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল,—'তুই চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছিস কিরণ? কই আমাকে তো কিছু বলিসনি?—'

—'পরে তোমাকে চিঠি লিখতাম মা', কিরণ মৃদু হেসে জানাল।

মনোরমা চুপ করে রইল। ছেলের মুখখানা যেন বড় সরু। আর কি রকম রোগা হয়ে গেছে। চোয়ালের হাড়গুলি স্পষ্ট। কে জানে ওর মনে কিসের দুঃখ। যা চাপা ছেলে। মুখ ফুটে তো বলবে না। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, নইলে হঠাৎ চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যেতে চাইবে কেন?

ট্রেন ছাড়ল। বাণীব্রত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ওরা সবাই হাত নাড়ছে। এতদিন পরে কলকাতা ছেড়ে তিনি সত্যি চললেন। ভেবেছিলেন কত আনন্দ করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন, এমন দীনহীন নিরানন্দ হৃদয়ে তাকে বিদায় নিতে হবে, একথা কোনোদিন স্বপ্নেও মনে হয়নি।

* * * *

শীতের সকাল। অল্প অল্প রোদ্দুর উঠছে। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে গোরুরগাড়ি চলছিল। এদিকে ধান কাটা শেষ। দুপাশে ন্যাড়া মাঠ। কোথাও মোরাম মাটির অনুর্বর প্রান্তর। ছোট একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাড়ি ধীরে ধীরে পেরিয়ে এল। পথের ধারে খেজুর গাছ। রোগা, ডিগডিগে ছেলের গলায় বড় একটা মাদুলির মত গাছের মাথায় খেজুর রসের হাঁড়ি টাঙানো। তার বাবার একটা পিসী ছিল। বয়সে সামান্য বড়। ছেলেবেলায় বাণীব্রতকে সে বলত,—'খেজুর গুড় পুজোয় লাগে না, জানো তো ভাই?'

বাণীব্রত প্রশ্ন করতেন,—'কেন ঠাকুমা?'

—'কেন আবার? খেজুর গাছের গলা কেটে দিলে তবে তো রস থকে গুড়। তাতে কি কখনও ঠাকুরের পুজো হয়?'

কতদিনের কথা। কুয়াশাভরা শীতের সকালের মত যেন আবছা দখা যায়।

মনোরমা চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল। অনেকদিন সে গ্রামে আসেনি।

কি গাঢ় নীল আকাশটা। কত গাছপালা, উন্মুক্ত প্রান্তর। দূরে হাতীর পিঠের মত শুশুনিয়া পাহাড়ের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। বিন্তি থাকলে এতক্ষণ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ত। হয়তো আহ্লাদে গান করত। প্রজাপতির মত এমন সুন্দর মেয়েটা। মনোরমা মুখ ফিরিয়ে আঁচলের কোণে চোখের জল মুছতে লাগল।

শিবতলায় হীরালাল সেন সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গরুর গাড়িতে নতুন মানুষ দেখে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। কাছে এসে চিনতে পেরে বলল,—'তাহলে গ্রামে বাস করতে চলে এলেন। তারপর ছইয়ের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'তা আপনারা দুজনে ? ছেলেমেয়ে কই।'

বাণীব্রত গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন,—'তুমি পরে এস হীরালাল। সব কথা এক সময় বলব।'

কেমন বিষণ্ণ দৃষ্টি। কপালে চিন্তার রেখা। হীরালাল তাই আর কোনো প্রশ্ন করল না। সে সাইকেলে চেপে অন্যদিকে রওনা হল।

উঠোনে পা দিয়ে মনোরমা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়িটা তার চোখে নতুন লাগছে। দোতলাটা হবার পর মনোরমা আর আসেন নি। তাছাড়া পুজোর পরেই বাণীব্রত এসে ঘরদোর সারিয়ে চুনকাম আর রং করিয়ে গেছেন। দেওয়ালে ফিকে হলুদ রং, কার্ণিসের একটু নীচে পর্যন্ত খয়েরী বর্ডার। তার শ্বশুরের আমলে এসব কিছুই ছিল না। একতলা বাড়ি। বৃষ্টিতে, জলের ঝাপটায় বিবর্ণ মূর্তি। তার বিয়ের সময়েও বাইরের দেওয়ালে রং হয়নি।

মনোরমার মনে পড়ল এ বাড়িতে নববধূর সাজে সে উঠোনের ওইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। শাশুড়ি তাকে বরণ করলেন। পাথরের থালায় দুধ আর আলতাগোলা। মনোরমা তার উপর উঠে দাঁড়াল। একতলার ওই ঘরটায় তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল। তারপরও এই বাড়িতে অনেকদিন কাটিয়েছে মনোরমা। বাণীব্রত তখনও বাসা করেন নি। ওই ঘোড়ানিমের গাছটা খুব ছোট ছিল। ঝাঁকড়া চুলওলা দৈত্যের মত এমন প্রকাণ্ড হয়ে ওঠেনি।

সমস্ত দিন একটা অবসন্নতার মধ্যে কাটল। আগাছার জঙ্গল সম্পূর্ণ

নির্মূল হয়নি। এদিকে সেদিকে যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু বাণীব্রতর কোনো উৎসাহ নেই। হাতে পায়ে জোর কোথায়? আগে হলে সকালেই লোক-জন ডাকতেন। সূর্যি মাথায় উঠতে না উঠতেই সব পরিষ্কার। উঠোনের একটি ঝোপও বাকি থাকত না।

সন্ধ্যের পর মনোরমা অল্প সল্প গোছগাছ শুরু করল। বিছানাটা খুলতে হয়। জিনিসপত্র এবার সরিয়ে তুলে রাখা দরকার। আরো কত কাজ। কতকাল বাদে শ্বশুরের ভিটেয় আজ সন্ধ্যেপ্রদীপ জ্বালিয়েছে মনোরমা।

বাণীব্রত চুপ করে দাওয়ায় বসেছিলেন। হঠাৎ স্ত্রীর কান্না শুনে চমকে উঠে শুধোলেন,—'কি হল? ওগো কি হলো তোমার?'

ঘরের মধ্যে ঢুকে বাণীব্রত ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। একটা বাঁধানো ছবির দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কাঁদছে মনোরমা। হিরু আর বিন্তি। পাশাপাশি দুই ভাই বোন দাঁড়িয়ে। বাণীব্রতর মনে আছে পাঁচ-ছ বছর আগে মিলনের এক বন্ধু ছবিটা তুলে দিয়েছিল।

স্ত্রীর হাত থেকে সেটি কেড়ে নিলেন বাণীব্রত। সস্নেহে বললেন,—'কেন ওসব দেখছ? মিছিমিছি মন খারাপ হবে।'

মনোরমা তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল,—'ওগো কার জন্যে তুমি এই বাড়ি করেছ? এখানে কারা থাকবে? শুধু তুমি আর আমি? আমি কি এখানে একলা পড়ে থাকব?'

বাণীব্রত অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ধীরে ধীরে বললেন,—'আমি বুঝতে পারিনি মনোরমা। যখন ওরা ছোট ছিল, তখন আমরা সবাই এক বাড়ি ভাবতাম। তারপর কখন ছেলেরা বড় হয়ে উঠল। ওদের মনের মাটিতে নতুন নতুন রংচঙে বাড়ি তৈরি হল। আমি তার খোঁজ রাখিনি, বুঝতে পারিনি। আমার চন্দনপুরের বাড়িতে ওরা কেউ বাস করবে না। একথা কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম?'

অন্ধকার রাত্রি। কলকাতার চেয়ে ঠাণ্ডা অনেক বেশী। মাথার উপর গ্রহ-উপগ্রহ, নির্বাক তারার দল। বিস্তীর্ণ ছায়াপথ আকাশের এক-কোণ থেকে অন্য কোণে প্রসারিত। বাণীব্রত ভাবছিলেন, এই বাড়িতে তার পূর্বপুরুষরা বাস করে গেছেন। তার বাবা এখানে জন্মেছেন। এই উঠোনের

মাটিতে খেলাধুলো করে বড় হয়েছেন। ওই অনন্ত আকাশ, নীহারিকা-পুঞ্জ, গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য-তারার দল। ওরই আড়ালে দাঁড়িয়ে তার পূর্বপুরুষরা অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলছেন—'তুমি আমাদের বংশধর। তোমাকে ভালবাসি। সময় পূর্ণ হলে একদিন আমাদের মধ্যে তুমিও এসে দাঁড়াবে। আমরা অপেক্ষায় আছি।'

রান্নাঘরের চালার পাশে সজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে বাণীব্রত মৃদু হাসলেন, ইতিমধ্যে শাদা শাদা ফুলে ভরে উঠেছে গাছটা। মায়ের হাতের রান্না সজনে ফুলের চচ্চড়ির স্বাদ মনে হ'ল তাঁর, কতকাল আগের কথা। তার মা জিজ্ঞাসা করত, আর একটু চচ্চড়ি নিবি খোকা? তুই তো খেতে ভালবাসিস।' শীতের স্তব্ধ রাত্রে মায়ের কণ্ঠস্বর কানের কাছে স্পষ্ট মনে হয়।

কখন মনোরমা এসে নিঃশব্দে পাশে দাঁড়িয়েছে। বাণীব্রত প্রায় ফিস-ফিস করে বললেন,—'জানো, ওই সজনে গাছটা আমার মায়ের হাতে লাগানো। এখন কত বড় হয়েছে। মনোরমা স্বামীর কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। অন্ধকারে তার ভয়-ভয় করছিল।

বাণীব্রত স্বগতোক্তির মত বললেন,—'এস, আমরাও একটা গাছ লাগিয়ে যাই। কোনোদিন ছেলেরা নিশ্চয় এই বাড়িতে আসবে। ততদিনে ছোট্ট গাছটা অনেক বড় হবে। আমরা হয়তো বেঁচে থাকব না। কিন্তু তার নীচে দাঁড়িয়ে ওরা ঠিক বলবে,—'এই গাছটা আমাদের মা আর বাবার [illegible] লাগানো। [illegible] আমাদের [illegible]ভালবাসার কথা [illegible] অন্ততঃ একবার স্মরণ করবে।

কোথায় দূরে একটা রাতজাগা পাখি কর্কশ শব্দে ডেকে উঠল। বাণীব্রত স্ত্রীকে আর একটু কাছে টেনে নিলেন। নক্ষত্রের আকাশ। মৌন রাত্রি ধীরে ধীরে গভীর হতে লাগল। নিঝুম ঘুমন্ত গ্রাম। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুটি নারী-পুরুষ তাদের সন্তানদের শুভ কামনায় ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা জানাল।